দ্বিতীয় সংস্করণ

সাংবাদিক সহায়িকা

তথ্যপঞ্জি

নির্বাচনী রিপোর্টিং

বাংলাদেশের
সংসদীয় নির্বাচনের
প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি

সেড

সাংবাদিক সহায়িকা

তথ্যপঞ্জি
নির্বাচনী রিপোর্টিং

সম্পাদনা

ফিলিপ গাইন, কিউ এ তাহ্‌মিনা ও শিশির মোড়ল

সম্পাদনা সহকারী

খাদিজা খানম ও লুসিল সরকার

যাঁরা লিখেছেন

আতাউস সামাদ, এমএম আকাশ, সাখাওয়াত আলী খান, হোসেন জিল্লুর রহমান, ওবায়দুল হক, রিচার্ড গ্যালপিন, ফরিদ হোসেন, সুব্রত শংকর ধর, মোয়াজ্জেম হোসেন, মনিরুজ্জামান, কিউ এ তাহ্‌মিনা, ফিলিপ গাইন, শিশির মোড়ল, মানিক সাহা, মোহিউদ্দীন ফারুক, রিজওয়ানা হাসান, খাদিজা খানম, আলিমুল হক ও আব্দুর রাজ্জাক খান।

সমন্বয়কারী

ফিলিপ গাইন ও শিশির মোড়ল

www.pathagar.com

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৪/৪/১(বি)(৪র্থ তলা) ব্লক-এ, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১২১৩৮৫ ফ্যাক্স: ৯১২৫৭৬৪
ই-মেইল: sehd@citechco.net

প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৫
দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০১

আইএসবিএন: ৯৮৪-৪৯৪-০১৫-x
ISBN:984-494-015-X

স্বত্ব: সোসাইট ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, গণতান্ত্রিক অধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, আদিবাসী, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, মানবাধিকার–এসব বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেড নির্বাচন, গণতন্ত্র, বন, আদিবাসী, মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজ করেছে। সাংবাদিক, পেশাজীবীসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে সেড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গবেষণা এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ দেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মানবৃদ্ধি করতেও সেড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রচ্ছদ: গৌতম চক্রবর্তী

কম্পোজ ও পৃষ্ঠা সজ্জা সহকারী: রোজি ডি'রোজারিও

মুদ্রক: দি ক্যাড সিস্টেম

মূল্য: ২০০ টাকা

Tathyapanji: Nirbachani Reporting (Handbook on Election Reporting). Edited by Philip Gain, Q A Tahmina and Shishir Moral. Published by the Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka, Bangladesh. First Edition

www.pathagar.com

ভূমিকা

নির্বাচন ও গণতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর অন্যতম লক্ষ্য। সেড বিশ্বাস করে নির্বাচন প্রক্রিয়া তথা ব্যাপক অর্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্যমাধ্যমগুলো সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সেই ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য অনেকের আন্তরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এই নির্বাচনী তথ্যপঞ্জি।

তথ্যপঞ্জির প্রথম বিভাগে রয়েছে নির্বাচনী রিপোর্টিং-এর বাস্তব দিক নির্দেশনা বিশেষ করে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে। আমরা আশাকরি দেশের অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার শিক্ষকদের নানা ইঙ্গিত ও পরামর্শ অনেকের কাজে লাগবে।

দ্বিতীয় বিভাগে আমরা দেশের জাতীয় নির্বাচনগুলোর কিছু অত্যাবশ্যকীয় পটভূমি দিতে চেষ্টা করেছি। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং জনমত জরিপের চুম্বক চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলোও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় বিভাগে সংযোজিত করা হয়েছে: বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান; নির্বাচনী এলাকা এবং প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নামের তালিকা ও প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা; সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি; প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা এবং আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় ভারতের নির্বাচনে পরিলক্ষিত হয় এমন কিছু অনিয়মের তালিকা।

আমরা চেষ্টা করেছি কিছু কিছু নিবন্ধের শেষে প্রাসঙ্গিক সূত্র, তাদের ঠিকানা/টেলিফোন নম্বর ইত্যাদির তালিকা দিতে, এর ফলে সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষকদের দ্রুত তথ্য পেতে সুবিধা হবে। আমরা আশাকরি গ্রন্থটি সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গবেষক বা অন্য আরও অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

আমরা ১৯৯৫ সালে যখন তথ্যপঞ্জিটি প্রথম প্রকাশ করি তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করব। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম। এটি একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা জানতে পেরেছি গ্রন্থটির ব্যবহার শুধুমাত্র গণমাধ্যমকর্মী এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ছাত্র, শিক্ষক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকরা গ্রন্থটি ব্যবহার করেছেন। অনেক সাধারণ পাঠকও গ্রন্থটিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার আগে আমরা বিভিন্ন মহল থেকে উদার সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথম সংস্করণের সম্মানিত লেখকবৃন্দ পর্যাপ্ত নতুন তথ্য দিয়ে তাঁদের লেখাগুলো অনেক ক্ষেত্রে নতুন করে সাজিয়েছেন। একেবারে নতুন লেখাও এবার সন্নিবেশিত হয়েছে। ইউসিস, কোর্ডএইড এবং মিজোরিয়রকে তাদের বিশেষ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার সময় এশিয়া ফাউন্ডেশন যে সহযোগিতা করেছিল তাও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সেডের কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা আমাদের কাজকে সহজতর করে তুলেছে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জিটিকে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে তৈরী করার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, যদিও এর পরিবর্ধিত রূপ দেওয়ার আরও সুযোগ রয়েছে। ৮ আগস্ট, ২০০১ তারিখে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ "গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০০১" স্বাক্ষর করায় শেষ মুহূর্তে দ্রুততার সাথে কয়েকটি জায়গায় পরিবর্তন করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন তথ্যের জন্য পুরোপুরি সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সরকারি গেজেট প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি। পুরো অধ্যাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে যদি পরিবর্তনগুলোতে অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয় তা হলে তার দায়ভার আমাদের।

একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যপঞ্জি প্রকাশ করার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, তারপরও আরও কাজ করার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। এ কথা বলা যায় যে, নির্বাচন নিয়ে মৌলিক গবেষণার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। এই তথ্যপঞ্জি তৈরির সময় আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে, ভবিষ্যতে কাজ করার সময় তা সহায়ক হবে। এই গ্রন্থের নানা সীমাবদ্ধতা এবং অপরিহার্য্য ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণ যুগোপযোগী করার কাজে পাঠকদের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

গ্রন্থটির কিছু লেখায় যেসব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তা লেখকদের নিজস্ব। ওইসব মতামত আবশ্যিকভাবে সম্পাদকমন্ডলীর বা প্রকাশকের নয়।

সম্পাদকমন্ডলী

www.pathagar.com

সূচি

ক বিভাগ

নির্বাচনী প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র ১-১০
আতাউস সামাদ

পর্যায়ক্রমে নির্বাচন ১১-২৬
ফিলিপ গাইন ও শিশির মোড়ল

নির্বাচন কমিশন: গঠন ও কার্যপ্রণালী ২৭-৩৮
মুনীরুজ্জামান

দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নির্বাচনী রিপোর্টিং ৩৯-৪৪
মানিক সাহা ও শিশির মোড়ল

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নির্বাচনী প্রতিবেদন ৪৫-৫২
ফরিদ হোসেন ও রিচার্ড গ্যালপিন

জরুরি কিছু বিষয় ৫৩-৫৯
সুব্রত শংকর ধর

নির্বাচনী ফিচার ৬০-৬৬
কিউ এ তাহ্‌মিনা

ভোটার বনাম প্রার্থী ৬৭-৭১
মোয়াজ্জেম হোসেন

সদালাপী সাংবাদিক ৭২-৭৫
ওবায়দুল হক

নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ৭৬-৮৫
এম এম আকাশ

নির্বাচনী সংবাদ সম্মেলন ৮৬-৮৯
সাখাওয়াত আলী খান

খ বিভাগ

সাধারণ নির্বাচন: বৃটিশ ও পাকিস্তানি আমল ৯১-৯৯
সাখাওয়াত আলী খান

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন ১০০-১২০
ফিলিপ গাইন

www.pathagar.com

এক নজরে সপ্তম সংসদ ১২১-১২৮
খাদিজা খানম

জরুরি নির্বাচনী আইন এবং আইনের ফাঁকফোকর ১২৯-১৪৬
মোহিউদ্দীন ফারুক ও রিজওয়ানা হাসান

নির্বাচনী বিবাদ মীমাংসা ১৪৭-১৫০
শিশির মোড়ল

জনমানুষ কী ভাবছেন ১৫১-১৬০
হোসেন জিল্লুর রহমান

নির্বাচন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ১৬১-১৭১
আলিমুল হক ও আব্দুর রাজ্জাক খান

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ১৭২-১৯৩
ফিলিপ গাইন ও শিশির মোড়ল

গ বিভাগ

সংযোজনী-ক: বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ১৯৫-১৯৭

সংযোজনী-খ: সপ্তম জাতীয় সংসদ (১৯৯৬) নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনী আচরণবিধি ১৯৮-২০১

সংযোজনী-গ: সপ্তম সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা (বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাপ্ত ভোটসহ) ২০২-২৩৮

সংযোজনী-ঘ: প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নাম ও ঠিকানা ২৩৯-২৪১

সংযোজনী-ঙ: ভারতের নির্বাচনে অসদাচরণ ২৪২-২৪৬

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আতাউস সামাদ, প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রাক্তন বিবিসি সংবাদদাতা

ডঃ সাখাওয়াত আলী খান, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী সভাপতি,পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেসন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

ডঃ এম এম আকাশ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওবায়দুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক এবং বাংলাদেশ অবজারভার-এর প্রাক্তন সম্পাদক

মোয়াজ্জেম হোসেন, সম্পাদক, দি ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস

মুনীরুজ্জামান, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ

মানিক সাহা, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ

রিচার্ড গ্যালপিন, বিবিসি সংবাদদাতা

ফরিদ হোসেন, ব্যুরো চীফ, এপি

ডঃ সুব্রত শংকর ধর, বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তা, ঢাকা

ডঃ মোহিউদ্দীন ফারুক, প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা)

রিজওয়ানা হাসান, পরিচালক (প্রোগ্রাম), বেলা

কিউ এ তাহ্‌মিনা, সাংবাদিক

ফিলিপ গাইন, ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

শিশির মোড়ল, ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক ও গবেষণা কর্মকর্তা, সেড

খাদিজা খানম, সহকারী গবেষক, সেড

আব্দুর রাজ্জাক খান, প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আলিমুল হক, সাংবাদিক

www.pathagar.com

ক

বিভাগ

www.pathagar.com

নির্বাচনী প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

আতাউস সামাদ

সংবাদযোগ্য ঘটনাকে তিন ধরনের প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এগুলো হল: সাদামাটা প্রতিবেদন, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন।

সাদামাটা প্রতিবেদন কোনো ঘটনা বা তথ্যের সহজ ও সরাসরি বিবরণ। কোনো ঘটনা বা তথ্য প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যেমনটা মনে হয় সেই বিবরণই সাদামাটা প্রতিবেদন। তবে ঘটনা, তথ্য বা বক্তব্যের প্রেক্ষিত স্পষ্ট করার জন্য এর সঙ্গে কিছু পটভূমিও যুক্ত করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের কাজ একদিকে, কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়, ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরা, যে পরিস্থিতিতে ঘটনা ঘটছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করা, ঘটনার ফলে পরিস্থিতিতে কী পরিবর্তন হলো সেটা বলা। আবার ঘটনা যখন দ্রুত ঘটে চলে, নতুন নতুন মোড় নেয়, তখন অজস্র তথ্য, উপাত্ত, বিবরণ, খুঁটিনাটি জড়ো হয়ে বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা তৈরি করে। সেরকম অবস্থায় ঘটনার একটা পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরা, সহজ যুক্তিগ্রাহ্য বিবরণের মাধ্যমে ঘটনাটা বোঝানোর চেষ্টা করাও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের কাজ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলোর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করারও একটি চেষ্টা এই ধরনের রিপোর্টে করা হয়। ঘটনার বিবিধ সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত সেসব ব্যঞ্জনাগুলো ব্যাখ্যা করা ও স্পষ্ট করে তোলাও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের কাজ।

একটি ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অথচ লুকানো তথ্য আমরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখতে পাই। এরকম প্রতিবেদন সাধারণত করা হয় বেআইনি কাজকর্ম, অপরাধ, দুর্নীতি বা ক্ষতিকারক ঘটনার ক্ষেত্রে। একটি অন্যায় বা অন্যায্য ঘটনা কেন ঘটল, কারা ওই দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত, যাদের কাছ থেকে আশা করা যায়নি তারা কেন ওই বেআইনি ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এসব খুঁজে বের করে। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অপকর্ম এবং অপকর্মের হোতাদের মুখোশ উন্মোচন করে।

নির্বাচনী প্রতিবেদন এই তিন ধরনেরই হতে পারে। একটি নির্বাচন কেমন হচ্ছে এবং এর ফলাফল কী হল সাদামাটা প্রতিবেদন তাইই উপস্থাপন করবে।

নির্বাচনে জিতবার জন্য একজন প্রার্থী কী করছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য কে কী করছেন, সরকার গঠন বা স্থানীয় সরকার সংগঠনের ক্ষেত্রে ফলাফলের তাৎপর্য বা অর্থ কী দাঁড়ায়, একটি রাজনৈতিক দল বা একটি গ্রুপের প্রার্থীদের বিজয়ী হওয়া জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে কী গুরুত্ব বহন করে

www.pathagar.com

একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এসবই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। প্রথমত একটি নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় নীতি এবং পরিস্থিতির ওপর কী প্রভাব ফেলবে এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচনের ফলাফল বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন: ব্যবসায়ী, ধর্মীয়গোষ্ঠী, পেশাজীবী, নারী-পুরুষ এমনকি গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর ওপর কী প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।

নির্বাচনে দুর্নীতি, অপকীর্তি, ভোট জালিয়াতি, কারচুপি, অনিয়ম এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় বস্তু। অন্যায়ভাবে বা বেআইনীভাবে নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তিত/প্রভাবিত করা হলে, অথবা ভোটারদের নিজেদের পছন্দসই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে সেসব ঘটনা নিয়েও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যেতে পারে। যদি এমন হয় যে একটি নির্বাচনে দুর্নীতি হল, জাল ভোট পড়ল অথবা ভোটারদের জোর করা হল বা ঘুষ দেয়া হল কোনো প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য অথবা ভয় দেখানো হল ভোটাররা যেন ভোট কেন্দ্রে না যায় অথবা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ওপর জোর করা হল বা তাদেরকে ঘুষ দেয়া হল সঠিক ফলাফল চেপে রেখে কোনো বিশেষ প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করতে সে ক্ষেত্রে একজন রিপোর্টারের কাজ হবে যারা দুর্নীতি করেছে তাদের স্বরূপ তুলে ধরা, কীভাবে দুর্নীতি করা হয়েছিল তা বলা এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল কী করে পাল্টে গেল তা বলার চেষ্টা করা। নির্বাচনকে ঘিরে যেসব দুর্নীতি ও অপরাধ সঙ্ঘঠিত হয় তাকে এক কথায় বলে রিগিং বা নির্বাচনে কারচুপি বা ভোট জালিয়াতি। এই রিগিং সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পিছনে থাকতে হবে জরুরি সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের প্রতিবেদনের কিছু সাধারণ তথ্যসূত্র আছে, যেমন: যারা ভোট গ্রহণ পরিচালনা করেন এবং ফলাফল ঘোষণা করেন সেইসব রিটার্ণিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসার, নির্বাচন কমিশন যার মূল দায়িত্ব নির্বাচন আহবান ও পরিচালনা করা এবং নির্বাচনের সরকারী ফলাফল ঘোষণা করা, প্রার্থী ও তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক দল ও সেগুলোর কার্যালয়, পোলিং এজেন্ট, প্রচারণা ব্যবস্থাপক এবং স্বেচ্ছাসেবক এরা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র।

লিখিত কিছু তথ্যসূত্রও রয়েছে। জাতীয় সংসদের নির্বাচন কখন হবে, কারা প্রার্থী হবার যোগ্য কারা যোগ্য নন, জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হবে, নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কখন ও কীভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে এসব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো সংবিধানে বর্ণিত আছে। তাছাড়া রয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ভোটার তালিকা আদেশ, নির্বাচন কমিশন আদেশ, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ আইন) বিধি ইত্যাদি। এসব আইন ও বিধিতে সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে কে নির্বাচন পরিচালনা করবেন, কীভাবে তা পরিচালিত হবে, কে ভোট দিতে পারবেন অথবা কে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন বা পারবেন না।

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ সংসদ ভেঙে যাওয়ার বা মেয়াদকাল শেষ হবার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ৯০ দিন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তে সরকারের যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে অনির্বাচিত অথচ সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা গঠিত হবে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও আরও কয়েকজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে।

এই সরকার বড় ধরনের কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এই ধরনের একটি ব্যবস্থার পিছনে যুক্তি হচ্ছে নির্বাচনের সময় কোনো দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকবে না এবং তাই কোনো বিশেষ দলের

www.pathagar.com

সপক্ষে নির্বাচনী ফলাফল নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হতে পারবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভোট জালিয়াতি বা কারচুপির কাজে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হতে পারবে না। সকল রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সুযোগ সুবিধা থাকবে সমান। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজের মধ্যে থাকবে: শক্ত হাতে আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যেন কোনো পক্ষ কোনো প্রার্থীর নির্বাচন বানচাল করতে না পারে, কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই যেন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন ও অবাধে ভোট দিতে পারেন, নির্বাচনের সময় যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে, প্রকৃত প্রদত্ত ভোট এবং ঘোষিত ফলাফলে যেন পার্থক্য না থাকে এবং কোনো সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে কাজ না করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনে পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করা, সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা এবং নির্বাচন কমিশনে শান্তিপূর্ণ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার পদক্ষেপ নেয়া।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে নতুন আর একটি বিষয় হলো স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি। সঠিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল কিনা তা দেখা পর্যবেক্ষকদের কাজ। তাঁরা নিজেরা নির্বাচনে অংশ নেন না। তাঁরা সাধারণত ভোট কেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন ভোটগ্রহণ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা। কিন্তু ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোটারদের ঘুষ দেয়া, কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার সময় বা অন্য অনিয়মের সময় পোলিং এজেন্টকে চুপ থাকার জন্য ঘুষ দেয়া, ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসতে না দেয়া– এই ধরনের নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর পর্যবেক্ষকরা অনেক এলাকায় ভোটের আগে, ভোটের দিন ও পরে পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন।

তাঁরা সঠিকভাবে ভোটগণনা হচ্ছে কিনা এবং ভোটের সংখ্যা ঠিকভাবে রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করেন। আজকাল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ দলও আসছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য। বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কোনো আইনী স্বীকৃতি নেই তবে তাদের উপস্থিতি দুষ্কৃতকারীদের ওপর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে। অতীতে দেখা গেছে এতে করে ক্ষমতাসীনদের অবস্থান দুর্বল হয়ে গেছে। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের সংগৃহিত তথ্য ও মতামত জনমত গড়তে সহায়তা করে এবং যারা নির্বাচনী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে সহায়তা করে। বিশ্ব জনমত আজ আর নির্বাচনে দুর্নীতির বিষয়টি চোখ বুজে গ্রহণ করতে রাজি নয়। নির্বাচন কতখানি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বিশ্ববাসির কাছে সেই বার্তা পৌছে দেবার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকার গুরুত্ব বাড়ছে।

একজন সাংবাদিক যিনি নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট করবেন তাঁকে নির্বাচন কী, নির্বাচনের মাধ্যমে কী নির্ধারিত হবে, কে নির্বাচন আহবান করেন, নির্বাচনে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, কারা ভোট প্রদান করবেন, কেমন করে ভোটাররা তালিকাভুক্ত হন, কোন পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হয়, কারা ভোটগ্রহণ করবেন, কীভাবে ভোট গণনা হবে, কীভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে, ঘোষিত ফলাফলের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় কিনা, কার কাছে সে আবেদন করতে হবে, একটি আপত্তিকর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কী ঘটতে পারে, সর্বোপরি যারা নির্বাচনে জিততে চান সেইসব রাজনীতিকদের ক্ষমতায় আসার উদ্দেশ্য কী এবং জনগণ ভোটের মাধ্যমে কী অর্জন করতে চান এসব অবশ্যই ভালোভাবে বুঝতে ও জানতে হবে।

এ সমস্ত জানার ও বোঝার জন্য রিপোর্টারকে সংবিধান, নির্বাচনী আইন, রাজনৈতিক দলের প্রকাশনা এবং সুশীল সমাজ ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রকাশনা পড়তে হবে। সাংবাদিককে নির্বাচন কমিশন, নির্দলীয়

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, রাজনীতিক, প্রার্থী, প্রচারকর্মী, আইনজীবী, গণমাধ্যম কর্মী, মতামত জরিপকারী, পর্যবেক্ষক এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এইসব বিভিন্ন তথ্য উৎসের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আগের অনুচ্ছেদগুলোতে কিছু বলা হয়েছে। একজন রিপোর্টার কোন উৎসের কাছে যাবেন তা নির্ভর করে: (ক) নির্বাচনের কোন পর্যায়ে তিনি রিপোর্ট করছেন; (ঘ) তিনি কোন ধরনের রিপোর্ট করছেন সাদামাটা, ব্যাখ্যামূলক নাকি অনুসন্ধানী।

জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রত্যাশা থাকে যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক পন্থাতেই হবে। জনগণ এও চান যে তাদের প্রতিনিধি বাছাই সততার সাথে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। এক্ষেত্রে ধারণাটি হচ্ছে যে নির্বাচন পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হবে। এর অর্থ: (ক) একজন ভোটার একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করার সুযোগ পাবেন, (খ) ওইসব প্রার্থীরা দেশের প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শগুলোর প্রতিনিধিত্ব করবেন, (গ) এর সঙ্গে, প্রার্থীরা ভিন্ন মতও প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, এবং (ঘ) ভোটাররা অবাধে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।

সুতরাং শুধু একটি নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাতে অংশ নেবে যেন ভোটারদের সামনে পছন্দের প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ থাকে এবং প্রার্থীরা এমন হবেন যেন তাদের নিয়ে নির্বাচনে লড়তে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো কিছু লুকোচুরি করতে না হয় এবং ভোটাররাও সেভাবে ভোট দিতে পারেন।

যিনি নির্বাচন নিয়ে কাজ করবেন তাকে বুঝাতে হবে কিসের জন্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যালয়ের জন্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রেক্ষিত বা আলোচ্য বিষয় সংসদ নির্বাচন। আমাদের মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ মূলত পাঁচটি: একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এবং প্রয়োজন বোধে অনাস্থার মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো; আইন প্রণয়ন; বাৎসরিক বাজেট পাশ করা, যার একটি অর্থ দাঁড়ায় সরকারকে কর আরোপ করার অনুমোদন দেয়া; গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা এবং সংসদীয় স্টান্ডিং কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়ের কাজের তদারকি করা। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্ধারণ করে এবং পাঁচ বছরের জন্য একটি দলকে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়ে সাধারণ জনগণ বা ভোটাররা নিশ্চিত থাকতে চান যে সংসদ এবং সরকার জাতীয় বিষয়গুলোর দায়িত্ব বহন করবে। সে কারণে সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশন ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংসদে আসন জেতার আশায়।

আইন প্রণেতা এবং প্রার্থী

সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হবেন, ৩০০ সাংসদের মধ্যে যাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন, যাঁরা ১৩ কোটি মানুষের অগ্রযাত্রার জন্য আইন প্রণয়ন করবেন সেই সব সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে একজন রিপোর্টারের ভালো ধারণা থাকতে হবে। পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন, নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁরা জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে পারেননি। ষষ্ঠ সংসদ ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং

www.pathagar.com

প্রধানসব বিরোধী দল ওই নির্বাচন বর্জন করেছিল, ওই নির্বাচনের ফলাফল বিতর্কিত ছিল। যাহোক, ওই সংসদেই সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়োদশ সংশোধনী করা হয়েছিল যা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল ভিত্তি তৈরি করে। যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা থাকতো তবে পঞ্চম সংসদেই ওই সংশোধনী সম্ভব হত। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে তিনটি আইন পাশ হয়, এরমধ্যে দুটি জনগণের নিরাপত্তার নামে এবং আর একটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার আজীবনের নিরাপত্তা বিধান করে। এই আইনগুলো খারাপ আইন এবং অত্যন্ত বিতর্কিত। জনগণের নিরাপত্তার নামে করা আইন মূলত ব্যবহৃত হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থকদের কারারুদ্ধ করা এবং হয়রানির জন্য। এটা সম্ভবত সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে বিরাট সংখ্যক সংসদ সদস্য ছিলেন ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে আত্মস্বার্থকেই তারা বড় করে দেখেছেন এবং জনগণের সত্যিকার প্রয়োজন-চাহিদা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা ছিল না। একটি জনকল্যাণমুখী আইন কী, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয় কী, কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা যায়, শালীনতা কী এসব বিষয়ে চিন্তার সময় তাদের কমই ছিল।

অভিযোগ রয়েছে একটি বড় সংখ্যক ব্যবসায়ী সাংসদদের সঙ্গে সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তাদের শাসনামলে বেআইনী অস্ত্র এবং পেশীশক্তির ব্যবহার কমেনি। সারা সপ্তম সংসদের সময় এবং তৎকালীন সরকারের আমল জুড়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক ছিল। কোনো কোনো সাংসদ নিজে, কারো আত্মীয়-স্বজন, এমন কি মন্ত্রীর সন্তান মারাত্মক সব অপরাধ করেছেন। সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ নির্বিশেষে মন্ত্রী ও সাংসদদের নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও ছিল বলে মনে হয় না, তারা শুধু সংকীর্ণ দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। সুতরাং তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা এমন সব অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন যে জাতির জন্য যার ফল দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ। আগামী নির্বাচনের রিপোর্ট করার সময় সাংবাদিককে এই পটভূমি মাথায় রাখতে হবে। প্রার্থীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য সাংবাদিককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং দেখতে হবে প্রার্থী জয়ী হলে তিনি একজন ভালো মন্ত্রী বা উপযুক্ত আইন প্রণয়নকারী হতে পারবেন কিনা। সাংবাদিককে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃত পক্ষে কী করতে যাচ্ছে, স্পষ্টত তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো কী এবং কোনো দল যদি ক্ষমতায় যায় তা হলে তাদের প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি কতটুকু পালন করতে পারবে অথবা তারা আসলে কী অর্জন করবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দলের নেতা হয়তো এমন একদল প্রার্থীকেই মনোনয়ন দিলেন যারা সর্বদাই 'হ্যাঁ হুজুর' 'জো হুজুর' করবেন, বা এমন একদল যারা অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত অথবা যারা নির্বাচন প্রচারণার অর্থ সরবরাহ করবে। সুতরাং ভোটারদের প্রার্থী সম্পর্কে জানতে হবে। কোন ধরনের সরকার বা সংসদ হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের মানুষ নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবেন তার ওপর।

ভালো রিপোর্ট প্রকাশ প্রচার করে গণমাধ্যম জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। এখানে ভালো রিপোর্টের অর্থ হলো তাতে থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খ, যথার্থ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং মান সম্পন্ন বিবরণ যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের যোগ্যতা, সম্ভাবনা, শক্তি ও দুর্বলতা পরিমাপ করা যায়। যেমন: কোনো রাজনৈতিক দল যদি একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করায় তাঁকে আইন মন্ত্রী করার ইচ্ছা নিয়ে তবে রিপোর্টারকে দেখতে হবে ওই বিচারপতি কোথায় আইন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলার তিনি রায় প্রদান করেছেন, তাঁর রায় কতগুলো উচ্চ আদালতে সমর্থিত হয়েছে, কতগুলো বাতিল হয়েছে, আইনজীবীদের প্রতি তিনি কতটা ধৈর্য্যশীল ছিলেন, বিচারপতি হিসাবে তিনি কতখানি কঠোর বা কতখানি

www.pathagar.com

নমনীয় ছিলেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ আছে কিনা বা তাঁর স্বাস্থ্য কেমন (মন্ত্রী হলে তিনি পুরোমাত্রায় কাজ করতে পাবেন কিনা সে ধারণা দেওয়ার জন্য)। আবার যে প্রার্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে চাইছেন তাঁর ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে দেখতে হবে তিনি নিরপেক্ষ, দৃঢ়চেতা ও সত্যনিষ্ঠ কিনা, আইনের ব্যাপারগুলো কতটা বোঝেন এবং সজাগ ও চটপটে কিনা। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় এসে মীর্জা গোলাম হাফিজকে আইনমন্ত্রী করে। বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থতার কারণে তিনি তার মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেননি, এমন কি সংসদে তাঁর উপস্থাপনা পরিষ্কার ও দৃঢ় ছিল না। আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং মোহাম্মদ নাসিম - এই দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর আইন সম্পর্কে যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা ছিল না বলে মনে হয়েছে। সে কারণে তাঁরা ছিলেন দুর্বল ও সমস্যা সৃষ্টিকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এইসব তথ্যের জন্য সঠিক স্থানে যেতে গেলে রিপোর্টারকে কষ্টসহিষ্ণু ও যত্নশীল তদন্ত করতে হবে। রিপোর্টিং-এ নবাগতদের জন্য এটুকুই শুধু বলা যায় যে রাজনৈতিক দলের বড় নেতানেত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কাগজপত্র পড়তে হবে এবং তাদের অতীত কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে বুঝতে হবে তাদের জয়ী হবার মূল উদ্দেশ্য কোনটি। এভাবেই রিপোর্টার বিচার করতে পারবেন ঘোষিত ও অঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে তাদের প্রার্থী মনোনয়নের মাপকাঠি খাপ খায় কিনা।

সংবিধান

অন্যান্য নির্বাচনের মতো সংসদ নির্বাচনও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় আইন বা গুরুত্বপূর্ণ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের পঞ্চম ভাগে ভবিষ্যৎ সাংসদদের অযোগ্যতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে। সংবিধানের এই ভাগে সংসদের সময়সীমা, কেমন করে সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে বলা আছে। নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সংবিধানের সপ্তম ভাগে বর্ণনা করা আছে। এই ভাগের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা আছে। নির্বাচন শিরোনামের অধীনে না হয়ে সংবিধানের সম্পূর্ণ একটা আলাদা ভাগ হিসাবে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা থাকা উচিত ছিল। এই সাংবিধানিক দুর্বলতার কারণে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস কী তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা নেই। নির্বাচন কমিশনের এই সংবিধানগত দুর্বলতা একজন রিপোর্টারকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

নির্বাচনী আইন

নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধান ছাড়াও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং আরও কিছু আইন ও অধ্যাদেশ ব্যবহার করা হয় (এ বিষয়ে আইন সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত আইন ও অধ্যাদেশ স্বচ্ছ নয় এবং এগুলোর অনেক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিরাপত্তার কারণে বা ভোটগ্রহণ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ করার জন্য ভোটকেন্দ্রকে ঘিরে ২০০ বা ৪০০ গজের একটি সীমানা দেওয়া হয়। আইন অনুযায়ী একজন প্রিসাইডিং অফিসার একটি কেন্দ্রে ওই ২০০ বা ৪০০ গজের মধ্যে সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী এবং অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের স্বার্থে তিনি ওই সীমানার মধ্যে যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। কিন্তু তিনি ওই ২০০ বা ৪০০ গজ চৌহদ্দির বাইরে একেবারে ক্ষমতাহীন। সুষ্ঠু ভোটগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে এমন কিছু যদি

www.pathagar.com

ওই সীমানার বাইরে ঘটে তবে সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারের কিছুই করার থাকে না। আইন প্রিসাইডিং অফিসারের ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে বলে কোনো ভোটারকে যদি কোথাও আটক রাখা হয় অথবা ভোটকেন্দ্রে আসার রাস্তা যদি কেউ বন্ধ করে রাখে তখন ভোটারদের তিনি সাহায্য করতে অক্ষম। এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ তদন্ত করার জন্য আইন সংশোধন করে ইলেকশন ইনকয়ারি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য নির্বাচন কমিশনেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উদ্বেগের আরেকটি বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী ব্যয়। একজন প্রার্থী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্বাচনে ব্যয় করবেন এরকম আইনি ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার বেশি ব্যয় করলে আইনে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোনো প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না কারণ কে কত ব্যয় করলেন তা পরিমাপ করার কৌশল নির্বাচন কমিশনের নেই। এখন যে আইন আছে তা একজন প্রার্থীকে নির্বাচনের পরে একটি মিথ্যা ব্যয়ের হিসাব জমা দেবার সুযোগ করে দেয়।

প্রচারণার সময় এবং ভোটের দিন সংবিধান এবং এইসব আইন নির্বাচন রিপোর্টিং-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য বিভিন্ন আইনের ধারা, উপ-ধারা রিপোর্টারকে ভালো করে পড়তে হয়। এগুলো শুধুমাত্র কিছু শব্দমালা নয়, এগুলো প্রতিষ্ঠানের মতো। এগুলো ছাড়া যেমন নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব নয়, তেমনি এগুলো ছাড়া নির্বাচনী রিপোর্টিংও সম্ভব নয়। একজন রিপোর্টার যিনি এই আইনগুলো ভালো বুঝবেন তিনি এইসব আইনের লঙ্ঘন হলেও সহজেই বুঝতে পারবেন।

কখনো কখনো আইনের জটিলতা, সীমাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ততা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বিপন্ন করে তোলে এবং নির্বাচন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিতর্কিত করে তোলে। এই সময় রিপোর্টারকে জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী আইন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হয়ে দাঁড়ান। উদ্ভূত সমস্যা এবং জটিলতা ও অসহায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার বিকল্প পথগুলো কী তা জানার জন্য রিপোর্টারকে আইন প্রণেতা, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ এদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সংসদীয় এলাকা

নির্বাচনী প্রচারণাকালে এবং ভোটের দিনে প্রতিটি সংসদীয় এলাকা আপাতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। সংসদীয় এলাকার মাঠ পর্যায় থেকে রিপোর্টারকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই তথ্যের মধ্যে থাকবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সংসদীয় এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, অতীতে ভোটারদের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণ, গত নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারণে ভোটের ব্যবধান, সুপরিচিত প্রার্থী কারা, এলাকায় প্রধান নির্বাচনী ইস্যু কী, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব কেমন, নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, জালিয়াতি-কারচুপির সম্ভবনা কতটুকু, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী ইত্যাদি। যে সমস্ত সংসদীয় এলাকায় তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং সামান্য ভোটের ব্যবধানে ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল যেসব সংসদীয় এলাকাকে বলে প্রান্তিক সংসদীয় এলাকা। এ সমস্ত এলাকাই আগামী নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবে। যারা মতামত জরিপ করেন তারা এই সমস্ত সংসদীয় এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে বেশি পছন্দ করেন। এসব

www.pathagar.com

এলাকায় নির্বাচন সাধারণত উত্তেজনাপূর্ণ হয়। আবার যেসব এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ সেসব এলাকায় সাধারণত কারচুপি বেশি হয়। ভালো নির্বাচনী রিপোর্টিং করার জন্য রিপোর্টারকে এসব এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে হবে।

ভোটারদের আচরণ অনুসরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দুর্বলতা, স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয় বা প্রেক্ষিতসমূহ ভোটারদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। একজন ভোটার যিনি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অনুগত নন তিনি স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন যা তার রাজনৈতিক মতামতের বিরোধীও হতে পারে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর করা এক জরিপে দেখা যায় যেসব এলাকায় ধানের ফলন ভালো হয়েছিল সেসব এলাকায় বিএনপি প্রার্থীরা বেশি জয়ী হয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বেশি আসন পেয়েছিলেন। সার সংকটের কারণে এবং ধানের দাম পড়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই ভেবেছিলেন কৃষি প্রধান এলাকাতে বিএনপি ভালো ফল নাও পেতে পারে। উল্টোভাবে, গত আওয়ামী শাসনামলে ফসল ভালো হওয়ায় ওই দল মনে করতে পারে এবার গ্রামাঞ্চলে তারা ভালো করবে। আবার আওয়ামী শাসনামলে শহরাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ থাকায় তাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে যদিও শহরাঞ্চলে ওই দলের একসময় ভালো প্রভাব ছিল। সুতরাং অতীতে অবস্থা কী ছিল এবং পরিবর্তিত অবস্থাটা কী এব্যাপারে রিপোর্টারকে সচেতন থাকতে হবে। যেসব গ্রামীণ এলাকা দূরে এবং যাতায়াতের অসুবিধা সেসব এলাকা নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য পন্থা বের করতে হবে, যেমন যারা ওইসব এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া অথবা ওইসব এলাকা থেকে নিয়মিত যারা শহরে আসেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা। তাহলে হয়তো কোনো ভালো খবরের ইঙ্গিত পাওয়াও যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের পক্ষ থেকেও কিছু নমুনা সংসদীয় এলাকা বেছে নির্বাচনী তৎপরতার পুরো সময়টা জুড়েই সেখানকার গ্রামাঞ্চলে রিপোর্টার পাঠানো যেতে পারে।

প্রশাসন

নির্বাচন পদ্ধতির ওপর স্থানীয় প্রশাসনের অপরিমেয় প্রভাব থাকে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের সহযোগিতা চায়। জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং উপজেলা প্রশাসন সকলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় হিসাবে পরিচালিত হয়। রিটার্ণিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারদের নিয়োগ করেন যারা একটি কেন্দ্রের সর্বোময় ক্ষমতার অধিকারী।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাত্ত্বিকভাবে কেবিনেট সচিবের প্রধান উপদেষ্টার অধীনে কাজ করার কথা। কিন্তু কেবিনেট সচিব যদি পূর্বের প্রধানমন্ত্রী বা অন্যকোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি নমনীয় থাকেন তবে তিনি জেলা প্রশাসকদের ওপর প্রভাব ফেলতেও পারেন। তাছাড়া দেখা গেছে অনেক সামরিক ও বেসামরিক আমলা চাকুরির শেষে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন। একজন প্রাক্তন কেবিনেট সচিব একটি দলীয় সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। সুতরাং যে সমস্ত আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা রয়েছে তারা তাদের কার্যালয়কে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেও ব্যবহৃত হতে দিতে পারেন।

www.pathagar.com

নিকট অতীতে এইচ এম এরশাদ এর সময় এবং ১৯৯১ এর পঞ্চম ও ১৯৯৬ এর সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময় আমরা পুলিশের দুরকম ভূমিকা দেখেছি। এরশাদের শাসনামলে নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস, বোমাবাজি, ভোট জালিয়াতি, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ আরও নানা অনিয়ম হয়েছে ব্যাপকভাবে। সেসব ঘটেছে পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সামনেই। পুলিশ এসব বন্ধ করতে কোনো উদ্যোগ যেমন নেয়নি তেমনি যেসব দুষ্কৃতকারি এসবের জন্য দায়ি তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এর সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল প্রশাসনের ওপর প্রভাবের কারণে। বিপরীত ক্রমে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর নির্বাচনে এসব অনিয়মের উপস্থিতি ছিল না কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। একজন ভালো রিপোর্টারকে জানতে হবে প্রশাসনের কোন স্তরে কে অবস্থান করছেন অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং কেবিনেট সেক্রেটারি কে বা কারা তা জানা জরুরি।

ভালো নির্বাচনী রিপোর্টিং-এর জন্য সংবাদপত্র কার্যালয়েই সমন্বয় থাকা দরকার। সিনিয়র রিপোর্টাররা কেবিনেট পর্যায়ের এবং অন্যরা জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। দুই ধরনের তথ্য একত্রে করলে বোঝা যাবে কে কোথায় কেন কী করছেন।

নির্বাচন কমিশন

তথ্যের একটি প্রধান উৎস নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (নির্বাচন কমিশনের ওপর পৃথক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে বলা আছে, "এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যে রূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।" এবং অনুচ্ছেদ ১২৬ এ বলা হয়েছে, "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনকালে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।" ১২০ ও ১২৬ অনুচ্ছেদে সরকারকে পরিষ্কার করে যেমন বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য তেমনি নির্বাচনী কাজে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তাতে করে দেয়া হয়েছে। একজন রিপোর্টারকে জানতে হবে নির্বাচন কমিশন সরকারের কাছে কোন ধরনের সহায়তা কামনা করে এবং নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনে সরকার কীভাবে সাড়া দেয়।

যখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় তখন দেখা যায় রিপোর্টাররা এমন সূত্রদের কাছে তথ্যের খোঁজে যাচ্ছেন যারা মোটেই প্রাসঙ্গিক নন বা মুখ্য নন। ফলে অনেক মূল্যবান সময় ঘোরাঘুরিতে নষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যদি আইনটি জানেন অর্থাৎ ফলাফল ঘোষণা করার আইনগত কর্তৃপক্ষ কে তা তার জানা থাকে, তাহলে রিপোর্টার সময় নষ্ট না করে সরাসরি তার কাছে যেতে পারেন এবং তাতে ভুলের সম্ভবনাও কম থাকে। রিপোর্টারকে অবশ্যই জানতে হবে যে নির্বাচনী ফলাফল এখন ঘোষণা করেন রিটার্ণিং অফিসার। নির্বাচন কমিশন ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করেন। ফলাফল সংক্রান্ত তথ্যের মূল উৎস হচ্ছে রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার সাথে জড়িত আছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর। কাজটির বিভিন্ন দিক সামাল দিতে আছে অনেক আইনকানুন, অধ্যাদেশ। একজন রিপোর্টারকে এসব আইন কানুন, সেগুলোর ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। তাকে জানতে হবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

পোলিং অফিসার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনী কর্মকর্তারা কীভাবে নিয়োগ পান। প্রতিটি স্তরের এসব ব্যক্তিরা রিপোর্টারের তথ্যের উৎস বা সূত্র হিসাবে কাজ করেন।

নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

নির্বাচন বা অনুরূপ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হতে পারে নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো, যদিও আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো গবেষণার খুব একটা মূল্য দেয় না। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), মাল্টিডিসিপ্লিনারি এ্যাকশন রিসার্চ সেন্টার (মার্ক), সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)– এসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভোটারদের আচরণ, নির্বাচন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভোটারদের ধারণা, আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি ভোটারদের সমর্থন, প্রার্থীদের শিক্ষা, আচরণ, পেশা, আর্থিক অবস্থা, ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক

স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকেন। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে তারা ব্যাপকভাবে আগামী অষ্টম সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। যারা ১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচন, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের সম্পর্কে রিপোর্টারকে জানতে হবে। এই সব বিভিন্ন পর্যবেক্ষক দল যে সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য আছে। এদের কাছ থেকে রিপোর্টাররা খুব সহজে তথ্য পেতে পারেন (নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, জনগণ কী ভাবছে এবং নির্বাচনী ফিচার-এই তিনটি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের নতুন নতুন দল এবার আসবে। কোনো কোনো দল ভোটের দিনের অনেক আগ থেকেই নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করবে। তারা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন, প্রধান রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে। যেসব দেশ থেকে এসব আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আসবেন এবং যেসব দেশ তাদের অর্থ যোগান দেবে সেইসব পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতেরা ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অষ্টম সংসদ নির্বাচনের সময় প্রধান সমস্যা কী কী হতে পারে তা চিহ্নিত করার জন্য। ভালো রিপোর্টের ইঙ্গিত পাবার জন্য একজন রিপোর্টারকে এসব কর্মকাণ্ড অনুসরণ করতে হবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ-পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে নির্বাচন

ফিলিপ গাইন এবং শিশির মোড়ল

গণতন্ত্র; নির্বাচন এসব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা মূলত একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। সারা বছর রিপোর্টাররা নির্বাচন বা গণতন্ত্রের মত বিষয় নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট প্রকাশ করেন যেখানে থাকে নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। কিন্তু সরকারের শেষ দিনগুলোতে বিশেষ করে ত্রয়োদশ সংশোধনীর পরে (যার ফলে ক্ষমতাসীন সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়), প্রধান উপদেষ্টাসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ, নির্বাচন কমিশনে বদলি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের বিশেষ অভিযান, প্রচারণা পর্ব এবং ভোটের দিনটি সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণের দাবি রাখে। কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, বিদেশী সংবাদমাধ্যম কর্মীরা নির্বাচনের প্রচারণা পর্ব এবং ভোটের দিনের ওপর নানা ধরনের কাজ করেন। যাঁরা নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচনের দিন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকা দরকার এবং হাতে থাকা দরকার প্রাসঙ্গিক তথ্য। এই অধ্যায়ে খুবই বাস্তব কতকগুলো বিষয় উপস্থাপন করা হলো যেগুলো প্রচারণার সময়, ভোটের দিন ও পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনা রিপোর্ট করতে রিপোর্টারকেএবং নির্বাচন পর্যবেক্ষককে সহায়তা করবে।

প্রাক নির্বাচনী প্রতিবেদন

১। প্রচারণাকালে অনিয়ম ও দুর্নীতি

দুর্নীতি এবং অনিয়ম বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এই কারণেই বাংলাদেশকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে যা বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকটা বেমানান। রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের নিজেদের ওপর আস্থা রাখা যায় না। শতরকম দুর্নীতি ও অনিয়মকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক দলগুলো যে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে বিজয়ী হতে চায় তার বহু উদাহরণ রয়েছে। এইসব দুর্নীতি ও অনিয়মের বেশির ভাগ দেখা দেয় প্রচারণা পর্বে এবং ভোটের দিনে। সাংবাদিকদেরকে এর ওপর

www.pathagar.com

নিয়মিত রিপোর্ট করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশী ও বিদেশী বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং তার ফলে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও লক্ষ করা গেছে। অনিয়মের কারণে ভোটাররা নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়েছেন। নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করতে সাংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বলে তাঁরা কর্তৃপক্ষ এবং ভোটারদেরও সচেতন করতে পারেন।

প্রচারণাকালে এবং ভোটের দিন ঘটে এমন কিছু সাধারণ অনিয়ম সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

ক) ভোট ক্রয়: এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশেই ভোট ক্রয়-বিক্রয় হয় । বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলাদেশে একটি ভোটের দাম কত বা গড়ে কত টাকা পান একজন ভোটার তার ভোট বিক্রি করে বলা মুশকিল। তবে এশিয়াউইক পত্রিকার ২১ এপ্রিল, ১৯৯৫ সংখ্যায় এশিয়ার কয়েকটি দেশের ভোটাররা সাধারণত ভোটপ্রতি কত পান তার একটি হিসাব ছাপা হয়েছে। হিসাবটি নিম্নরূপ:

ভারত	৩.২৫ ইউএস ডলার
ফিলিপাইন	৪.০০ ইউএস ডলার
থাইল্যান্ড	৪.০০ ইউএস ডলার
জাপান	১২৫.০০ ইউএস ডলার
তাইওয়ান	২০০.০০ ইউএস ডলার

অতীতে নির্বাচন এলেই মন্ত্রী অথবা সরকারি কর্মকর্তারা টিন, গম, নগদ অর্থ, কাপড়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সেবামূলক কাজে জড়িয়ে পড়তেন। এখন যেহেতু নির্বাচনের মাস তিনেক আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আসার বিধান রয়েছে তাই ক্ষমতা ছাড়ার আগেই তারা জনগণকে পক্ষে পাবার জন্য রিলিফ সামগ্রী বিতরণ করেন। মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রচারণাকালে ভোটারদের প্রভাবিত করা। ভোট কেনার জন্য এটা ক্ষমতার অপব্যবহার। ভোটারদেরকে এ সময় চাকুরি, চাকুরিতে প্রমোশন, ঋণ বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলা হয়।

"অনেক সময় নিজেদের টাকাই তাঁদেরকে ঘুষ দেয়া হয়। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৯৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে আঞ্চলিক দল তেলেগু দেশম কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভোটারদেরকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ক্ষমতায় গেলে তারা ভোটারদেরকে অত্যন্ত কম মূল্যে চাল দেবে। এখন তাদের স্বল্প মূল্যে চালের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেজন্য যে ভর্তুকি তাদের দিতে হবে তা সংগ্রহের ব্যাপারে তারা সমস্যায় পড়েছে। বিরোধীরা বলছে রাষ্ট্রের অন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে অর্থ এনে তা করা হবে,"(এশিয়া উইক, ২১ এপ্রিল, ১৯৯৫)।

ভোটারকে প্রভাবিত করার একটি গতানুগতিক নমুনা: নির্বাচনের বছরে ক্ষমতাসীন দল ভোটারদের প্রভাবিত করে ভোট কেনার জন্য রিলিফ বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দেয় অথবা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশের প্রধান দুটি দৈনিকের পরিবেশিত খবর অনুযায়ী ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র কয়েক মাস আগে আওয়ামী লীগ সরকার গম, চাল, নগদ টাকা ও শাড়ির বিশেষ বরাদ্দ দেয়। ২৩ এপ্রিল, ২০০১

www.pathagar.com

তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় ১০০,০০০ টন বাড়তি গম বরাদ্দের অনুমোদন করা হয় যা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল বরাদ্দ ৫০,০০০ টনের অতিরিক্ত। গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনুকূলে এই বাড়তি গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা বা সংসদীয় এলাকার রাজনৈতিক নেতা বা সাংসদদের ৫০০ টন করে গম বরাদ্দের পরিকল্পনা সরকারের ছিল (ইত্তেফাক, এপ্রিল ২৫, ২০০১)। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (১৯০ টন গম অথবা চাল), ধর্ম মন্ত্রণালয় (দুই কোটি টাকা) এবং প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (৪০০টি শাড়ি প্রতি সংসদীয় এলাকার জন্য) - এর মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হয়। এই বরাদ্দ ২০০১ সালের মে মাসের মধ্যেই ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ রয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ এবং রাজনীতিকরা এই বরাদ্দ ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন (প্রথম আলো, ৫ মে, ২০০১)।

খ) অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা: ভোটকেন্দ্রে যেয়ে ভোটাররা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে যাতে ভোট না দেয় সেজন্য আগেভাগেই টাকা দিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখার ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গ) ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যতগুলো অনিয়ম রয়েছে তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে ভোটারদেরকে আতঙ্কিত করা। নানাভাবে ভোটারদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা হয়। যেমন:

- যদি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে ভোট না দেয় তবে ভোটারদের ব্যবসার বা পেশার ক্ষতি করা।
- নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জোর করে বুথ উন্মুক্ত করতে বাধ্য করা, জাল ভোট দেয়া, ইচ্ছামত সীল মারা, ব্যালট বাক্স ধ্বংস করা এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পণবন্দির মতো আটকে রাখা।
- এলাকা বিশেষে নির্বাচনের দিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়া। অতীতের অনেক নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ভোটারকে জোর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেবারও উদাহরণ আছে।

১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংসদীয় উপনির্বাচনের সময় ভোলা-২ আসনের বোরহানউদ্দীন ও দৌলৎখান কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের 'গুন্ডারা' শত শত ভোটারকে ভীতি প্রদর্শন করে বলে স্থানীয় একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে কুতুবদিয়া ও অন্যান্য গ্রামের (ভোলায়) হিন্দু ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় জাতীয়তাবাদী দলের কর্মীরা। একজন ভোটার অভিযোগ করেন যে ১০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে কয়েকটি এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল ভোটারদেরকে আতঙ্কিত করার জন্য। যারা বোমা ফাটিয়েছিল তারা বলেছিল ভোটাররা যেন পরদিন ভোট দিতে ভোট কেন্দ্রে না যায় (গাইন, ১৯৯১)।

১২ জুন, ১৯৯৬ তারিখে সপ্তম সংসদ নির্বাচনের দিন এবং তার অব্যবহতির পরে সারা দেশের ২৫ টি উপজেলায় হিন্দুদের ওপর হত্যা, ধর্ষণ, শারিরীক নির্যাতন, বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, দোকান লুটপাট, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, অবরুদ্ধ করে রাখা—ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে মূলত বিএনপি, জাতীয় পার্টি, ফ্রিডম পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা হিন্দুদের ওপর এই নির্যাতন

www.pathagar.com

চালায় (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬-৭ জুলাই, ১৯৯৬)।

ঘ) যোগ্য ভোটারদের বাদ দেয়া: কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক (বিশেষ করে বিরোধীদলের) অনেক যোগ্য ভোটারকে রেজিস্ট্রেশনের সময় ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে এবং যে কোনো সময় এমন ঘটতে পারে।

ঙ) পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপ: বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে। "মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ভোট দেবেন না" সুশীল সমাজের এই ধরণের নির্দেশনা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা বলে অভিযোগ রয়েছে।

২। সন্ত্রাস

নির্বাচনী প্রচারণাকালে ঘটে এমনসব সন্ত্রাস ও নৃশংসতার ঘটনা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত রিপোর্ট করা উচিত। পুলিশ সূত্র মাঝে মধ্যে সন্ত্রাসপ্রবণ কেন্দ্র বা সংসদীয় এলাকার ইঙ্গিত দেয়। সন্ত্রাসীরা নির্বাচন বানচাল করতে পারে এমনসব কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন। বেআইনী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশ নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়। পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে ওইসব কেন্দ্রের তালিকা সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষকরা নিতে পারেন। সাংবাদিকরাও অনেক সময় পুলিশকে সতর্ক করে দিতে পারেন সন্ত্রাসের কোনো তথ্য দিয়ে।

নির্বাচন কমিশন সেপ্টেম্বর ১৩-১৪, ১৯৯৫ তারিখে দুদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা মেজিস্ট্রেট এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা তাতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বলা হয় যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে পারে। তাঁদের অনেকে বলেন অর্থ, মাস্তানি এবং আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে ইতিমধ্যেই অনেক এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

নানা মহল থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সন্ত্রাস-সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য আওয়ামী লীগ জন নিরাপত্তা আইন, ২০০০ পাস করার পরও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ এবং ১৯৯৯ এর আগস্ট থেকে যে চারদলীয় ঐক্যজোট সংসদ বর্জন করে আসছিল তাদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ১২ থেকে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে ১৩ জন নিহত এবং প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ আহত হয় (ইত্তেফাক, ২০ জুলাই, ২০০১)। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে সহিংসতা ততই বাড়বে—এটি হয়ত তারই আলামত।

১৯৯৯ সালের মার্চের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সারাদেশের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ৭০ জনের বেশি মানুষ ওইসব বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়– কিন্তু ওইসব বোমা বিস্ফোরণের জন্য যারা দায়ী সরকার তাদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। মানুষের মনে এখনো সেই বোমা আতঙ্ক রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পুলিশ সূত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে সন্ত্রাসের ওপর ভালো রিপোর্ট করা সম্ভব। তা ছাড়া পাওয়ার এণ্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এর মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের ওপর মানচিত্র তৈরি করে বা কোথায় কোথায় সন্ত্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে তা জরিপ করে বের করে। তারা এগুলো করে যেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সন্ত্রাস কমানোর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও একজন রিপোর্টার ভালো তথ্য পেতে পারেন।

৩। ভোটকেন্দ্র এবং অন্যান্য আয়োজন

ভোটকেন্দ্র কোথায় নির্মিত হলো এবং ভোটকেন্দ্রে কীসব ঘটনা ঘটে তা দেখা অত্যন্ত জরুরি। ভোটকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে যেসব অনিয়ম ঘটে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

ক) ভোটারদের দুর্বল অংশকে শক্তিশালী অংশের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া।

খ) প্রভাবশালীদের এলাকায় দুর্বলদের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

গ) নির্ধারিত দূরত্বের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

ঘ) ভোটকেন্দ্রে যেতে প্রাকৃতিক বাধা।

ঙ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

চ) সড়ক থেকে অনেক দূরে ঘিঞ্জি বা অযোগ্য ভবনে ভোটকেন্দ্র নির্মাণ।

ছ) একই ভবনে অনেকগুলো ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

জ) শেষ মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রের পরিবর্তন।

ঝ) কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের কাছে ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

৪। নির্বাচনী ব্যয়

নির্বাচনী ব্যয় এবং নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত যে নির্বাচনের সময় বিপুল অংকের কালো টাকার ব্যবহার ঘটে। "নির্বাচনের দিন ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য মাস্তান ভাড়া, ভোটার বা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে ঘুষ দেবার জন্য" সাধারণত প্রার্থীরা এই টাকা ব্যবহার করেন (কমনওয়েলথ রিপোর্ট, ১৯৯১:২০)।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ২০০১ সালের আগস্টে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর এক সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যয় বাদ দিয়ে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকা অতিক্রম করবে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কালো টাকার ব্যবহার কমানো ব্যয়সীমা বেধে দেবার একটি কারণ। এর আগে নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা ছিল তিন লক্ষ টাকা। তারও আগে এক লক্ষ টাকা।

নির্ধারিত ব্যয় সীমা একজন প্রার্থী কীভাবে লঙ্ঘন করছেন তা পর্যবেক্ষণ করা এবং তার ওপর রিপোর্ট করা খুবই কঠিন কাজ। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের মাথা

www.pathagar.com

ব্যাথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয়সীমা মেনে চলছেন কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের বিষয়। তদন্ত চালাবার পূর্বে বা নির্বাচনী ব্যয় পরীক্ষা করে দেখার আগে জানতে হবে একজন প্রার্থী আইনত কোন কোন খাতে নির্বাচনী অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হবার আগেই একজন প্রার্থীর সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎস, সম্পত্তির হিসাব, বাৎসরিক আয়ের হিসাব এবং প্রদত্ত করের হিসাব রিটার্ণিং অফিসারের অফিসে জমা দেবার আইন রয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনী ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে সকল প্রার্থীকে তাঁদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের জন্য দুই থেকে সাত বছরের কারাদন্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত আইনে রয়েছে নানা ফাঁক-ফোকর।

নির্বাচনী ব্যয়কে কেন্দ্র করে যত রকম অনিয়ম থাকতে পারে সে সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের সতর্ক থাকা উচিত। এ সম্পর্কিত আইন এবং আইনের সর্বশেষ সংশোধনী জেনে নেয়া প্রয়োজন। এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে বা নির্বাচন নিয়ে গবেষণা করে তাদের নানা ধরনের রিপোর্টও একজন সাংবাদিকের সংগ্রহে থাকা ভালো।

নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে একজন রিপোর্টার রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় বা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গিয়ে নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দলিলপত্র দেখে আসতে পারেন। নির্দিষ্ট ফি দিয়ে যে কেউ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের এক কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো একজন প্রার্থীর প্রকৃত ব্যয় পরিমাপের জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা নেই। সুতরাং একজন প্রার্থী যখন মিথ্যা হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা দেন তখন নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার থাকে না। এই অবস্থায় সংবাদ মাধ্যমে একটি ভালো রিপোর্ট হলে তা থেকে তদন্ত হতে পারে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে এবং এক ধরনের পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।

৫। ভোটার নিবন্ধীকরণ

অক্টোবর ২৬, ২০০০ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মে ১৫, ২০০০ তারিখ থেকে সারাদেশে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এদিন থেকে তথ্যসংগ্রহকারী ও ভোটার শনাক্তকারীরা ভোটার নিবন্ধনের জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এর আগে এপ্রিল ২৫, ২০০০ তারিখে নির্বাচন কমিশন নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। জুন ১৪ তারিখের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়। তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের পর জুলাই ১৮, ২০০০ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। খসড়া ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা ছিল ৭,৪৬,০০৭,৪৯ জন। এই তালিকার ব্যাপারে প্রাপ্ত আপত্তি, দাবি ইত্যাদি নিষ্পত্তি শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি ভোটার হবার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচনী

www.pathagar.com

সময়সূচি ঘোষণার আগ পর্যন্ত এসব আবেদন যাচাই করে নির্বাচন কমিশন তাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

দেশের ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশনা দান এবং সমন্বয় সাধনের কাজ করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। জেলা প্রশাসকগণ জেলার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপজেলার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপজেলার ভোটার রিভাইজিং অথরিটি হিসাবেও কাজ করেন। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে উপ-নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়কারী ও রিভাইজিং অথরিটির দায়িত্ব পালন করেন। জেলা পর্যায়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা হিসাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নে সহায়তা করেন। সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাচন কমিশন নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং তা তত্ত্বাবধানের কাজে সারা দেশে চার লাখেরও বেশি লোককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়। ভোটার তালিকা তৈরির বিষয়ে ২,৯১,২১৯ জন তথ্যসংগ্রহকারী ও শনাক্তকারী এবং ৭৩,০৯৩ জন সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার ছাড়াও ৬,১০০ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জুলাই ১৫, ২০০০ তারিখ থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের সহায়তায় সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তাগণ খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করেন।

ভোটার নিবন্ধনের জন্য এবার সাড়ে ৮ কোটি ফরম ছাপানো হয়েছিল। দেশে প্রথমবারের মত কম্পিউটার পদ্ধতিতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য ৬৯ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিবন্ধনকৃত মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,৪৮,২৩,৮৫৫ জন। খসড়া তালিকা থেকে তা ২২৩,১০৬ জন বেশি। ১৯৯৫ সালের ভোটার সংখ্যা ছিলো ৫,৫৯,৬৬,৩৮৪। দেখা যাচ্ছে ১৯৯৫ সালে প্রণীত ভোটার তালিকা থেকে এবার ভোটার বেড়েছে ১,৮৮,৫৭,৪৭১ বা ৩৩%। নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩,৮৫,৩০,৪১৪ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩,৬২,৯৩,৪৪১ জন। গতবারের মতো এবারও প্রবাসী বাংলাদেশীরা ভোটার হতে পারেননি।

ভোটার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, নিবন্ধন পদ্ধতি সহজ করা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনেক সময় নিয়ে তালিকা প্রণয়নের ফলে ভোটার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। তবে খসড়া তালিকা প্রণয়নের পর প্রধান বিরোধীদল বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া নতুন ভোটার তালিকায় ভোটার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বলে অভিযোগ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে এটি হচ্ছে ষষ্ঠ ভোটার তালিকা। এর ভিত্তিতেই আগামী অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ১৯৭৩, ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৯০ ও ১৯৯৫ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯০ সালের ভোটার তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬,১৯,৬৩,১০৮ জন যা ১৯৯৫ সালে কমে গিয়ে হয়েছিল ৫,৫৯,৬৬,৩৮৪ জন। ১৯৯০ সালে ভোটার হওয়ার যোগ্য নয় এমন ব্যক্তির নিবন্ধন ও এক ব্যক্তির একাধিকবার নিবন্ধনের অভিযোগ উঠেছিল। ওই তালিকা সম্পর্কে

www.pathagar.com

কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদল তাদের ১৯৯১ সালের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে বলে, "১১৩ মিলিয়ন মানুষের দেশে ৬২.৩ মিলিয়ন ভোটার এক অস্বাভাবিক ভোটার নিবন্ধন চিত্র।"

বর্তমান ভোটার তালিকা নিয়ে বিএনপির উদ্বেগ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন চট্টগ্রাম-২ ও লক্ষ্মীপুর এই দুটো ইলেক্টোরাল ডিস্ট্রিক্টের ভোটার লিস্ট যাচাই করে কিছুটা অস্বাভাবিকতার ইঙ্গিত পেয়েছে। এই দুটো ইলেক্টোরাল ডিস্ট্রিক্টে প্রায় ১২৮,০০০ ভোটার ভূয়া বা ভৌতিক বলে নির্বাচন কমিশন সন্দেহ প্রকাশ করছে।

লক্ষ্মীপুরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ৮৯০,৯৯৬ নামের মধ্যে ১৩৮,০০০ টি নাম নির্বাচন কমিশন দুই থেকে ৮৫ বার পর্যন্ত পেয়েছে। লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে মনোয়ারা বেগম, স্বামী আবুল কালাম, এই নামটি ভোটার তালিকায় ৮৫ বার উঠেছে। প্রদত্ত ঠিকানায় গিয়ে তিনি ২৫ জন মনোয়ারা বেগমকে পেয়েছেন একই স্বামীর নামে (প্রথম আলো, জুলাই ১৮, ২০০১)।

ভোলার ভোটার তালিকায় ব্যপক অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশন তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ২০০১ সালের জুলাই মাসে ১২০০ টি নাম র‍্যানডম যাচাই করে ওই কমিটি ৮৫৭ টি নাম চিহ্নিত করে যারা ভূয়া। ভূয়াদের মধ্যে ৭০০ টি নাম দুবার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, ১৩০ ভোটার ভৌতিক এবং ২৭ টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বিএনপি নেতা মেজর (অব:) হাফিজউদ্দীন আহমেদ (বিবি) এর অভিযোগের ভিত্তিতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় (দি ডেইলী স্টার, জুলাই ১৭, ২০০১)।

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে আভাস পাওয়া যায় যে ভোটার তালিকায় ব্যপক ত্রুটি রয়েছে। এই ভোটার তালিকা নিয়ে সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং গবেষকদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে যা প্রকারন্তরে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করতে সহায়তা করে। একটি পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের পূর্বশর্ত নির্ভুল ভোটার তালিকা।

৬। রাজনৈতিকদল

রাজনৈতিকদলগুলোর কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা-উপজেলা বা তারও নিম্ন পর্যায়ের কার্যালয়গুলো নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হিসাবে কাজ করে। প্রচারাভিযান কালে রাজনৈতিকদলের পক্ষ থেকে নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় এবং সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ওইসব সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ সম্মেলন থেকে একজন রিপোর্টার অনুসন্ধানী রিপোর্ট বা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট তৈরির নতুন তথ্যসূত্র পেতে পারেন। রাজনৈতিকদল, তাদের নেতা এবং প্রার্থীদের ঠিকমত বুঝতে হলে রাজনৈতিকদলের অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করা দরকার।

৭। নিরাপত্তা

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশত। নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা বিধানকল্পে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেদিকে আলাদা দৃষ্টি রাখা একজন রিপোর্টার বা পর্যবেক্ষকের প্রধান কাজ।

www.pathagar.com

সামরিক ছত্রছায়ায় বেসামরিক সরকারগুলোর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো সম্পর্কে ভোটারদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর উপনির্বাচনের সময়ও অনেক এলাকার ভোটাররা সন্ত্রাস ও নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। এরশাদ সরকারের সময়কার নির্বাচনে "পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্বাচনী অসদাচরণে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল" (কমনওয়েলথ রিপোর্ট, ১৯৯১:২০)।

ভোটের দিনে নিরাপত্তা কর্মীদের ওপর যেন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকে সেরকম ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়েছিল। প্রতি কেন্দ্রে দুইজন পুলিশ ও ১০ জন আনসারসহ মোট ১২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ রাইফেলস্ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছিল। ভ্রাম্যমান মেজিস্ট্রেট ছিলেন যাঁরা প্রয়োজনে যে কোনো কেন্দ্রে সেনা সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ২৪,১৪২টি ভোট কেন্দ্রে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোট ৩৮৩,০০০ জন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ২৫,৯৫৭ টি কেন্দ্রের জন্য ৩৭৫,০০০ জন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা হয়।

একজন রিপোর্টার বা পর্যবেক্ষকের দেখা উচিত অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থা বা আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় "গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০১" অনুযায়ী ভোটের দিন নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ, আনসার, বিডিআর, কোস্টগার্ড ও সশস্ত্র বাহিনী বিনা ওয়ারেন্টে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবে এবং আপত্তিকর মালামাল জব্দ করতে পারবে। আগে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র পুলিশের ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কোনো সদস্য যদি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পালন করতে ব্যর্থ হন তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সংশোধনীতে বলা হয়েছে। আইনে যে সংস্কার করা হয়েছে তা নিরাপত্তা বিধানে কতটুকু কার্যকর হবে তা দেখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৮। সংসদীয় এলাকা

অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত ভোটারের সংখ্যা ৭৪,৮২৩,৮৫৫, গড়ে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ভোটারের সংখ্যা ২৪৯,৪০০। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫৬,৭১৬,৯৫৩, গড়ে প্রতি আসনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮৯,০৫৬। কিন্তু কয়েকটি আসনে ভোটারের সংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। এমনও আছে যে একটি আসনের ভোটারের সংখ্যা অন্য একটি আসনের ভোটারের সংখ্যার দ্বিগুনেরও বেশি।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারিত হয় সাধারণত সর্বশেষ জনসংখ্যা জরিপের ভিত্তিতে। নির্বাচন কমিশন মে ৩০, ১৯৯৫ তারিখে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদীয় এলাকার সীমানা চূড়ান্ত করে। এর আগে ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৯৫ তারিখে নির্বাচন কমিশন খসড়া সীমানা ঘোষণা করে এবং কারো কোনো আপত্তি থাকলে তা কমিশনে জানাতে বলে। পরবর্তী কালে প্রকাশ্য শুনানি শেষে বেশ কয়েকটি সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

www.pathagar.com

৯। প্রার্থীদের প্রস্তুতি

প্রার্থীর প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা একজন রিপোর্টারের নিয়ম মাফিক কাজ। এলাকায় প্রার্থীদের প্রস্তুতি কেমন তা নিয়ে অধিকাংশ সংবাদপত্র বিশেষ রিপোর্ট ছেপে থাকে। অতীতে দেখা গেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী বা ছোট দলের প্রার্থী বৃহত্তর কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সম্পর্কে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে। অনেক সময় প্রভাবশালী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র বা দুর্বল প্রার্থীকে নানা রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে।

অনেক সময় প্রার্থীরা সন্ত্রাস বা অনিয়মের পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। তা থেকে ভালো রিপোর্ট করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সতর্ক করা যেতে পারে।

প্রচারকালে বা নির্বাচনের দিন অনেক প্রার্থী এবং তাদের কর্মীরা নানাভাবে ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। স্থানীয় নির্বাচন পর্যাবেক্ষকদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোটের আগে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছিল। সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছিল তারা যেন বিশেষ দলের প্রার্থীদের ভোট দেয়।

টাকা-পয়সা দিয়েও প্রার্থীরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা জানান ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ দলের প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য কোনো কোনো এলাকায় ভোটারদেরকে নগদ অর্থ দেয়া হয়েছিল। লাকসামের এক ভোটকেন্দ্রে এক মহিলা ভোট দেবার পর প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে টাকা দাবি করেন। কারণ জানতে চাইলে ওই মহিলা বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিলে তাঁকে টাকা দেয়া হবে বলে বলা হয়েছিল। বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে দেখা যায় পর্যবেক্ষণকৃত ১,৩৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে তাঁরা ২১৯টি কেন্দ্র থেকে অভিযোগ পেয়েছেন যে, ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য সেখানে টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচনে জেতার জন্য প্রার্থীর প্রস্তুতি, বেআইনী পন্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা, আচরণবিধি লঙ্ঘন এসব পর্যবেক্ষণ করে একজন রিপোর্টার চমৎকার রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেন।

১০। ভোটারদের মেজাজ

অতীতের বহু নির্বাচনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোটারদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোটারদেরকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে দেখা গেছে। সাংবাদিক বা নির্বাচন পর্যবেক্ষককে ভোটার সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য জানতে হবে:

ক) দলীয় কর্মীদের ভয়ে ভোটাররা আতঙ্কগ্রস্ত কিনা;

খ) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পর্কে ভোটাররা সন্দিহান কিনা;

গ) প্রচারকালে ও ভোটের দিন সন্ত্রাসের সম্ভাবনা আছে কিনা;

ঘ) ভোট দেবার ব্যাপারে নিশ্চিত কিনা।

একটি এলাকার মহিলা ভোটাররা ভোট দেবার ব্যাপারে কী ভাবছেন তা জানা খুব জরুরি। ভোট সুষ্ঠু ও অবাধ হবে কিনা তা অনেক সময় জেনে নেয়া যায় মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করে। মহিলারা ভোট দিতে যাচ্ছেন কিনা অথবা কোনো রকম ভয় পাচ্ছেন কিনা এসব প্রশ্নের উত্তরই সে এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়।

www.pathagar.com

ভোটের দিনে রিপোর্ট/পর্যবেক্ষণ

নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্টের জন্য ভোটের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটের দিনে একজন সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষককে কতকগুলো বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আগে থাকতেই তাকে জানতে হবে একটি কেন্দ্রে কী কী নির্বাচন সামগ্রী থাকে এবং সেগুলোর কাজ কী:

ক) ব্যালট বাক্স: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ছোট ২টি অথবা বড় একটি (প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি অতিরিক্ত)।

খ) ব্যালট পেপার: ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ঠিক ততটি ব্যালট পেপার।

গ) ভোটার তালিকা: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি।

ঘ) অমোচনীয় কালি: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি এবং কেন্দ্রের সব কটি ভোটকক্ষের জন্য অতিরিক্ত এক শিশি।

ঙ) রাবারের সীল মোহর: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি।

চ) বর্গাকার সীল মোহর: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি অতিরিক্ত।

ছ) স্ট্যাম্প প্যাড: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি।

জ) গালা: প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউন্ডের এক প্যাকেট।

ঝ) পিতলের সীলমোহর: প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি।

ঞ) চটের থলি: ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি বহনের জন্য কেন্দ্রপ্রতি একটি।

ট) প্যাকেট: বিভিন্ন প্রকার ব্যালট (ব্যবহারের পর), মুড়ি বই এবং ভোটার লিস্ট রাখার জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১৫টি প্যাকেট রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হয়। ভোটের দিন বিশেষ করে ভোট গণনার সময় যে সমস্ত অনিয়ম ঘটে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে গেলে এই প্যাকেটগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

প্যাকেট-১ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য। প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি অতিরিক্ত।

প্যাকেট-২ গণনা হতে বাদ দেয়া ব্যালট পেপার রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-৩ প্যাকেট-১ এবং প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-৪ অব্যবহৃত ব্যালট পেপার রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-৫ বাতিলকৃত ব্যালট পেপার রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-৬ টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি প্যাকেট প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে এবং যে কক্ষে টেন্ডার্ড ভোট দেয়া হবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি একটি হিসাবে সরবরাহ করবেন।

প্যাকেট-৭ সকল প্যাকেট-৬ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

www.pathagar.com

প্যাকেট-৮ : আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। এই প্যাকেট প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে।

প্যাকেট-৯ : চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপি রাখার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১০ : ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখবার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১১ : টেণ্ডার্ড ভোটার তালিকা রাখবার জন্য। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১২ : আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখবার জন্য। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১৩ : ফলাফল (গণনার পর) রাখার জন্য। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১৪ : ব্যালট পেপারের হিসাব রাখার জন্য। প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি।

প্যাকেট-১৫ : বিবিধ কাগজ-পত্র রাখবার জন্য । প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি।

ভোট পুনর্গণনা বা নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলা হলে এই প্যাকেটগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভোটগ্রহণ: শুরু ও শেষ

ভোটগ্রহণ ঠিক ক'টার সময় শুরু হলো তা দেখার জন্য একজন সাংবাদিক বা পর্যাবেক্ষককে কোনো একটি কেন্দ্রে ঘোষিত সময়ের বেশ আগেই উপস্থিত থাকা দরকার। নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে যদি ভোট গ্রহণ শুরু হয় তবে তার কারণ প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আরও ভালো তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন সাংবাদিক আরও কতকগুলো প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন (Moral, 1992):

- সব প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উপস্থিত আছেন কিনা।
- ভোটারদের আঙুলে কালি লাগানো হচ্ছে কিনা।
- ব্যালট পেপারে ভোটারের স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপ রাখা হচ্ছে কিনা।
- প্রতিটি মুড়ি বই এর প্রথম নম্বরটি লিখে রাখতে হবে।
- মোট ক'টা মুড়ি বই ব্যবহৃত হলো তার হিসাব রাখতে হবে। সর্বশেষ মুড়ি বইয়ের শেষ ব্যালট পেপারটির ক্রমিক নম্বর লিখে রাখতে হবে।
- একজন ভোটারের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ এবং ভোট দিয়ে বের হতে কত সময় লাগে তার একটা হিসাব নিতে হবে। প্রতি ঘন্টায় কত জনের ভোট দেয়া হচ্ছে তার একটা হিসাব রাখতে হবে।
- অবাঞ্ছিত কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে ঢুকে কোনো রকম প্রভাব খাটালে তার বিবরণ রাখতে হবে।
- ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ভোটার, প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টেদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা।
- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা।
- দেশী বা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কোনো মতামত আছে কিনা।
- নির্ধারিত বয়স সীমার (১৮ বছর) নিচে কেউ ভোট দিতে এলে তার নাম এবং ক্রমিক নম্বর জেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

- ভোটার তালিকায় নাম নাই, ভোট দিতে এসে দেখে ভোট দেয়া হয়ে গেছে, কেউ দু'বার ভোট দিতে এসেছে-এ ধরনের কোনো অভিযোগ থাকলে সঠিক সময়, নাম এবং ক্রমিক নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।
- জাল ভোট সংক্রান্ত অভিযোগ কয়টি তার হিসাব রাখতে হবে।
- ঠিক ক'টার সময় ভোট গ্রহণ শেষ হলো।

ভোটকেন্দ্রের মূল ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

একটি ভোটকেন্দ্রে মূল দায়িত্ব যারা পালন করেন তাঁদের সম্পর্কে একজন রিপোর্টার বা নির্বাচন পর্যবেক্ষকের জানা থাকা দরকার। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক একটি ভোটকেন্দ্রে কমপক্ষে ১৭ জন কর্মকর্তা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন:

নির্বাচনী কর্মকর্তা	সংখ্যা
প্রিসাইডিং অফিসার	১ জন
সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার	৫ জন
পোলিং অফিসার	১০ জন
অতিরিক্ত পোলিং অফিসার	১ জন

এছাড়া প্রত্যেক প্রার্থী প্রতিটি বুথে একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। আর থাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজন। পর্যবেক্ষক (দেশী এবং বিদেশী) এবং সাংবাদিকদের অনেক সময় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়।

ভোটদান পদ্ধতি

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে হবে ৩০,০০০ এর মতো। ১৯৯৬ সালে ছিল ২৫,৯৫৭ টি কেন্দ্র এবং ১১৪,৭৪৯ টি বুথ। প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ভোটার সংখ্যা ছিল ২১৫৬। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে পাঁচটি বুথ থাকে। নির্বাচন কমিশনের মতে সাধারণত প্রতি কেন্দ্রে ২০০০ করে ভোটার থাকলে ভোটগ্রহণে সুবিধা হয়।

ভোটকেন্দ্রে একজন ভোটার ভোট দিতে উপস্থিত হলে:

ক) প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার প্রথমে ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভোটারের নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা ডাকা হয়। তারপর তাঁকে একটি ব্যালট পেপার দেয়া হয় এবং ভোটার তালিকায় একটি চিহ্ন দেয়া হয়।

খ) ভোটারের বৃদ্ধাঙ্গুলে বা অন্য কোনো আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন বা দাগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। যদি থাকে তবে ওই ভোটারকে ব্যালট পেপার দেয়া হয় না।

গ) যদি কোনো দাগ বা চিহ্ন না থাকে তবে তাঁর আঙুলে কালির দাগ দেয়া হয় এবং তাঁকে একটি ব্যালট পেপার দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ঘ) ভোটারের ক্রমিক নম্বর মুড়ি বইয়ের অব্যবহৃত অংশে লিখে রাখা হয় এবং সেখানে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসই রেখে দেয়া হয়। যে ব্যালট পেপারটি ভোটারকে দেয়া হয় তার পিছন দিকে একটি সীল মারা থাকে। (যদি কোনো এজেন্ট সীল আছে কিনা তা দেখতে চান তবে ভোটার তাঁকে তা দেখাবেন)।

ঙ) ব্যালট পেপার নিয়ে যাবার আগে প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসারকে নিশ্চিত হতে হবে যে ভোটারের আঙুলে দেয়া কালি শুকিয়েছে (কালি শুকাতে সাধারণত ১০ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে না)।

চ) ভোটার ব্যালট পেপার এবং কালি লাগানো একটি সীল মোহর নিয়ে পর্দাঘেরা কক্ষে প্রবেশ করবেন তাঁর পছন্দের প্রতীকে সীল মারার জন্য।

ছ) প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত নির্দিষ্ট স্থানের যেকোনো জায়গায় গোপনভাবে ভোটার সীলমোহরের ছাপ দেবেন।

জ) ভোটার তারপর ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করবেন এবং পর্দাঘেরা কক্ষ থেকে বের হয়ে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে ফেলবেন (ব্যালট বাক্সটি প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার এবং এজেন্টরা দেখতে পারেন এমন জায়গায় থাকে)।

ঝ) ভোটার অযথা দেরি না করে ভোট দেবেন এবং দেওয়ার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছাড়া শুধু মাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার আছে:

ক) নির্বাচন কাজে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি;

খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্ট;

গ) রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ (পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক)।

ভোটদানকালীন প্রতারণা

বাংলাদেশের নির্বাচনে নানা ধরনের প্রতারণা অনেকটা স্থায়ী হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের কাজ এসব প্রতারণার ওপর সময়মতো রিপোর্ট করা। ফিলিপিন্সের নির্বাচনী প্রতারণার সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতারণার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

- অন্য ভোটারের বেশে এসে তাঁর ভোটটি দিয়ে যাওয়া অর্থাৎ জাল ভোট দেয়া।
- নির্বাচন বুথে প্রবেশের মুহূর্তে ভোটারকে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে প্রভাবিত করা।
- ব্যালট এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী অনেক সময় নিয়ে সরবরাহ করে ভোটারদের নিরুৎসাহিত করা।
- যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করে ভোটারদের আসতে নিরুৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

- প্রতিবন্ধী ভোটারদের সাহায্যের অজুহাতে নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ দিয়ে দেয়া।
- জোর করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং তা নষ্ট করা।
- ব্যালট পেপার, সীল, বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচন সামগ্রী বা কাগজপত্র চুরি করা এবং ধ্বংস করা।
- নির্বাচনী কর্মকর্তারা কোনো চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ করলে তাঁদের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য ঘুষ দেওয়া।
- ভোটকেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমাণ ভোটারদের নিরুৎসাহিত করার জন্য বা অসুবিধায় ফেলার জন্য কেন্দ্রের বাইরে সাঁটা ভোটার তালিকা চুরি বা বিনষ্ট করা।
- ভোটার সংখ্যার বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা।
- ভোটকেন্দ্র দখল, সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ইচ্ছামত ব্যালট পেপারে সীল মারা।
- ভোটার এবং পোলিং এজেন্টদের জোর করে কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করা।
- *জাল ভোট চক্র* – কোনো কোনো সময় একজন প্রার্থী তাঁর পক্ষে কতকগুলো ভোট নিশ্চিত করার জন্য কয়েকজন ভোটারকে ব্যবহার করেন। ভোট নিশ্চিত করার জন্য তারা একটি চক্র তৈরি করে। প্রথম ভোটার অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে আনা একটি ব্যালট পেপার বা একই রকম দেখতে একটি নকল ব্যালট পেপার নিয়ে কেন্দ্রে ঢোকে। কেন্দ্রে সে নিজের নামের ব্যালট পেপারটি সংগ্রহ করে। কিন্তু ব্যালট বাক্সে নকল ব্যালটটি ফেলে এবং নিজের ব্যালটটি কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে ওই ব্যালটটি নিয়ে অন্য ভোটার কেন্দ্রে যায় এবং ওই ব্যালটটি বাক্সে ফেলে নিজেরটা ভোটকেন্দ্রের বাইরে নিয়ে আসে। এভাবেই চলতে থাকে।

গণনার সময় প্রতারণা

- ব্যালট পেপার ভুল পড়া।
- টালি পত্রে ভুল তথ্য তুলে রাখা।
- রিটার্ণিং অফিসারের দপ্তরে যে তথ্য দেয়া হবে সেখানে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দেয়া।
- প্রকৃত ব্যালট পেপারের পরিবর্তে অন্য ব্যালট পেপার সরবরাহ করা।
- গণনার পরপরই নির্বাচন সামগ্রী চুরি, ছিনতাই বা নষ্ট করে ফেলা অথবা সেগুলো সরিয়ে ফেলে বিকল্প বা নতুন সামগ্রী হাজির করা।

রিটার্ণিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল যাবার পথে অনিয়ম

- নির্বাচনের ফলাফল, ব্যালট পেপার রিটার্ণিং অফিসারের দপ্তরে যাওয়ার পথে চুরি বা ছিনতাই অথবা নষ্ট করে ফেলা।
- ঘুষের মাধ্যমে অথবা জোর করে আসল ব্যালট পেপার সরিয়ে নতুন ব্যালট পেপার রাখা।
- প্রকৃত ফলাফলকে জনগণের কাছে অবিশ্বাস্য করার জন্য এই সময় সাংবাদিকদেরকাছে মিথ্যা তথ্য দেওয়া।

www.pathagar.com

নির্বাচনোত্তর রিপোর্টিং/পর্যবেক্ষণ

নির্বাচন শেষ হলেও সাংবাদিক ভোট গণনা, ভোট জালিয়াতি, আনন্দ মিছিল ইত্যাদির রিপোর্ট অব্যহত রাখতে পারেন।

যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন তারা কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। আরও পরে তারা তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ওইসব রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র অন্তত ফলো-আপ রিপোর্ট করার জন্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কমনওয়েলথ গ্রুপ যে সুলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করে তা বিশ্লেষণমূলক রিপোর্টের জন্য সহায়ক। যেসমস্ত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী পরাজিত হন তারাও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। রিপোর্টারকে সেসব দিকে নজর দিতে হবে।

References

ASIAWEEK April 21, 1995. How Free a Choice? Voters face a Host of Challenges in the "Year of Elections."

Commonwealth Observer Group, 1991. Parliamentary Elections in Bangladesh: The Report of the Commonwealth observer Group. Commonwealth Secretariat, London.

Dutta, Shyamal. September 14, 15, 1995. Bhorer Kagoj.

Gain, Philip. Dhaka Courier, September 20-26, 1991. By-elections: Return to Past Follies.

Garber, Larry. 1990. GUIDELINES FOR INTERNATIONAL ELECTION OBSERVING. The International Human Rights Law Group. USA.

Kutty, K. Govindan. 1994. Seshan-An Intimate Story.

Moral, Shishir. CCHRB, 1992. Nirbachan Parjabekhhan Manual (Election Observation Manual).

NAMFREL (National Citizens Movement for Free Elections), Manual no. 2. Pollwatching. The Philippines.

NAMFREL (Philippines). Manual on Pollwatching.

Ministry of Law and Justice. The Representation of the People Order, 1972 (P.O. 155 of 72).

Timm,R.W. and Gain, Philip. CCHRB, 1991. Election Observation Report, Election to the 5th Parliament, 1991.

Timm, R.W. and Gain, Philip. CCHRB, Upazila Election 1990 Observation.

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন: গঠন ও কার্যপ্রণালী

মুনীরুজ্জামান

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করে। একজন প্রতিবেদক অথবা সংবাদ মাধ্যমের জন্য কাজ করেন এমন কেউ যদি নির্বাচন নিয়ে লিখতে চান তবে তাঁর নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।"

সংবিধানে আরও বলা হয়েছে [অনুচ্ছেদ-১১৯(১)], "সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী-

ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
গ) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং
ঘ) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।"

সংসদ নির্বাচন

সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালের গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে আইনগত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।

সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় নির্বাচন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হবে। একজন ব্যক্তি সংসদীয় নির্বাচনের জন্য কোনো একটি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকভূক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন যদি তিনি–

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) বয়স আঠারো বৎসরের কম না হয়;

গ) কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক অ-প্রকৃতস্থ ঘোষিত না হন; এবং

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

১৯৮২ সালের ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ৭নং ধারার ৮নং উপ-ধারায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যাস করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ সদস্যগণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি, ১৯৯১-এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।"

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিম্ন লিখিত স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা রাখে:

ক) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

খ) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

গ) পৌরসভা নির্বাচন

ঘ) তিনটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন

অনুচ্ছেদ ১১৮(৪)-এ বলা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবলমাত্র সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন। অনুচ্ছেদ ১২৬-এ বর্ণনা করা হয়েছে, "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।"

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কমিশনের কার্যবিধির আওতায় পড়ে: নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিচালনা, নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা। নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে না, কিন্তু উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে পারে। গেজেট আকারে ফলাফল প্রকাশিত হবার পর নির্বাচন কমিশন কোনো সংসদীয় নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করতে পারে না।

নির্বাচন কমিশনের কাঠামো

সংবিধান অনুযায়ী একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং এক বা তার অধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচনকার্য পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। এটি সরকারের অন্যান্য সচিবালয় বা বিভাগের মতোই এবং এটি কার্যত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে একটি সহকারী নির্বাহী বিভাগ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রয়েছেন একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব, (বর্তমানে)তিনজন যুগ্মসচিব, পাঁচজন উপসচিব, সতেরজন সহকারী ও সিনিয়র সহকারী সচিব, একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা।

নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম

ক) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

- সকল জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।
- সংসদীয় নির্বচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।
- গণভোট এবং রাষ্ট্রপতি, সংসদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদি নির্বাচনসমূহ (উপনির্বাচন ও পুনঃনির্বাচনসহ) পরিচালনা করা।
- রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রতিক সংরক্ষণ ও বরাদ্দ করা।
- প্রত্যেক নির্বাচনের আগে সারা দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা তদারকি করা এবং নির্বাচনী কর্মকর্তা অর্থাৎ রিটার্ণিং অফিসার, সহকারী রিটার্ণিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা।
- ব্যালট পেপার ছাপানো ও সরবরাহ করা।
- অমোচনীয় কালি তৈরির উপাদানসহ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং তা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বিতরণ করা।
- ব্যালট বাক্স সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- নির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য সারা দেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নির্বাচনের ফলাফল বিন্যাস এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে গেজেট আকারে প্রকাশ করা।
- নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এরসাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে বর্ণিত কার্যাবলী পালন করা।
- নির্বাচন পদ্ধতির প্রচার ও প্রয়োগ করা।
- গবেষণা, রেফারেন্স ও রেকর্ড রাখার জন্য নির্বাচনের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলিত করা।
- প্রতিটি নির্বাচনের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা।
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আইন প্রয়োগ করা।

খ) মাঠ পর্যায়

- বিভাগীয় পর্যায়: দেশের ছয়টি বিভাগীয় সদর দফতরে ছয়জন উপ-নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত

www.pathagar.com

আছেন। বিভাগীয় দফতরের কাজ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর অধিনস্ত মাঠ পর্যায়ের দফতরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া সব ধরনের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, ভোটার নিবন্ধন ও ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশন সময় সময় যেরকম নির্দেশ দেয় তার সমন্বয় সাধন করাও বিভাগীয় নির্বাচনী দফতরের কাজ।

- জেলা পর্যায়: দেশের ৬৪টি জেলায় ৮৩টি জেলা নির্বাচনী অফিস রয়েছে। এসব অফিসের দায়িত্বে আছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ ভোটার নিবন্ধন; ভোটার তালিকা ছাপানো; জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা; পুলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া; নির্বাচনের সময় সকল সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা; রিটার্ণিং অফিসারদের সম্ভাব্য সবরকমের সহায়তা প্রদান; পুলিং অফিসারদের ফর্ম, প্যাকেট, ম্যানুয়াল, ব্যালট পেপার, ব্যলট বাক্স ও ভোটার তালিকা সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য পৃথক পৃথক ব্যয়ের হিসাব রাখা এসব দায়িত্ব পালন করেন।
- উপজেলা পর্যায়: মাঠ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্নে উপজেলা নির্বাচনী অফিস। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একজন করে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রয়েছেন। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের নির্বাচনী অফিসকে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়তা করা।

গ) রিটার্ণিং অফিসার ও সহকারী রিটার্ণিং অফিসার

সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন বা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোনো বিশেষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে রিটার্ণিং অফিসার ও সহকারী রিটার্ণিং অফিসারদের নিয়োগ করেন।

ঘ) প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার

একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সাধারণত পাঁচটি করে বুথ থাকে। এই বুথগুলো এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যাতে প্রতিটি বুথে নির্বাচনের দিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চারশ ভোটার ভোট দিতে পারে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। তাকে সহায়তা করার জন্য এজন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পুলিং অফিসার থাকেন যারা বুথগুলোর দায়িত্বে থাকেন। প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসারদের নিয়োগ করা হয় সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তাদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, সততা ও সাহসিকতার ভিত্তিতে।

ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে নির্বাচন কমিশনের স্থায়ী অফিস রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছেন একজন করে উপ-নির্বাচন কমিশনার এবং একজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার। জেলা পর্যায়ে রয়েছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা।

নির্বাচন কমিশনের অধীনে ১৯৯৪ সালে দুই জন সার্বক্ষণিক গবেষক নিয়ে একটি গবেষণা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ইলেকটোরাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে যার কাজ হচ্ছে নির্বাচন কর্মকর্তা ও পুলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন করা। এই

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট থেকে কখনো কখনো রাজনীতিবীদ ও সাংবাদিকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারাদেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঢাকায় উর্ধ্বতন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের জন্য এক বা দুই দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এসকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেদের এলাকার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। উপনির্বাচনের আগেও এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচনী এলাকার সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। ভোটারদের সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট তথ্যচিত্র, পোস্টার এবং লিফলেট তৈরি করে। ১৯৯৫ সালের আগে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত।

নির্বাচন কমিশন হচ্ছে একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র সংবিধান এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। কমিশন এর প্রধান বা যেকোনো সদস্য যেকোনো কর্মকর্তাকে আইনানুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো ক্ষমতা পরিচালনা ও প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারে।

কমিশন নির্বাচনে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখে।

নির্বাচন পরিচালনা করার সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জেলা পর্যায়ে একজন করে রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করেন। একটি সংসদীয় এলাকায় রিটার্ণিং অফিসারকে সহযোগিতা করেন এক বা একাধিক সহকারী রিটার্ণিং অফিসার।

জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারকে রিটার্ণিং অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহকারী রিটার্ণিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সাধারণত জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা সহকারী রিটার্ণিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।

রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করে থাকেন। এই ধরনের সকল নিয়োগ কর্তব্যমূলক এবং অস্থায়ী। নির্বাচনের সকল কাজ শেষ হলে এই নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়।

সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি

সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে:

- প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি।
- নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ।
- ভোটার তালিকা তৈরি।
- রিটার্ণিং অফিসার ও সহকারী রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ।
- ভোটকেন্দ্র স্থাপন।
- প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসার নিয়োগ।
- নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ভোটার তালিকা সরবরাহ।
- নির্বাচনের কর্মসূচি প্রণয়ন।

www.pathagar.com

- প্রার্থীদের প্রতিক বরাদ্দ করা।
- নির্বাচনের সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ।
- নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট গণনা।

নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্বাচন কমিশনের নির্ভরতা: যদিও সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা দিয়েছে তবুও নির্বাচন কমিশন কার্যত রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কোনো কর্মচারীকে নিয়োগ দিতে বা বদলি করতে পারেন না। এমনকি কোনো কর্মচারীর ওপর কোনো ধরনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না।

যখন নির্বাচনের জন্য কোনো প্রতিবেদন তৈরি করা হবে তখন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ভিত্তি, এর কাঠামো, কার্যাবলী এবং এর সচিবালয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে হবে।

নির্বাচনী তদন্ত কমিটি: নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি নির্বাচনী তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোট গ্রহণের আগে পর্যন্ত সংঘটিত নির্বাচনী অনিয়ম তদন্ত করে নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট পেশ করবে। সে রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচন কমিশনে তথ্য সূত্র

প্রধানত তিনটি উৎস থেকে নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ভোটার নিবন্ধীকরণ, ভোটারের সংখ্যা, সংসদীয় এলাকার আয়তন ও ভোটারসংখ্যা, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সংখ্যা, প্রার্থীর প্রতীক, ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা, রিটার্ণিং অফিসারদের নামের তালিকা, কোন ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে, আইন-কানুন সম্পর্কিত তথ্য, ভোটদান পদ্ধতি, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি সাধারণ তথ্যের জন্য প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়। মূল যোগাযোগের ব্যক্তি সেখানে জনসংযোগ কর্মকর্তা।

দ্বিতীয় প্রধান সংবাদ উৎস রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয়। নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ও আয়তন, পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট এলাকার মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা, বুথ, ভোট বাক্স ইত্যাদির সংখ্যা, সহকারী রিটার্ণিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অতিরিক্ত পোলিং অফিসার এদের নামের তালিকা, প্রার্থীর সংখ্যা, তাদের দলীয় পরিচিতি এবং প্রতীক, নির্বাচনী প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থা ইত্যাদি তথ্যের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস এটি। সাধারণত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এই অফিসের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং এসমস্ত তথ্য দেয়ার জন্য তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হচ্ছে ভোটকেন্দ্র (নির্বাচনের দিন)। ভোটকেন্দ্রে তথ্য উৎস হিসাবে কাজ করেন প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, অতিরিক্ত পোলিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট এবং ভোটাররা । একটি ভোটকেন্দ্রে কত ভোটার, কত ভোট দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে নারী ও পুরুষের ভোট কত, প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক, কারচুপি হয়েছে কিনা, ভোট বাক্স ছিনতাই হয়েছে

www.pathagar.com

কিনা, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা কর্মীদের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের আচরণ, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী আইন কানুন ও আচরণবিধি সঠিকভাবে মানা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের একমাত্র উৎস হচ্ছে ভোটকেন্দ্র।

যদি কেউ নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এবং সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সংগ্রহ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তথ্য সংগ্রহকারীকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে সমস্ত সাংবাদিক সম্মেলন করেন তাতে নিয়মিত যোগ দিতে হবে।

পদ্ধতিগত এবং নির্বাচনের দিনের অন্যান্য তথ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এবং রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় থেকে পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করে তারপর মাঠ পর্যায়ে যেতে হবে সাংবাদিককে। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁকে মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে। যিনি ভোটের দিনের তথ্য সংগ্রহ করবেন তাঁকে প্রথমেই কোনো-না-কোনো সংসদীয় এলাকা বাছাই করতে হবে, সেই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা, প্রশাসন এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। সাংবাদিককে জানতে হবে এলাকাটি কত দূরে, সেখানে যাতায়াতের উপায় কী ইত্যাদি। কোনো সংসদীয় এলাকায় ভোটের দিনের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সে এলাকায় দুই বা তিনদিন আগে পৌছানোই ভালো।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাক্ষাৎকার

যদি কোনো প্রতিবেদক একটু ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করতে চান তবে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে তা করতে পারেন, কারণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বোচ্চ ব্যক্তি। যেকোনো পর্যায়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। যদি নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরুর ঠিক আগেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া যায় তা হলে আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুভূতির ব্যাপারে পাঠকরা ধারণা পেতে পারেন। নির্বাচনের পরে যদি তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তা হলে পাঠকরা নির্বাচনের একটি মূল্যায়ন তার কাছ থেকে পেতে পারেন। অন্যান্য নানা বিষয়ে যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা থাকে (বা থাকতে পারে), তেমনি কোনো খারাপ নির্বাচন হলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

একজন প্রতিবেদক যিনি নির্বাচন নিয়ে লেখালেখি করতে চান তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে যে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কার কী দায়িত্ব। নির্বাচনী প্রচারকালে এবং ভোটের দিনে প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কার কী দায়িত্ব তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

রিটার্ণিং অফিসার

- মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং বাছাই।
- ভোটকেন্দ্র স্থাপন।
- প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও অতিরিক্ত পোলিং অফিসারদের নিয়োগ প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

www.pathagar.com

- ভোটকেন্দ্রে ভোটার তালিকা ও ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য নির্বাচন সামগ্রী প্রেরণ।
- প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এদের কেউ যদি দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় তবে তাঁদের প্রতিস্থাপন করা বা বদলি করা।
- নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণকে ভোটের সময় সম্পর্কে অবহিত করা।
- যদি কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোট স্থগিত হয়ে যায় তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জানানো।
- নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থগিত ভোটকেন্দ্রসমূহে পুনরায় ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা।
- নির্বাচনী ফলাফলের টেবুলেশন কোন তারিখে কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টকে জানানো। প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনাকৃত ফলাফলের টেবুলেশন করা হয় প্রার্থী বা এজেন্টের উপস্থিতিতে।
- বাতিলকৃত ব্যালট পেপারগুলো পরীক্ষা করা এবং যে সমস্ত ব্যালট পেপার বেআইনীভাবে বাতিল করা হয়েছে তা গণনার মধ্যে নেয়া।
- ডাক ভোট গণনা।
- কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে সন্তোষজনক আবেদনের ভিত্তিতে পুনরায় ব্যালট পেপার গণনা।
- যদি দুই জন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হয় তাহলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারণ করা।
- সমস্ত রকম ব্যবহৃত ব্যালট পেপার (এর মধ্যে টেন্ডার্ড ব্যালট, অভিযোগকৃত ব্যালটও অন্তর্ভুক্ত), মুড়ি বই ও তাদের হিসাব সংরক্ষণ করা এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সেগুলো সীল করে রাখা।
- সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে রিপোর্ট করার লিখিত অনুমতি প্রদান।
- বেসরকারি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা।
- একটি নির্দিষ্ট ফরমে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস রিটার্ণিং অফিসারকে জানাবেন। মানোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে তা জানতে হবে।
- নির্বাচিত ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রিটার্ণিং অফিসারের কাছে একটি নির্দিষ্ট ফরমে জানাবেন।
- সহকারী রিটার্ণিং অফিসার রিটার্ণিং অফিসারকে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।

প্রিসাইডিং অফিসার

- গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯(২) ধারা অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করেন। ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হবার সম্ভবনা থাকলে তিনি তা রিটার্ণিং অফিসারকে জানাবেন।
- যে সমস্ত ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে ফেলা হয়নি বা ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে পাওয়া গেছে সেগুলোকে তিনি বাতিল করবেন (ধারা ২১)।
- একটি নির্দিষ্ট ফরমে টেন্ডার্ড ব্যালটগুলো তালিকাভুক্ত করবেন।

www.pathagar.com

- যদি পরিস্থিতি খারাপ হয় বা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তবে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করবেন (ধারা ২৫.১)।
- ভোটকেন্দ্রে অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিবেন।
- ভোটারদেরকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করা এবং নির্বাচনের সময় শেষ হবার পূর্বেই যারা ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে পারবেন তাঁদের ভোট প্রদানের সুযোগ দেয়া (ধারা ৩৫)।
- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পালন শেষ হলে তা রিটার্ণিং অফিসারকে জানানো (ধারা ৩১-৩৬)।
- ভোটকেন্দ্রে কর্মরত পুলিশ, আনসার এবং সেচ্ছাসেবকদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা এবং তাঁদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
- ভোট গণনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কেন্দ্রের ফলাফল বিশেষ সংবাদ বাহকের মাধ্যমে বা টেলিফোনে বা ওয়ারলেসে রিটার্ণিং অফিসারকে জানানো।
- কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোনো এজেন্ট যদি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপারের হিসাবের একটি প্রত্যায়িত কপি চান তবে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন।

সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার

- প্রিসাইডিং অফিসারের অধীনে কাজ করবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারকে কাজে সহযোগিতা করবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

পোলিং অফিসার

- একজন ভোটারের পরিচিতি পরীক্ষা করবেন, তাঁর আঙুলে কালির চিহ্ন আছে কিনা দেখবেন, ভোটার তালিকা চিহ্নিত করবেন, ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাবেন এবং ভোটারকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করবেন।

নির্বাচন কমিশনের যোগাযোগের ঠিকানা ও কিছু প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

ঠিকানা	:	ব্লক-৫/৬ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা
পিএবিএক্স (ডিজিটাল)	:	৮১১৫২১২-৬, ৮১২৪২০-৭, ৮১১৫৫৫২, ৮১১৩৭২৬, ৮১১১০৩০, ৮১১৫১৭৬
ফ্যাক্স	:	৮১১৭৮৩৪, ৮১১৫১৭৬, ৮১১৯৮১৯
ই-মেইল	:	ecs@bol-online.com (সচিবালয়) bd-ec@bd-ec.org (তথ্য) pmo@bol-online.comওয়েবমাস্টার

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন		ফোন নম্বর (অফিস)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (মি: এম এ সাঈদ)	:	৮১১৫৩১৫
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব (শামস্ আল মুজাদ্দেদ)	:	৮১১৭১০৪
নির্বাচন কমিশনার (মি: আব্দুর রহমান)	:	৮১১৫৭৯৬
নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব (মি: নুরুল হুদা)	:	৮১২২৪৩০
নির্বাচন কমিশনার (মুশতাক আহমেদ চৌধুরী)	:	৮১২২৫৯৮
নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব (মো: আবুল কাশেম)	:	৮১২০৯৩৭
নির্বাচন কমিশনার (মি: সাইফুর রহমান)	:	৮১১৫১০৭

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়		
সচিব (মো: শফিউদ্দিন)	:	৮১১৫৬৩১
সচিবের একান্ত সচিব (মো: কামাল উদ্দীন)	:	৮১২২৬০০
অতিরিক্ত সচিব (মো: শফিউদ্দীন)	:	৮১১৫১০৭
যুগ্ম সচিব (অর্থ) (মি: সি এইচ সাহা)	:	৮১১২৮৫৩
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) (ড: ওমর ফারুক খান)	:	৮১১৬৭৬৮
উপ-সচিব (প্রশাসন) (সৈয়দ ইহ্তেশাম রসুল)	:	৮১১৫৪৮০
উপ-সচিব (সাধারণ) (মো: ইউসুফ মজুমদার)	:	৮১১৬০২৬
উপ-সচিব (স্থানীয় সরকার) (মোহাম্মদ জাকারিয়া)	:	৮১১৫৯০৫
উপ-সচিব (নির্বাচন) (মো: জাকারিয়া)	:	৮১১৫৯০৫
উপ-সচিব (আইন) (বেগম মুশিহা মাহ্ফুজা)	:	৮১২২০৩৪
জনসংযোগ কর্মকর্তা (মি: সনত কুমার বিশ্বাস)	:	৮১১৪১৭৬

উপ-নির্বাচন কমিশনারের অফিস		
উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা	:	৮৩২২২৮৯
সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা	:	৪০৮২৪২
উপ-নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম	:	০৩১-৬২০৮২১
সহকারী নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম	:	০৩১-৬১৪৬০৩
উপ-নির্বাচন কমিশনার, খুলনা	:	০৪১-৭২১১৬১
সহকারী নির্বাচন কমিশনার, খুলনা	:	০৪১-৭২১১৩৭
উপ নির্বাচন কমিশনার, রাজশাহী	:	০৭২১-৭৭৫৯০৩
সহকারী নির্বাচন কমিশনার, রাজশাহী	:	০৭২১-৭৭৫৬৯৩
উপ-নির্বাচন কমিশনার, বরিশাল	:	০৪৩১-৫৩০২১

নির্বাচনী গবেষণা ও উন্নয়ন সেল		
সিনিয়র প্রধান সহকারী সচিব (মো: মোখলেসুর রহমান)	:	৮১১৬৫৫০
গবেষণা কর্মকর্তা (মো: করিম ইকবাল)	:	পিএবিএক্সএক্স-৪৭

www.pathagar.com

ভোটার পরিচয়পত্র প্রকল্প

অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (মকবুল হোসেন)	:	৮১১৩৮৩০
যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক	:	৮১১৭৯১০
উপ-সচিব ও উপ প্রকল্প পরিচালক (মো: আব্দুল আলীম খান)	:	৮১২২০৬৫
সহকারী পরিচালক (মো: খলিলুর রহমান সিদ্দিকী)	:	৮১২২৪৯৮
সহকারী পরিচালক (মি: নিশিথ কুমার সরকার)	:	৮১১৫৭০৫
সহকারী পরিচালক (মি: নুর মোহাম্মাদ)	:	৮১২২৪৯৮
সহকারী পরিচালক (মি: আব্দুর রহমান)	:	৮১১৫৭০৫
সহকারী পরিচালক (মো: আব্দুল বাতেন মিয়াঁ)	:	৮১২২০৬৪
সহকারী পরিচালক (মি: আব্দুল মতিন শিকদার)	:	৩২৯৬৮৭

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা-১	:	৯১১২৫৭৯
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা-২	:	৯১১২৬৩২
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা-৩	:	৯১১২৬৪০
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা-১	:	৩২৫৪২২

থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগর

থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, লালবাগ	:	৯১১২৫৭৯
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, মতিঝিল	:	৮৩১৩০১০
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, সবুজবাগ	:	৮৩১৩০১০
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, কোতোয়ালী	:	৪০৮২৪২
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, সুত্রাপুর	:	৪০৮২৪২
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ডেমরা	:	
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, রমনা	:	৯১১৪২৭৯
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ধানমন্ডি	:	৯১১৫৬৪৯
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, মোহাম্মাদপুর	:	৯১১৭৯১৬
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, তেজগাঁও	:	৩২৫০৮৪
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ক্যান্টনমেন্ট	:	৮৮১১৫৬৩
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, গুলশান	:	৮১১২০৫৬
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, উত্তরা	:	৮৯১৫৯৮৮
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, মিরপুর	:	৯০০৩৪৮৮
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, পল্লবী	:	৯০০০৫৭৫

www.pathagar.com

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের
সাংগঠনিক কাঠামো

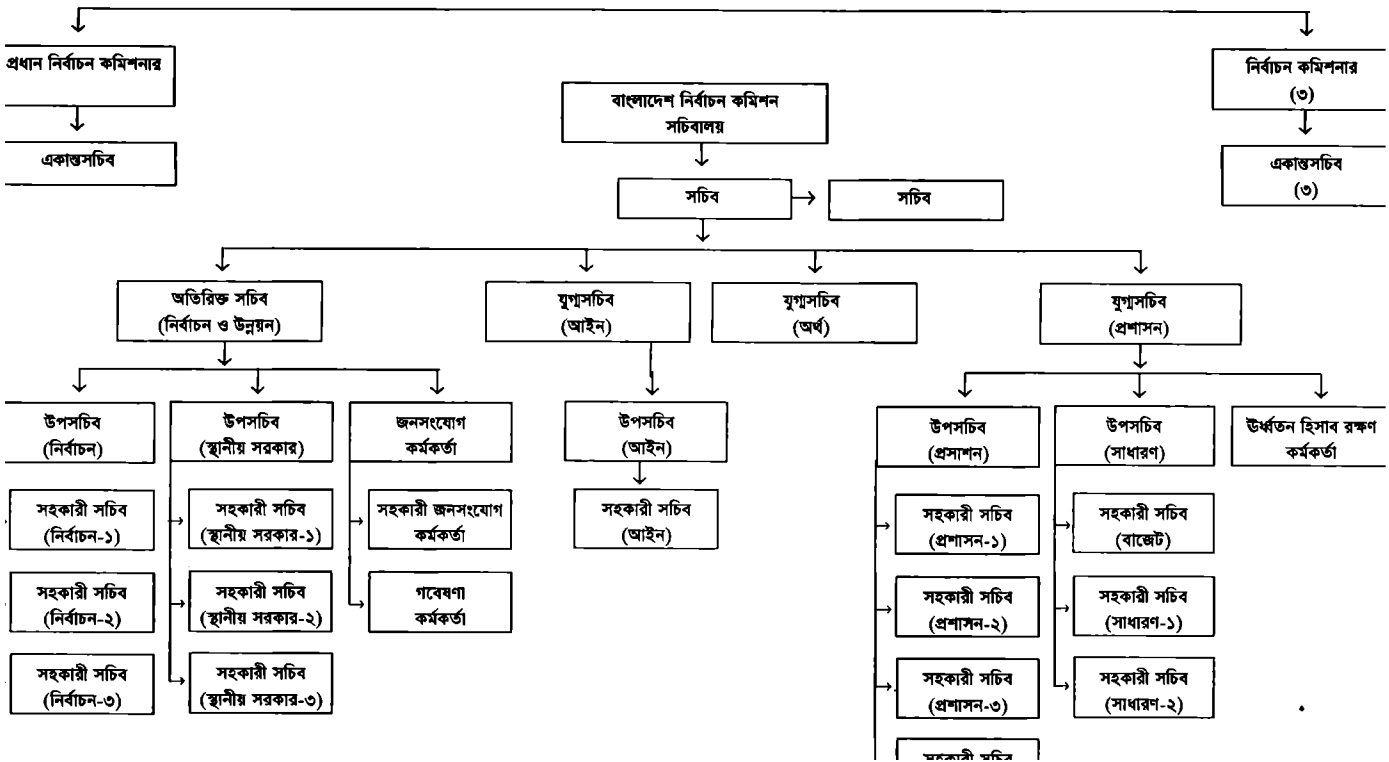

www.pathagar.com

দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নির্বাচনী রিপোর্টিং

মানিক সাহা এবং শিশির মোড়ল

জাতীয় দৈনিকগুলো কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্রিকাগুলো নির্বাচনের সময় ছোট ছোট শহরে বা গ্রামাঞ্চলে তাদের ঢাকাভিত্তিক প্রতিবেদকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাতে পারে না, বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারণার চূড়ান্ত সময়ে। দেখা যায় ঢাকা বা প্রধান শহরগুলোর আশপাশের কয়েকটি সংসদীয় এলাকা, প্রার্থীর কারণে বা অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো সংসদীয় এলাকা বাদ দিলে বিরাট সংখ্যক সংসদীয় এলাকা ভালভাবে রিপোর্ট করার বাইরে থেকে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে প্রতিটি সংসদীয় এলাকার গুরুত্ব সমান। প্রায়শই লক্ষ করা যায়, প্রত্যন্ত এলাকার ভোটাররা ভিন্ন কিছু বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। তাদেরকে প্রভাবিত করা হয় নানাভাবে। দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র এলাকা পরিণত হয় গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চে। দূরবর্তী এলাকায় এসকল ঘটনা যদি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা করা যায় তা হলে নির্বাচনী চালচিত্রের নতুন মাত্রা বা ধরন আমরা তা থেকে পেতে পারি। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অবহেলিত সংসদীয় এলাকাগুলো থেকে যে সমস্ত জেলা প্রতিনিধি বা মফস্বল সংবাদদাতা জাতীয় দৈনিক, সংবাদ সংস্থা, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত রেডিও বা টেলিভিশন এমনকি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন সেইসব সংবাদদাতাদের গুরুত্বের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

সার্বিক নির্বাচনী প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে তারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা অনেক মূল্যবান ঘটনা, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা প্রবণতার তথ্য সংগ্রহ করেন, জাতীয় পর্যায়ে সে সমস্ত ঘটনার বা প্রবণতার প্রভাব অনেক বেশি। সে জন্য জেলা বা থানা পর্যায়ের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে তারা বুঝতে পারেন কোন তথ্যটি মূল্যবান এবং কোথায় গেলে কীভাবে সে তথ্যটি পাওয়া যাবে। অবশ্য জেলা পর্যায়ের বা মফস্বল সংবাদদাতাদের স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদ সূত্রগুলোর সঙ্গে এমনিতেই একটা যোগাযোগ থাকে। সুতরাং ঢাকার কোনো সাংবাদিকের চেয়ে তার নিজের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকে নির্দিষ্ট সংসদীয় এলাকা সম্পর্কে। একজন জেলা বা মফস্বল সংবাদদাতার নির্বাচনী প্রতিবেদন তৈরির জন্য যে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

সংসদীয় এলাকা: মৌলিক বিষয়

এলাকা: একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় এলাকার অধীনে কতগুলো থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম, ওয়ার্ড বা মহল্লা রয়েছে তা একজন প্রতিবেদককে জানতে হবে। প্রচারণা বা ভোটের সময় কোথায় সংবাদযোগ্য ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে তার একটা ধারণা থাকা দরকার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তার যেমন সূত্র থাকবে অন্যান্য জায়গাতেও তার নির্ভরযোগ্য এবং নির্দলীয় উৎস তৈরি করে নিতে হবে।

ভোটার: এলাকার একটি ভোটার তালিকা সাংবাদিকের থাকতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে নারী পুরুষ ভোটারের সংখ্যা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা, বয়সভিত্তিক বিভাজন, নতুন কারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং তাদের কত অংশ সত্যিকার অর্থে ভোট দিতে পারবেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিকের পরিষ্কার ধারণা থাকবে। নির্বাচনে কারচুপি হবে কি না সে ধারণা রিপোর্টার এইসব তথ্য থেকেও পেয়ে যেতে পারেন। গত সাধারণ নির্বাচনে অনেক জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন নি। ভোটার তালিকায় ভূয়া বা ভৌতিক ভোটারের সংখ্যা কেমন তা খুঁজে দেখতে হবে এবং সারা দেশের ভোটার তালিকার সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা দেখতে হবে। ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কোনো কোনো সময় এক এলাকার ভোটারকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। নির্বাচনের ঠিক আগে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে কিনা তা সাংবাদিককে তলিয়ে দেখতে হবে।

সংসদীয় এলাকার ইতিহাস: ওই এলাকার পূর্বের নির্বাচনগুলোর ধরন, ফলাফল ইত্যাদি অতীতের তথ্যগুলো যদি সাংবাদিকের জানা থাকে তবে আগামী নির্বাচন কেমন হতে পারে সে বিষয়ে তিনি কিছুটা আগাম ধারণা পেতে পারেন। সুতরাং অতীতের নির্বাচনগুলোর জন সমর্থন কেমন ছিল, ফলাফল কী ছিল তা তাকে জানতে হবে। ধরনটা দীর্ঘদিন একইরকম ছিল কিনা বা কখনো ব্যাপক কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে কিনা তা জানতে হবে। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস থেকে তিনি পূর্বের সমস্ত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য পেতে পারেন।

প্রার্থী

সাংবাদিকের কর্ম এলাকার প্রার্থীদের সম্পর্কে জানাটা মৌলিক বিষয়। প্রার্থীদের রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত জানা থাকাটা খুবই দরকারি। একজন প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবনাচার, তার পেশা, সামাজিক অবস্থান এবং অন্য আরও কিছু বিষয় তার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলে থাকে। প্রার্থীর অর্থনৈতিক অবস্থা, তার প্রকাশ্য এবং গোপন আয়ের উৎস ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ব্যাংকের কোনো উৎস (যদি থাকে) থেকে একজন প্রার্থীর প্রচারণা ব্যয়ের একটা হিসাব পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় কোন গোষ্ঠী বা জনগণ একজন প্রার্থীকে কতটা সমর্থন দিচ্ছে তাও সাংবাদিককে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ভোটার নিবন্ধীকরণ

সর্বশেষ ভোটার নিবন্ধীকরণের সময় বিভিন্ন মহল নানারকম প্রশ্ন তুলেছিল। প্রতিবেদককে খুঁজে দেখতে হবে তার এলাকায় নিবন্ধীকরণের সময় কোনো অনিয়ম হয়েছিল কিনা বা কেউ কোনো

www.pathagar.com

অনিয়মের অভিযোগ করেছিল কিনা। এবার সারা দেশে ভোটার বেড়েছে। সাংবাদিককে খুঁজতে হবে ঐ নির্দিষ্ট এলাকার ভোটার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ খুঁজে বের করার দায়িত্বও সাংবাদিকের।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

যে সমস্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ আগে থেকে দুর্বল সেখানে নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এবং সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকায় সাংবাদিক আগে থেকেই যদি রিপোর্ট করতে থাকেন তবে নির্বাচনের সময় ভাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং পশ্চাদপদ এলাকার মানুষের মধ্যে ভোট দেয়ার ধরনে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক গবেষণায় দেখা যায় ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা সমৃদ্ধশালী এলাকা থেকে জয়ী হন এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়ী হন অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকা থেকে। তা ছাড়া একজন প্রার্থীর আর্থিক অবস্থাও নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে অর্থের একটি ব্যাপক প্রভাব রয়েছে নির্বাচনে। সরকারের ত্রাণ তৎপরতা বা উন্নয়ন কর্মসূচি যদি নির্বাচনের ঠিক আগে আগে শুরু করা হয় তাহলেও তা ভোটারদের প্রভাবিত করে।

স্থানীয় বিষয়

কোনো কোনো এলাকায় ভোটারদের পছন্দ নির্ধারিত হয় স্থানীয় ঘটনাবলী দ্বারা, জাতীয় রাজনৈতিক এজেন্ডা থেকে ভোটাররা বেশি গুরুত্ব দেন স্থানীয় বিষয়গুলোকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খুলনা এলাকায় চিংড়ি চাষ, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা, উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো স্থানে ফারাক্কার প্রভাব অথবা কোনো কোনো এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন এসব এলাকার ভোটারদের আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং কথিত কোনো আওয়ামী লীগের আসনে জয়লাভ করতে পারেন একজন জাতীয়বাদী দলের প্রার্থী যদি তিনি স্থানীয় কোনো বিষয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হন। প্রকৃত পক্ষে, অনুরূপ স্থানীয় বিষয়গুলো ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে কোনো কোনো আসন থেকে নতুন প্রার্থীকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল।

স্থানীয় প্রশাসন

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের এইসব কর্মকর্তাদের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। সংবাদ উৎস হিসেবে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে সাংবাদিককে তার নিরপক্ষেতার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিককে লক্ষ রাখতে হবে, এইসব স্থানীয় প্রশাসন কতটুকু প্রভাবমুক্ত অবস্থায় তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে।

www.pathagar.com

স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় এলাকার মানুষ কীভাবে সাড়া দেয়, স্থানীয়ভাবে কোনসব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক লক্ষ্য করা যায়, জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহনশীলতা কেমন এসব বিষয়গুলোই মূলত স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। দেশের সব জায়গায় হয়ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে, এর মাঝেও দেখা গেল কোনো এলাকায় নির্বাচনীয় ফলাফল নির্ধারণে ধর্ম বা সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায় একই ব্যক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছে বা জয় লাভ করছে। আবার কোনো এলাকায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রার্থী হয়ে অনেকে নির্বাচনে জয় লাভ করছে।

ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের কার্যালয়

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে থেকে এই অফিস জেলা পর্যায়ের নির্বাচন অফিসগুলোর কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে।

জেলা নির্বাচন কার্যালয়: জেলা পর্যায়ের মৌলিক তথ্যের জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সরকারি উৎস। একজন সাংবাদিক এখান থেকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে পারেন। এই অফিস থানা পর্যায়ের নির্বাচনী অফিসগুলোর কাজকর্ম তদারকী করে। নির্বাচনের সময় মূলত এই অফিসটাই রিটার্ণিং অফিসারের অফিসে পরিণত হয়। ভোটার নিবন্ধীকরণের প্রাথমিক দায়িত্বটি এই অফিস পালন করে। সাধারণত নির্বাচনের ঠিক আগে আগে ভোটকেন্দ্র কোথায় হবে তাও নির্ধারণ করে এই অফিস। জেলা নির্বাচন অফিসের ওপর দায়িত্ব পড়ে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন আসনের ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করার।

উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়: এই অফিস নির্বাচনী এলাকার সংগে সরাসরিভাবে জড়িত। তবে এই অফিসটি আমাদের দেশে নতুন। উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সংসদীয় এলাকা সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে সক্ষম। এই অফিস যারা পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে একজন সাংবাদিকের পরিচিত হওয়া দরকার। জানা দরকার অফিসে কে কোন্ দায়িত্ব পালন করেন।

একই সঙ্গে এই অফিসটা কেন তৈরি করা হলো, এর ভূমিকা কী তা জানা থাকা দরকার। এই অফিসের মূল কাজ, দায়িত্ব কী এবং এই অফিসের কর্মকর্তাদের কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাও সাংবাদিককে জানতে হবে।

রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয়

যেকোনো সাধারণ নির্বাচনের সময় রিটার্ণিং অফিসারের কার্যালয় তথ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নির্বাচন পরিচালনায় এই অফিস ব্যাপক প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চেয়েও রিটার্ণিং অফিসারের অফিস গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হয়ে দেখা দেয় নির্বাচনের সময়। সুতরাং সাংবাদিকের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা দরকার এই অফিসের সঙ্গে।

রিটার্ণিং অফিসারের পরিচয়, রিটার্ণিং অফিসারের যোগ্যতা, এর আগে যেখানে কর্মরত ছিলেন

www.pathagar.com

সেখানকার কাজের ইতিহাস, সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী তার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি রিপোর্টারের জানা থাকা দরকার। সাধারণত জেলা প্রশাসকরাই রিটার্ণিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে ব্যাপক সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনকে দলীয়করণ করার ফলে জেলা প্রশাসকদেরকে খুব সহজে কোনো দলের পক্ষে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। বিচার বিভাগের লোকদের দিয়ে রিটার্ণিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করানোর জন্য অনেকে সুপারিশ করেছিলেন।

রিটার্ণিং অফিসার কোনো প্রার্থীর প্রতি একটু বেশি সদয় কিনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী, কাদের সংগে তার ওঠাবসা, তার সুনাম, তার ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্টারের খোঁজখবর রাখতে হবে। তিনি ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার, জেলা নির্বাচন অফিসার, পুলিশ কমিশনার, এসপি, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এদের সংগে কীভাবে যোগাযোগ করছেন এবং কাজ করছেন তাও রিপোর্টারকে জানতে হবে।

রাজনৈতিক দলের অফিস

প্রচারণার সময় এবং নির্বাচনের দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর অফিস খুবই দরকারী তথ্য উৎস হিসাবে কাজ করে। যে ধরনের তথ্য রাজনৈতিক দলগুলোর অফিস থেকে পাওয়া যেতে পারে:

ক) প্রার্থীদের প্রস্তুতি।

খ) প্রচারণা কৌশল: অর্থসংগ্রহ, জনসংযোগ ইত্যাদি।

গ) বিজয় নিশ্চিত করার জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা যদি থাকে।

ঘ) স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়েছে কিনা।

ঙ) রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক।

চ) প্রশাসন বা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক।

ছ) কেন্দ্রীয় অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ।

অন্যান্য স্থানীয় বিষয়

ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। কোনো সময় হয়ত তারা কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দিতে পারে অথবা তারা প্রার্থীও দাঁড় করাতে পারে। যেহেতু এনজিওরা তাদের প্রকল্পাধীন দলের সদস্য/সদস্যাদের খুব সহজে একত্রিত করতে পারে সুতরাং কোনো কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিকদল এনজিওদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারে।

খ) ছাত্র রাজনীতি এদেশে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক সময় ফলাফল নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছাত্র সংগঠনগুলোর দিকে রিপোর্টারের দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ) সমস্যাগ্রস্ত কয়েকটি বিশেষ এলাকা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম; প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা; নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের তৎপরতা (যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় সর্বহারাদের

www.pathagar.com

কর্মকান্ড) ইত্যাদি ঘটনা জাতীয় নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে প্রভাব ফেলে।

ঘ) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সরাসরি নির্বাচন বা রাজনীতি না করলেও তারা সমর্থন দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত সেই প্রার্থীকেই সমর্থন করে যার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সর্বাধিক রক্ষিত হয়। আবার কোনো কোনো সময় হঠাৎ কোনো ঘটনা (দিনাজপুরে পুলিশকর্তৃক ইয়াসমিনকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ) এলাকার জনগণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

ঙ) কৃষি নির্ভর সমাজে বেশি জমির মালিক এবং ঋণ দাতা অনেকটা মত মোড়লের ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় তারা এলাকার ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবিত করে ভোটারদেরকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

চ) অনেক সময় ব্যবসায়িক বিষয় (যেমন: খুলনা এলাকায় চিংড়ি, চট্টগ্রামে বেসরকারি বন্দর) রাজনৈতিক এজেণ্ডার মধ্যে চলে আসে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো একজন জেলা প্রতিনিধি বা মফস্বল সংবাদদাতার জন্য মৌলিক কতকগুলো তথ্যসূত্র বা সংবাদ উৎস। সবচেয়ে বড়কথা সমগ্র পরিস্থিতি দেখা এবং বোঝার জন্য খোলা মন নিয়ে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। শুধু মাত্র নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার রিপোর্ট করাই রিপোর্টারের একমাত্র কাজ নয়। একজন সচেতন সাংবাদিক নির্বাচনের ধরনটা সঠিকভাবে তুলে ধরবেন এবং ঘটনার পটভূমিতে যেসব ঘটনা ঘটে যায় তাও পাঠককে জানাতে চেষ্টা করবেন।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নির্বাচনী প্রতিবেদন

ফরিদ হোসেন ও রিচার্ড গ্যালপিন

বহুবছর ধরে চলমান রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অবসানের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র একটু স্থিতি পেতে শুরু করায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের মতো একটি নবীন দেশে সাধারণ নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেখানে মানুষ প্রাণ দেয় – আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কাছে সেদেশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম ও ১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অবস্থার গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এরমধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলগুলোর প্রবল বিরোধীতার মুখে এবং ষষ্ঠ সংসদের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ১২ দিন।

বাংলাদেশ ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড বিদেশীরা খুব কাছ থেকে দেখবে। শিশু গণতন্ত্রকে সংহত করার জন্য এই নির্বাচন মাইল ফলক হয়ে থাকবে। জাতির গণতান্ত্রিক চেতনাকে তুলে ধরা এবং সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের গণতান্ত্রিক নীতিকে সংহত করার ক্ষেত্রে এই নির্বাচন জাতির জন্য একটি পরীক্ষাও বটে। বাংলাদেশ আবার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সংসদীয় নির্বাচন করতে পারে কিনা তা আজ দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

নতুন প্রতিষ্ঠা পাওয়া গণতন্ত্রের চর্চা বাংলাদেশে কেমন হয় তা দেখার আগ্রহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও তার পাঠকের রয়েছে। নয়মাসের একটি রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং সামরিক শাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের একটি খারাপ ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। রাজনৈতিক সংঘাতের অবসান হবে বলে মনে হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কারচুপির মাধ্যমে ফলাফল বদলে ফেলা হয়েছে। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করেছে। দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের সময় ক্ষমতায় থাকবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৩ জুলাই, ২০০১ তারিখে পাঁচ বছর মেয়াদকাল পূর্ণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

www.pathagar.com

৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানতম কাজ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই ব্যবস্থার প্রবর্তণ প্রশংসিত হয়েছে। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান স্থায়ী হওয়ার পর এটি হবে দ্বিতীয় নির্বাচন। কিন্তু এতকিছুর পরও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার বিরোধের মিমাংশা হয়নি ।

এদেশের ইতিহাসে যখনই কঠিন কোনো সময় এসেছে, জনগণ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত খবরের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করেছে। এবারেও মনে হয় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে দাঁড়াবে। অনেক মানুষ এখনো রেডিও শুনে খবর জানে। তা ছাড়া স্যাটেলাইট টেলিভিশনও এখন অনেকে ঘরেই পৌছে গিয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোনিক মাধ্যমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে দাড়িয়েছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার এখনো সরকারের হাতেই রয়েছে। দেশের লোকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পেশাগতভাবে উন্নত ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচনী সংবাদ পাওয়া যাবে কিনা।

সুতরাং সংসদ ভেঙে দেয়ার এবং নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মুহূর্ত থেকে ফলাফল ঘোষণা আর নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী সংবাদদাতাদের খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে।

নির্বাচনী রিপোর্টিংকে কয়েকটি পর্যায়ে ভেঙে দেখা যায়। প্রতি পর্যায়েই বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন গুরুত্ব পাবে।

প্রথম পর্যায়টি অবশ্য ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে ধারাবাহিকভাবে হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। সহিংসতা যেন বাংলাদেশের রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত অসহিষ্ণু অবস্থায় বাংলাদেশ কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করবে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নেবে তা গভীর আগ্রহ নিয়ে বিদেশীরা পর্যবেক্ষণ করছে।

একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর নতুন করে ঝালাই বাছাই হয়। কোন দল ক্ষমতায় থাকলো এটি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। বিগত নির্বাচনের পূর্বে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলোর কী অবস্থা? একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে কী করবে তা মানুষ ওই রাজনৈতিক দলের ইশ্তেহার থেকে বুঝতে পারে। অর্থনীতি এবং বিদেশনীতি সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় তাতে স্থান পায়।

গণতান্ত্রিক ঘটনা এবং সন্ত্রাস ছাড়াও এমন কিছু স্বতন্ত্র বিষয় থাকবে যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসবে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়টি তাদের আগ্রহের কারণ হবে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য চার দলীয় জোট গঠন করেছে যা আগ্রহ উদ্দীপক।

অতীতের মতো এই নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষকরা আসতে শুরু করবেন। এছাড়া বিপুল সংখ্যক স্থানীয় পর্যবেক্ষকও থাকবে। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনী প্রচারণা, ভোট দেওয়া এবং ভোট গণনা পর্যবেক্ষণ করবেন। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া কতজন পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন তার ওপর গ্রহণযোগ্যতা

www.pathagar.com

অনেকখানি নির্ভর করবে। যে নির্বাচন কমিশন একটি স্বতন্ত্র সাংবিধানিক সংস্থা তারাও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নজরে থাকবে। যে সমস্ত সাংবাদিক নির্বাচন কভার করবেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র এই নির্বাচন কমিশন। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে। বিদেশী পাঠকরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকদের ওপর বেশি আস্থা রাখেন।

নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের করণীয়গুলো আরো বিশদ বোঝা যাবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারাভিযানের সময় ইলেকট্রোনিক মাধ্যমের সাংবাদিকরা নেতা-নেত্রীদের সাথে দেশের সর্বত্র ঘুরতে পারবেন। এই সময় রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আওয়ামী লীগের নীতিগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করে একাধিক ফিচার করা যেতে পারে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে কতটুকু নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে সেদিকে অনেকেরই দৃষ্টি থাকবে। যিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান তাঁর এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকেই সকলের নজর থাকবে। আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে বাংলাদেশ যে সক্ষম এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণে রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সন্ত্রাসকে গুরুত্ব দেবে। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠছে তা টিকে থাকবে কিনা তা অনেকখানি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আচরণের ওপর নির্ভরশীল। যদি সহিংসতার কারণে নির্বাচন বিকৃত হয় তাহলে সন্ত্রাসকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কোনো উপায় থাকবে না। এইখানে অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বুঝতে ভুল করেন। তখন রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে তথাকথিত "নেতিবাচক খবর" পরিবেশন করা ছাড়া সাংবাদিকদের উপায় থাকে না। তারপরও অনেকে চায় ইতিবাচক খবরই যেন ছাপা হয় – কারণ তারা বুঝতে অক্ষম যে গণমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ। একটি রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবমূর্তি বিদেশীদের কাছে কেমনভাবে ফুটে উঠবে তা নেতাদের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করা এবং ১৯৯০ এর পর থেকে পরপর দুটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও রাজনৈতিক সহিংসতা এবং হরতাল কমেনি।

একটি দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা কী তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্মীদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। আওয়ামী লীগের শাসনামলের শেষ দিকে হরতাল, সংঘাত, হত্যা এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সে সময়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কে তারা কিছু লেখেনি। যখন তখন হরতাল বা রক্তাক্ত সংঘর্ষের খবর পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কে দোষারোপ করবে? বাংলাদেশকে একসময় রাজনৈতিক ক্যু এবং নেতাদের হত্যার দেশ হিসাবে দেখা গেছে। সেই ভাবমূর্তির পরিবর্তে বাংলাদেশ আজ হরতাল আর সংঘাতের দেশ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে সাংবাদিকরা দ্রুততার সাথে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে ব্যবহার করে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ গর্ব করার মতো নানা সফল দিক বাংলাদেশের রয়েছে। বিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতির কারণে হরতাল, সংঘাত আর হত্যার অন্ধকারে ওইসব সফলতা হারিয়ে গেছে বা ম্লান হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

জাতীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো জনমত জরিপের অভাবে সাংবাদিকদের পক্ষে জনগণের রাজনৈতিক সমর্থন জানার একটি ভালো উপায় হতে পারে রাজনীতিবিদদের সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করা। বর্তমানে বাংলাদেশে হাতে গোণা যে ক'টি জনমত জরিপ হচ্ছে সেগুলো ছোটখাটো এবং অনিয়মিত। ফলে সাংবাদিকদের পক্ষে ভোটারদের মনোভাব বোঝা বা নির্বাচনের ফলাফল অনুমান করা খুবই কঠিন। সুতরাং মানুষ কীভাবে ভোট দেবেন তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করা।

বাংলাদেশে জনমত জরিপের অভাব সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথে একটি অন্যতম বাধা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে যখন রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছিলো তখন সকল পক্ষের রাজনীতিবিদরাই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভোটারদের চাহিদা আর ইচ্ছার প্রতি সংবেদনশীল হতে বাধ্য হওয়ার বদলে রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রচারণাই বিশ্বাস করে চলেছেন। মাঝে মাঝে এরা দলের ভক্ত-বিশ্বস্তদের বড় বড় সমাবেশ আয়োজন করেন এবং এগুলোকে নিজেদের পক্ষে জন সমর্থনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে যেগুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো ফিচার বা সাক্ষাৎকার-প্রতিবেদন প্রচার করবে। অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে নির্বাচন কমিশন, আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ প্রশাসনে অনেক পরিবর্তন করেছে যেন তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে – বিষয়টি সাংবাদিকদের আগ্রহের দাবি রাখে। এই সমস্যা সমাধান করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সংসদের শেষ অধিবেশনে 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যদের নিরাপত্তা আইন, ২০০১' পাস করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় শেখ হাসিনা যে সরকারি বাসভবন ব্যবহার করতেন তা অব্যাহতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন – যা ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বিএনপি এবং এর সহযোগীরা বলছে আওয়ামী লীগের এই বাড়তি সুবিধা নিরপেক্ষ নির্বাচনের সহায়ক নয়। ভোটার তালিকায় যে ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা নিয়ে ভালো রিপোর্ট বা ফিচার তৈরি করবেন সাংবাদিকরা।

প্রচারণার দিনগুলোতে অন্য যে বিষয় দু'টো নিয়ে একাধিক ফিচার হতে পারবে সেগুলো হচ্ছে ভোটার তালিকার সাফল্য-ব্যর্থতা এবং নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি, বিশেষ করে, প্রচারণার কাজে কালো টাকার ব্যবহার কমাতে বা নির্বাচনী খরচার সীমা রক্ষা করতে কমিশন সক্ষম হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারটা।

বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের জন্য সবচেয়ে কঠিন সময় আসবে ভোটদানের দিনটিতে। সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়েও বাংলাদেশে সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি সহজ নয়। সরকার বা বিরোধী দল কেউই এখন পর্যন্ত চটজলদি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য, মন্তব্য বা উদ্ধৃতি যোগানোর মত জনসংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এবং আইন রক্ষাকারী সংস্থার লোকজনও সংবাদ মাধ্যমের কাছে সহজে মুখ খুলতে নারাজ। কষ্টসাধ্য এবং নড়বড়ে টেলিফোন ব্যবস্থা সমস্যাটা আরো জটিল করে তুলেছে।

এতসব সত্ত্বেও, আশা করা যায় যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে অনেকেই আমন্ত্রিত হবেন

www.pathagar.com

এবং তাঁরা তথ্য প্রবাহকে অনেকাংশে সচল রাখতে সাহায্য করবেন। বিশেষ করে ভোটদান প্রক্রিয়া অবাধে, কোনো হুমকি ছাড়া নিরপেক্ষভাবে এবং সহিংসতা মুক্তভাবে চলছে কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষকরা তথ্য যোগাতে পারবেন।

বিদেশী সাংবাদিকরা সাধারণভাবে অনেক সহজেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সাথে এবং ঢাকায় অবস্থানরত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহ যেমন জাতিসংঘ, দাতাসংস্থা, কূটনৈতিক মিশন ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এদের কাছ থেকে নির্বাচনের একটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যাবে যেটা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর রিপোর্টিং - এ নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

বিদেশী সাংবাদিকরা, বিশেষ করে বিদেশী রেডিও-টিভির জন্য যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা প্রচারণা কালে এবং ফলাফল ঘোষণার পরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের যেমন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য বের করে আনার চেষ্টা করা হবে। বাংলাদেশী প্রেসের জন্যও এ জাতীয় তথ্য প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ হবে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জাতীয় পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি খুঁটিয়ে দেখবে। এতে করে তারা নতুন নতুন ঘটনাবলী, ফিচারের বিষয়বস্তু এবং ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। বস্তুত যেসব বিদেশী সাংবাদিক শেষ মুহূর্তে নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য ঢাকায় আসবেন স্থানীয় পত্র-পত্রিকা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হবে। এসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, কলাম, অতিথি প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদিতে সংকলিত পটভূমি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবকিছুই আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের খুবই কাজে আসবে।

দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরশাসনের পর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়ায় যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা হতাশায় পরিণত হয় অন্তহীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যহত থাকেনি কারণ রাজনৈতিক উন্মাতাল অবস্থা দেশে এবং দেশের বাইরে হতাশার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের যে নষ্ট ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে – সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া – বিভিন্ন রিপোর্ট বা অন্যান্য লেখায় তা ফুটে উঠবে। যাহোক, বাংলাদেশের মানুষের মনের গভীরের জরুরি বিষয় এগুলো। তারপরও দৃষ্টি থাকবে বাংলাদেশের মানুষের মেধা ও মনোবলের ওপর যা বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে।

ঢাকায় অবস্থানরত প্রধান প্রধান বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত স্থানীয় প্রতিনিধিদের নাম ও টেলিফোন নম্বর:

BBC Radio	Kadir Kollol/Moazzem Hossain 35, Indira Road, Dhansiri Apartment D-602,Tejgaon, Dhaka. Tel: 9130996-7, 9130672 Fax: 9130879
VOICE OF AMERICA (VOA)	Motiur Rahman Chowdhury C/O Daily Manobjamin 21 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka Tel: 9669935 Fax: 8618130

www.pathagar.com

THE HINDU/ THE FRONTLINE (INDIA)	Haroon Habib H: 26 Rd: 1, Journalist Housing Kalshi, Mirpur-11, Dhaka-1216 Tel: 9555036-9 (0), 9008833(R)
ALL INDIA RADIO/ DUR DARSHAN	Akshay Raut House No: 3 Road No: 96 Apartment: 504 Gulshan-2, Dhaka Tel: 9884242 Mobile: 017535303 E-mail: raut@citechco.net
REUTERS	Anis Ahmed Bureau Chief Dhaka Sheraton Hotel (2nd floor) 1, Minto Road, Dhaka Tel: 8614088, 8613188 Fax: 8312976
JAPAN BROADCASTING CORPORATION (NHK)	Parvin Anwar House No:17b Road No: 126 Gulshan, Dhaka Tel: 8812815 Fax: 8826510 E-mail: arshee@.agni.com
ASSOCIATED PRESS (AP)	Farid Hossain Bureau Chief Cosmos Centre 69/1 New Circular Road Malibagh, Dhaka Tel: 8313717,9331411
AGENCE FRANCE PRESS (AFP)	Golam Tahaboor Bureau Chief 8 Rajuk Avenue Bangladesh Shilpa Bank Bhavan (6th floor) Dhaka Tel: 9563897, 9562234 Fax: 9562007
THE PRESS TRUST OF INDIA (PTI)	Pradip K. Chakroborty C/O Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) 68/2 Purna Paltan, Dhaka Tel: 9555036-9, 9555030 (O) 9112931 (R)

www.pathagar.com

XINHUA NEWS AGENCY	Van Xiao Zsu and Chen Jian C/O Shuva News Agency House No: 4 Road: 18 Block-A, Banani, Dhaka Tel: 8829917, Fax: 8826089
THE LONDON GUARDIAN AND NEW YORK TIMES	Arshad Mahmud 4/20 Humayun Road Mohammadpur, Dhaka Tel: 8117154
THE FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW	Sayed Kamaluddin House No: 43A Road No: 6A Dhanmondi, Dhaka Tel: 8116852, Fax: 8116854 E-mail: sayed@bangla.net
NEWSWEEK, USA/ DECCAN HERALD, INDIA	Hassan Shahriar 222/4, Malibagh Pabna Colony (1st floor), Dhaka-1217 Tel: 7122660(O), 8315617(H) Fax: 8315617 E-mail: shahriar@bangla.net
ANTARA NEWS AGENCY INDONESIA	Enamul Haque Chowdhury C/O Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) 68/2 Purna Paltan, Dhaka Tel: 9555036-9, 9555030 (O)
TIME MAGAZINE (N.Y.)	Farid Hossain C/O AP Cosmos Centre 69/1 New Circular Road Malibagh, Dhaka Tel: 8313717,9331411(O) Tel: 9332542(H)
ASSOCIATED PRESS OF PAKISTAN (APP), PAKISTAN	Zainal Abedin 430/1 Senpara Parbata Mirpur, Dhaka Tel: 9555036-9 (0), 8018953 (H) E-mail: noa@agni.com
FINANCIAL TIMES	Reazuddin Ahmed C/O The Fiancial Express 28/1 Toyenbee Circular Road Tel: 9553550-4 (0), 8827800 (H)

www.pathagar.com

INTER PRESS SERVICE MANILA, PHILLIPPINES	A.K.M. Tabibul Islam C/O Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) 68/2 Purna Paltan, Dhaka Tel: 9555036-9, 9555030 (0), 8612911 (H) E-mail: tabibul@bangla.net
GULF NEWS, DUBAI, UAE	Rashed Chowdhury C/O United News of Bangladesh (UNB) Cosmos Centre 69/1 New Circular Road, Malibagh Dhaka-1217 Tel: 9345543 Fax: 9344554
THE TELEGRAPH/GEMINI NEWS SERVICE, LONDON	Md. Roushonuzzaman C/O Holiday 30,Tejgaon I/A, Dhaka Tel: 9122950 (O) 8912058 (R) Fax: 8313520 E-mail: holiday@bangla.net
DUTCHE PREESSE AGENTUR (DPA), HUMBURG, GERMANY	Ahmed Fazl B4 Segun Bagicha Apartment 118, Segun Bagicha, Dhaka-1000 Tel: 8311513 Fax: 8311997 E-mail: afdhaka@bol-online.com
KYODO NEWS SERVICE JAPAN	Zahiduzzaman Faruque C/O Dainik Arthanity Biman Bhavan (5th floor) 100 Motijheel C/A, ,Dhaka Tel:9667789,9559959 Fax: 9555707 E-mail: dartho@citechco.net
QATAR NEWS AGENCY (QNA) DOHA, QATAR	Zaglul A Chowdhury 5B Monoroma Apartment 4 Now Ratan Colony Baily Road, Dhaka Tel: 9555036-9 (O) 9332578, 9339511(H) E-mail: zaglul@vasdigital.com
THE ISLAND/ UPALI NEWSPAPERS SRILANKA	Mukhlesur Rahman Chowdhury C/O Dainik Dinkal 441/1 Tejgaon I/A, Dhaka Tel: 9565083, 9558234 Fax: 9565084

www.pathagar.com

জরুরি কিছু বিষয়

সুব্রত শংকর ধর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে যে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে তার প্রতিটি পর্যায়ে ছিল জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ। কিন্তু স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র শৈশবেই রয়ে গেছে। এই কঠিন বাস্তবতার পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান কারণগুলো হচ্ছে: পাকিস্তান আমল থেকেই রাজনীতিতে একাধিকবার সামরিক হস্তক্ষেপ, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহনকারী একটি সুবিশাল আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি আমলাতন্ত্রের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব, পাকিস্তান আমলে আঞ্চলিক রাজনীতিকে খাটো করে দেখার কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রমূলক নীতি, নিজেদের আচার আচরণে গণতন্ত্র চর্চার ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলার জন্য সুবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ প্রক্রিয়ার অভাব এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ববোধের অভাব। সামগ্রিকভাবে এই কারণগুলো ধীরে ধীরে একটি অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সুযোগ ঘটেছিল। এবং একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য নাগরিকবৃন্দের আকুতির মধ্য দিয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তবে এখানে বলে নেয়া ভালো যে চেতনার এ উত্তরণের সাথে তাল দেয়ার মত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রস্তুতি তেমন ছিল না বললেই চলে। আশা এবং উৎসাহ চরমে উঠলেও ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এ পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব ছিল। বস্তুত, এরশাদ সরকারের পতনের পরপরই নাগরিক গোষ্ঠীর অনেকেই এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চরণ করেছিলেন যে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নীতিমালাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া না হলে অচিরেই গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসতে পারে। সেই সময়টাতে বেশ কিছু নতুন সংবাদপত্র জন্ম নিয়েছিল যাদের পাতায় গণতান্ত্রিক শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। দুটো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আশাব্যাঞ্জক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। বস্তুত রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে উপযুক্ত ভিত্তিও তখন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাব,

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদদের সুবিবেচনার অভাব এবং গণতন্ত্র বিরোধী সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের কারণে সে সুযোগ ভেস্তে গেলো।

এত কিছু সত্ত্বেও, আমরা যদি একটি যুক্তিবাদী সমাজের অনুগত থাকি তবে একটি সৎ ও ভালো শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এখনো সম্ভব। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত, সুশাসন ও গণমাধ্যমের সম্পর্কটি পরস্পর নির্ভরশীলতার। সৎ ও সুষ্ঠু শাসনকাজের জন্য গণমাধ্যমের নজরদারি অত্যাবশ্যক এবং অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ছাড়া গণমাধ্যমও সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। নিঃসন্দেহে সংসদই হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। গণমাধ্যমকে তাই সংসদীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার কাজটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

সংসদীয় নির্বাচন নিয়ে সামগ্রিকভাবে রিপোর্ট করার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও, কিছু কিছু বিষয় তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাতে সাংবাদিকরা জনগণকে এগুলো সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ভোটার তালিকা

নির্বাচনের সময়, বিশেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর ভোটার তালিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সবসময়ই আলোচনা হয়ে থাকে। সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি তখনই আসে যখন শত শত মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় না।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের দিনটিতে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা অনুসরণের অসুবিধা বা সমস্যাগুলো স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল। বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা দেখেছিলেন, ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রায় সবকটি ভোটকেন্দ্রে অতীতে ভোট দিয়েছেন এমন অনেক নাগরিক তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় খুঁজে পাননি। এই পর্যবেক্ষকদের কাছে অভিযোগ এসেছিল যে অনেক এলাকাতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। ঢাকা শহরের ঝিগাতলার একটি ভোটকেন্দ্রে হিন্দু তফশিল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ভোটার সমন্বয় পরিষদের একটি ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দলের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে এরশাদ আমলে ঋষিপাড়ার প্রায় চারশ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। জানা যায়, তাঁরা আবার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলেও জনা বিশেক বাদে বাকি সকলের আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছিল (টিম এবং গাইন, ১৯৯১)। ভোটার তালিকার এসব সমস্যা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও ছিল। এবরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এরকম কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত বেখেয়ালের ফল কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে ইচ্ছাকৃত

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কার্যকারণ পরিলক্ষিত হয়। যে কারণেই হোক না কেন, বিষয়টি অবহেলা করা সংবাদ মাধ্যমের উচিত নয়। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব হচ্ছে আগেই পদক্ষেপ নেয়া অর্থাৎ সম্ভাব্য বিচ্যুতিগুলো আগে থেকে চিহ্নিত করে মানুষকে জানানো যাতে করে সকলেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। অবশ্য সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে পুরো দেশের ভোটার তালিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করা সঙ্গত কারণেই সম্ভবপর নাও হতে পারে। তবে র‍্যানডম নমুনা জরিপের ভিত্তিতে বা ইতিমধ্যেই অভিযোগ এসেছে এমন এলাকা নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা সম্ভব।

এ ছাড়া অতীতের ভোটার তালিকাগুলোতে সবসময়ই কিছু সাধারণ ভুলত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: এলাকাবাসী নয় এমন লোকের নাম ভোটার তালিকায় ওঠা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটার, 'মৃত' ব্যক্তির নাম তালিকায় ওঠা, ভোটার যোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ পড়া, একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার ওঠা, পুরুষ ভোটার তালিকায় মহিলার নাম ওঠা বা তার উল্টোটা, এবং ভোটারের নাম-ঠিকানা ভুল ছাপা হওয়া। কিছু এলাকা বেছে নিয়ে রিপোর্টার সেখানকার ভোটার তালিকায় এসব সাধারণ ভুল, ভুলের কারণ, তালিকা প্রস্তুতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে পারেন এবং সমস্যাগুলো দূর করার ব্যাপারে উপায় নির্দেশ করতে পারেন। যখন ভোটার তালিকা তৈরি হয় তখনই এই কাজটা করার সবচেয়ে ভালো সময়। দেরিতে হলেও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা দরকার, তবে লক্ষ রাখতে হবে তা যেন নির্বাচনের যতদিন আগে সম্ভব করা হয়, নচেৎ প্রতিকারের সুযোগ থাকবে না। বস্তুত, বর্তমান ভোটার তালিকা নিয়ে যথেষ্ট রিপোর্ট হয়েছে এবং বেশ কিছু পত্রিকা ভোটার তালিকা তৈরির পদ্ধতি খুঁটিয়ে পর্যালোচনাও করেছে।

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশনের কর্মপদ্ধতি, স্বাধীনতা এবং সরকারের অন্যান্য অংশের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের যথেষ্ট কৌতূহল থাকতে পারে। অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই এদেশের নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্টিং হলে মানুষ যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে তা পড়বে। যে সব ঘটনার কারণে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না সে বিষয়গুলো নিয়েও রিপোর্ট হওয়া দরকার।

নির্বাচনী ইশ্‌তেহার

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে প্রধান দলগুলো নির্বাচনের আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে। এসব প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই জনগণ আংশিকভাবে তাঁদের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা হয়। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে এসব ইশ্‌তেহার নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে কোনো আলোচনা হয় না বললেই চলে। ফলে খুব কম লোকই রাজনৈতিক দলগুলোর কর্ম পরিকল্পনা

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানতে পারেন। অথচ ইশ্‌তেহারগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলে দুটো লাভ হতে পারে। প্রথমত মানুষ ওয়াকিফহাল হয়ে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত এরকম আলোচনার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্যবাধকতা অনুভব করবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট সময় ও স্থান বরাদ্দ করে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন করা দরকার। যে বিষয়গুলো লক্ষ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে: কর্মসূচিগুলো কতটা সুচিন্তিত; এক নির্বাচন থেকে পরের নির্বাচনের সময়সীমায় প্রাপ্য সম্পদের ভিত্তিতে সেগুলো থেকে ফল পাওয়া সম্ভব কিনা অর্থাৎ কর্মসূচি কতখানি বাস্তব; দলীয় মতাদর্শ এবং সংবিধানের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, না হলে অসঙ্গতিটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন দিকের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি ইত্যাদি। এ ছাড়া নিকট অতীতে রাজনৈতিক দলটির কার্যকলাপ বিচার করেও তার নির্বাচনী ঘোষণার আন্তরিকতা ও সঙ্গতি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির তুলনামূলক আলোচনা করে সেগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য, মূল পার্থক্য, দ্বন্দ্বের কারণ, বিশেষ করে বিতর্কিত ইস্যুগুলোতে প্রত্যেকের অবস্থান ইত্যাদি তুলে ধরা যায়। এতে করে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পরের কর্মসূচি সম্পর্কে পত্রিকার পাতায় বা রেডিও টিভিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করতে আহবান করা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দলগুলোকে গোল টেবিল বা প্যানেল আলোচনায় বসানো গেলে তারা বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ অবস্থান এবং পারস্পরিক পার্থক্যগুলো স্পষ্ট করে জানানোর সুযোগ পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে খোলামেলা বিতর্কে আহবান করা যায়। এবং অবশ্যই নির্বাচনী ইশ্‌তেহার সম্পর্কে একাধিক জনমত জরিপ হতে পারে।

মনোনয়ন

প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কিছু ভালো ও বিশদ রিপোর্ট হতে পারে। বিশ/পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন দলের প্রার্থী মনোনয়নের প্রবণতা ও ধারা বিশ্লেষণ করে ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। সময়ের ব্যবধানে রাজনীতির ধারা এবং নির্বাচনী আচরণ অনেক পাল্টেছে। আজকাল দলীয় মনোনয়ন লাভের জন্য রাজনৈতিক কমিটমেন্ট, দলীয় মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য বা রাজনীতির জন্য আত্মত্যাগ ইত্যাদি প্রাথমিক বিবেচনার বিষয় নয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ধারায় মনোনয়ন লাভের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা সম্ভবত প্রচুর টাকা থাকা, গায়ের জোর ও মাস্তানী। কে মনোনয়ন পাবেন আর কে বঞ্চিত হবেন সেটা অনেক সময় এই বিবেচনাগুলোর ওপরেও নির্ভর করে।

মনোনয়নের এসব প্রবণতা বিশ্লেষণ করার সময় আলাদা মনোযোগ দাবি করবেন সেসব প্রার্থীরা যাঁরা ঘুরেফিরে বারবারই মনোনীত হন। মানুষ স্বভাবতই তাঁদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন, কেননা এসব প্রার্থী বা ব্যক্তিরা সমাজের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অবশ্যই জানতে চাইবেন, রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কোন প্রার্থীর আর্থিক অবস্থা

www.pathagar.com

কেমন ছিল, এখন তাঁর আর্থিক সঙ্গতি কী রকম, মতাদর্শ বা আনুগত্যে কী এবং কতখানি পরিবর্তন এসেছে, গোড়াতে মানুষ তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি কতটা আস্থাবান ছিল, বর্তমানে তার অবস্থান কোথায় ইত্যাদি। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বহুরূপীদের অবাধ গতি রয়েছে তাই নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, খুঁটিনাটি জানতে মানুষ আগ্রহী হবে। পরবর্তী কালে রিপোর্টার ব্যাপক আঙ্গিকে বিভিন্ন দলের সব মনোনীত প্রার্থীদের পর্যালোচনা করতে পারেন; দেখতে পারেন মনোনয়নের পেছনে কোনো সাধারণ মাপকাঠি রয়েছে কিনা। এর পাশাপাশি নির্বাচনে ঠিক কারা বা কোন ধরনের মানুষ তাঁদের দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাও দেখতে পারেন।

আচরণবিধি

রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচন কমিশন যে আচরণবিধি তৈরি করে দেন সাধারণ মানুষ সে সম্বন্ধে সামান্যই জানেন। এই আচরণবিধির বিভিন্ন দিক নিয়ে অজস্র রিপোর্ট হতে পারে। যেমন: আচরণবিধির প্রতিটি অংশ, সেগুলোর প্রায়োগিক তাৎপর্য, নির্দেশের স্পষ্টতা- অস্পষ্টতা, বাস্তবতা, অপব্যবহারের সুযোগ, আচরণবিধিটি ঠিকমত অনুসৃত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজর রাখার বন্দোবস্ত আছে কি নেই, সেই লক্ষ্যে আরো কী পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং সর্বোপরি আচরণবিধি অনুসরণ বা অবহেলার বাস্তব কিছু নজির ইত্যাদি।

তা ছাড়া ভোটাররা আচরণবিধি সম্পর্কে কী মনে করেন, কী পদ্ধতিতে আচরণবিধি রচিত হলো, আচরণবিধির কোনো আইনি তাৎপর্য আছে কিনা ইত্যাদি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে রিপোর্ট হতে পারে। প্রার্থীদের কাছ থেকে কী ধরণের আচরণ আশা করা হয় আর তাঁরা বাস্তবে কী আচরণ করেন এটা জানা থাকলে ভোটাররা তাঁদের সম্বন্ধে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যয়বহুল খিলান নির্মাণ, বহুরঙা পোষ্টার ছাপানো, ভোটের দিনে ভোটারদেরকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেয়া, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারদেরকে খাওয়ানো বা আপ্যায়ন করা ইত্যাদি কাজ সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া, নির্বাচনী প্রচারণায় একজন প্রার্থী তিন লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারবেন না। কিন্তু, কেউ বেশি ব্যয় করলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে তা যথাযথভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এসব বিষয় নিয়ে বিশদ রিপোর্টিং হলে এ জাতীয় অন্যায় আচরণ কিছুটা হলেও ঠেকানো সম্ভব হতে পারে।

নিরাপত্তা

আজকাল ভোটকেন্দ্রে ভোটের পাশাপাশি সহিংসতা যেন অবিচ্ছেদ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। অধিকাংশ ভোটারই এখন ভাবতে বসেন ভোট দিতে যাওয়াটা আদৌ নিরাপদ হবে কিনা এবং কেন্দ্রে যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা। মহিলা ভোটারদের দুশ্চিন্তা আরো বেশি, যেহেতু নানা কারণে তাঁদেরকে প্রায় ক্ষেত্রেই ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় শিশুসন্তানদের সাথে নিয়ে যেতে হয়। সুতরাং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষকে সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত করতে না পারলে ভোটের দিন ভোটারদের সংখ্যা কম হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। এমন কি ১৯৯১ সালেও কিছু কিছু এলাকায় এমনটা

www.pathagar.com

হয়েছিলো (টিম এবং গাইন, ১৯৯১)। এ রকম হলে নির্বাচনের পুরো উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করে সাংবাদিক জনগণকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে পারেন। একই সাথে, কোথায় কী বাড়তি ব্যবস্থা লাগবে সে সম্পর্কে প্রশাসনকেও সজাগ করতে পারেন। বিশেষত সহিংসতাপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য এরকম রিপোর্টিং খুব জরুরি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। সহিংসতার আশঙ্কা পরিমাপ করার জন্য নির্বাচনী এলাকাগুলোর অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়। তা ছাড়া, নির্বাচনের ঠিক আগে আগে প্রচারণার ধরন দেখেও সহিংসতার বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। সাংবাদিকরা এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করে প্রশাসনকেও সতর্ক থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

জনমত জরিপ

নির্বাচনের সময় বিভিন্ন সংস্থা যে সব জনমত জরিপ পরিচালনা করে সেগুলোর সংবাদমূল্য উপেক্ষণীয় নয়। এক দিকে এই জরিপগুলো রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সম্পর্কে মানুষের মতামত তুলে ধরে। কিন্তু অন্যদিকে, নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজেতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে এই জরিপগুলো জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। সাংবাদিককে তাই আগে জরিপকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে। দেখতে হবে জরিপটি রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে কিনা। এ ছাড়া, নিরপেক্ষতা ও পেশাগত দক্ষতা সাপেক্ষে পত্রিকা নিজেই জনমত জরিপ পরিচালনা করতে পারে। বস্তুত, জনমত জরিপের নানান দিক থাকতে পারে যেমন: রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন, নেতা-নেত্রী সম্পর্কে মতামত অথবা বিতর্কিত ইস্যুগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা।

ফলাফল

পত্রিকায় সবসময়ই নির্বাচনী ফলাফলের গতানুগতিক রিপোর্ট থাকে। মাঝে মাঝে কিছু বিশ্লেষণও থাকে কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। আর প্রতিটি বিশ্লেষণেই এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। যেমন, নারী-পুরুষ বা নির্বাচনী এলাকা ভেদে ভোট কীরকম পড়লো; বিজেতা প্রার্থীদের ব্যক্তিত্বে কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা; বিশেষ কী কারণে কোনো প্রার্থী জিতেছেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকেই ফলাফল বিশ্লেষণ করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ব গণমাধ্যমের ভূমিকা

রাষ্ট্রায়ত্ব গণমাধ্যম সবসময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কথা বলে এ সমালোচনা আছেই এবং তা যথার্থও। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের মত দেশে যেখানে নিরক্ষরতার হার বেশি সেখানে সংবাদপত্রের চেয়ে রেডিও-টিভি অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গঠনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং

www.pathagar.com

আমাদের উচিত রেডিও-টিভিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। সে কারণেই নির্বাচনের সময় রেডিও-টিভির ভূমিকার ওপর কড়া নজর রাখা উচিত। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রচারণা কতখানি গুরুত্ব সহকারে, কতখানি সময় ধরে রেডিও-টিভিতে জায়গা পাচ্ছে এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় রিপোর্ট করাটা জরুরি। এধরণের রিপোর্ট বেশি করা হলে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করার আশা নিতান্ত দূরাশা নাও হতে পারে।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিক

অন্যান্য ইস্যুর তুলনায় এ বিষয়টি হয়ত কিছুটা ফিকে মনে হতে পারে। কিন্তু বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকার সুফল-কুফল, কীভাবে তাঁরা ভোট দেবেন, কীভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই সংবাদ মাধ্যমে আসার যোগ্য। বাংলাদেশী নাগরিকরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন অবশ্যই ভোটাধিকারের দাবিদার। সংখ্যার দিক দিয়েও বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকরা বিশেষ মনোযোগ দাবি করেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মতামত নেয়া যেতে পারে।

সংবাদ মাধ্যমে অধিকতর গুরুত্ব দাবি করে এখানে এমন কয়েকটি বিষয় আলোচিত হল। সামগ্রিকভাবে সংবাদ মাধ্যমের মূল দায়িত্ব হচ্ছে গণতান্ত্রিক চর্চা বা নীতিমালা থেকে যে কোনো রকম বিচ্যুতির ওপর কড়া নজর রাখা কেননা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা আর তা বাঁচিয়ে রাখা। বিদ্যমান অবস্থায় এটি আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

References

1. Timm, R.W. and Gain, Philip. 1991. Election Observation Report, Election to 5th Parliament 1991.
2. Hakim, Muhammad A. 1993. Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum. the University Press Limited, Dhaka.
3. Election Commission (published in itteafq, October 26, 1995). Code of Conduct for the Sixth Parliamentary Elections

www.pathagar.com

নির্বাচনী ফিচার

কিউ এ তাহ্‌মিনা

অনেক পাঠকই পত্রিকার প্রথম ও শেষ পাতায় আলগা নজর বুলিয়েই উল্টে রাখেন। তবে তাঁরাই আবার চিত্তাকর্ষক হলে ফিচার বা বিশেষ আয়োজনের পাতাগুলো খুঁটিয়ে পড়েন। নির্বাচন সংক্রান্ত সাদামাটা প্রতিবেদন অনেক সময় খুব একঘেঁয়ে ঠেকতে পারে। অধিকাংশ পাঠকের চোখ হয়ত দ্রুতই এমন খবর ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে ছুটবে। তার মানে কি আমরা ধরে নেবো যে অধিকাংশ পাঠক বা পাঠিকাই নির্বাচন সংক্রান্ত খবরাখবরে আগ্রহী নন? তা তো নয়। বরঞ্চ, সংবাদপত্রগুলো যদি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাঠকের সত্যিকার আগ্রহের ও মাথা ব্যাথার বিষয়গুলো নিয়ে লেখালেখি করতে সচেষ্ট হয় তবে পাঠকের অভাব হবে না।

পাঠক টানার সহজতম উপায় অবশ্য রসাল গুজব আর কেলেঙ্কারির কেচ্ছাকাহিনী ফেঁদে বসা। ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো তো কেচ্ছাকাহিনী বিক্রি করেই বেঁচে আছে। কিন্তু ঐ পথ না নিয়েও পাঠক বাড়ানো যায়, ধরে রাখা যায়, একই সাথে পত্রিকার বা সাময়িকপত্রের মানও উন্নত করা যায়। তা করতে হলে পত্রিকাকে সে সব বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে যে বিষয়গুলো পাঠকের রোজকার জীবনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলে।

ফিচারের প্রাণ, আমরা বলে থাকি, মানবিক আবেদন। অন্য আর দশটা ঘটনার প্রতিবেদনের মতোই ফিচারও মানুষকে নানা ঘটনার গল্প বলে, তথ্য জানায়। কিন্তু ফিচারের গল্প বলার কায়দাটাই এমন যে পাঠক সাথে সাথে ফিচারের ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেন। মানুষ সেই গল্পে জীবন্ত ও মুখ্য, তথ্য সেখানে উপস্থাপিত হয় মানুষের জমিনে, মানুষের সুখ-দুঃখ- আশা-নিরাশাকে কেন্দ্র করে। ফিচার মানুষের গল্প বলে, চেষ্টা করে মানুষের গল্প হয়ে উঠতে। আর সে জন্যই অদেখা ঘটনার নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ না হয়ে সেটা হয়ে দাঁড়ায় এমন বর্ণনা যা পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতাও হতে পারত। নির্বাচনের গল্পও যদি পাঠককে এই কেতায় শোনানো যায় তবে নির্বাচন বিষয়টাই তার কাছে আরও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। পাঠকের কাছে নির্বাচন যদি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, উঁচু তলার বিশাল দক্ষযজ্ঞের মতোই হয়ে রয়, যদি নির্বাচনের গল্প শুধু ভোট গোনা আর দুর্নীতির বিচ্ছিন্ন ঘটনাতেই আটকে থাকে, তবে আর পত্রিকা পড়ে পাঠকের লাভ কী? পত্রিকার লক্ষ্য বরং হওয়া উচিত পাঠককেদেখানো যে নির্বাচন এবং সেটার সাথে জড়িত ঘটনাগুলোর ভূমিকা বা প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক।

নির্বাচন মানুষকে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে, এমনটাই আশা করা হয়। নির্বাক, নিশ্চুপ জনগণের জন্য ভোট দেয়াটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতার চরম প্রকাশ। তাদেরকে কে বা কারা

www.pathagar.com

শাসন করবে সেটা ঠিক করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করে জনগণ নিজেদের সেই অধিকার চর্চা করছে। এই নির্বাচন যেন কাঙ্খিত শুভ ফল এনে দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হলে তাদের জানতে হবে তাদের সামনে কী কী বিকল্প আছে। তাদের এও জানতে হবে যে জনগণকে রোজ দিনকার রুটি-রুজির ধান্দা, জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিকল্পগুলো কী কী ধরণের সুযোগ সুবিধা দেবে। নির্বাচন তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই। মানুষ যাতে ভালো-মন্দ জেনে বুঝে, ওয়াকিবহাল হয়ে, চোখ-কান খোলা রেখে এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যপারে পত্রিকার করণীয় অনেক। আর সেসব কাজ করতে ভালো ফিচার বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

পাঁচ বছরে (ইনশাল্লাহ্!) একবার করে এই যে নির্বাচন, এর প্রতিটি ধাপ, অধ্যায়, ধারা, এতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের কুশীলবরা – সকলের সাথে পাঠককে পরিচিত করে তোলাটা পত্রিকার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ছাড়া ছাড়া ঘটনা এবং তথ্যগুলো ব্যাখ্যা করাও পত্রিকার দায়িত্ব। অন্যথায় পাঠক ঘটনাকে তার সঠিক প্রেক্ষাপটে দেখতে পাবেন না, নানান স্রোতের তথ্য তাঁকে হকচকিয়ে দেবে। ফিচার পাতায় আসতে পারে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার/তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধানী লেখা বা নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। এসব যুক্তি-তর্ক-গল্প পাঠককে নির্বাচনী বাস্তবতা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

এ তো গেল একটা দিক। পত্রিকা আসলে হয়ে উঠতে পারে নির্বাচনী কুশীলব আর জনগণের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম। পত্রিকার আরেক কর্তব্য সে ক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে, জনগণের দাবি–দাওয়া, আশা-আকাঙ্খা, সমস্যা, প্রয়োজন, চাহিদার কথা সম্ভাব্য রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকাদের কাছে তুলে ধরা। একেক শ্রেণীর জনগণের একেক রকম বক্তব্য আছে। পত্রিকার পাতায় প্রত্যেক শ্রেণীর কথাই এমনভাবে তুলে ধরা চাই যাতে নীতি-নির্ধারকরা সেসব কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য হন। এই কাজটি ফলপ্রসূভাবে করতে গেলে ফিচারের শরণাপন্ন হতেই হবে।

দিন হাতে থাকতে মাঠে নেমে পড়া ভালো। পত্রিকা আঁটঘাট বেঁধে সে সব ঘটনা আর কাহিনী খুঁজে বের করতে পারে যা হয়ত নির্বাচনী প্রচারণা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা–এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই পত্রিকা এসব বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ও পক্ষপাতহীন যোগসূত্র খুঁজতে পারে। তবে এসব করতে গিয়ে ফিচার লেখক কখনোই নিজস্ব মতামত আর কল্পনার পাখায় ভর করে উড়াল দেবেন না। যে কায়দায়, যে গল্পই তিনি বলুন না কেন, সে গল্পের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তি হতে হবে তথ্য এবং যুক্তি।

নির্বাচনী সংবাদে যদি রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কই স্টেজ দখল করে থাকে তবে সেটা বড় বিপদের কথা। পত্রিকার কাছে পাঠক তাঁর সম্ভাব্য প্রতিনিধি, আইন প্রণেতার পরিচিতি-প্রতিশ্রুতির কথা জানার আশা করে। এই জায়গাটাতে ফিচার খুব কাজে লাগতে পারে। নির্বাচনের কয়েকমাস আগে থেকেই পত্রিকা নির্বাচনী এলাকা ধরে ধরে 'বিশেষ আয়োজন' প্রকাশ করতে পারে। একেক পর্বে একেক এলাকার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। সেই এলাকার প্রার্থীদের পরিচিতি থেকে শুরু করে সেখানকার বিশেষ অবস্থা, অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-দাবি, এলাকাবাসীর আশা-আকাঙ্খা সব কিছু নিয়েই ফিচার হতে পারে। এভাবে এগুলো হয়ে উঠতে পারে মানুষের সত্যিকার কথা, জীবন্ত ও বাস্তব। সাময়িক পত্রিকায় এ সুযোগটা বেশি। এভাবে লিখতে গেলে ফিচার লেখকদের সরেজমিনে নির্বাচনী এলাকাগুলো ঘুরে দেখতে হবে, এলাকা বিশেষের বিশেষ

www.pathagar.com

ইস্যুগুলো বুঝতে হবে। স্থানীয় এসব গল্প রাজনীতিবিদদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে ভোটারদের সত্যিকার আগ্রহের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখতে।

শ্রেণী-পেশা ভিত্তিক বিভিন্নগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া-ইস্যুর প্রতি দৃষ্টি রেখে ফিচার হতে পারে, এটা আগেই বলেছি। সংখ্যালঘু, প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো, অথবা কৃষকশ্রেণী, বা বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকরা, ব্যবসায়ী মহল ইত্যাদি নানান অংশের জন্য নির্বাচন আলাদা আলাদা কী কী অর্থ বহন করছে? এরকম বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষরা কী চায়, কী তাদের প্রয়োজন, এরকম নানা প্রশ্ন ধরে, বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোকে বিচার করলে অনেক আগ্রহব্যঞ্জক, গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হতে পারে।

নির্বাচন পূর্ববর্তী ফিচার এসব ইস্যুতে সদ্য বিগত সংসদ/ সরকার বা তারও আগের সংসদ/সরকার এর পারদর্শিতা, সাফল্য বা ব্যর্থতার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমাদের যে সব দৈনিক পত্রিকাতে মহিলা বিষয়ক সাময়িকী আছে তারা ঐ পাতায় নারী অগ্রগতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাংসদদের (বিশেষত নারী সাংসদদের) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে পারে। সাধারণভাবে নারী প্রার্থী এবং প্রাক্তন নারী সাংসদদের ওপরেও নানা রকম ফিচার হতে পারে। রাজনীতির কুশীলবদের সাফল্য-ব্যর্থতার নানা আঙ্গিক, মাত্রা থাকতে পারে। তাঁদের তথা তাঁদের নিজ নিজ সরকারের আমলে দুর্নীতি আর সহিংসতার বিষয় দুটিই তো আলাদা মনোযোগ দাবি করবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত ফিচার পরিকল্পনার সময় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু এলাকার কথা আলাদা করে ভাবা যায়। যেমন, যেসব এলাকায় নির্বাচনী কারচুপি-সহিংসতার নজির আছে সেগুলো, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো অঞ্চল যেখানে এবার নির্বাচনে নতুন কিছু মাত্রা যোগ হবে।

বিগত নির্বাচনগুলোতে আমাদের দেশে কী ধারা দাঁড়িয়েছে, আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা ঐতিহ্য কেমন, সে বিষয়গুলোর ওপর আলাদা করে বিশেষ আয়োজন করা যায়। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণও করা যায়। একইভাবে নির্বাচনে কারচুপির ব্যাপারটি নিয়েও আলাদা আয়োজন হতে পারে–সচরাচর কী ধরনের কারচুপি হয়, মানুষ কীভাবে তা প্রতিহত করতে পারে, বা প্রতিকারের উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে কিনা, ইত্যাদি।

নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই প্রস্তুতি নেয়া যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য সময়টা খুব ভালো। অনুসন্ধানী ফিচারের পাশাপাশি পত্রিকাকে রাজনীতিবিদ-প্রার্থীদের কড়া কড়া সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন/ ফিচারেও মন দিতে হবে। সওয়াল-জবাবের ফেরে কোনো পক্ষই যেন কিছু গোপন করে বা হেলাফেলা করে পার পেয়ে না যান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার থেকে আগ্রহব্যঞ্জক এবং অর্থবহ ফিচার হতে পারে। দলের মূল রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলো চিহ্নিত করে জনগণের চাহিদার সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখা যায়।

গত এক বা দুই নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছিল তা বিচার করা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটাও দেখার বিষয় যে ইশ্‌তেহারগুলো আদৌ কতটা প্রাসঙ্গিক বা বাস্তবসম্মত।

স্থানীয় বেশ কিছু গবেষণা সংস্থা নির্বাচন-পূর্ববর্তী জনমত জরিপ করছে। এগুলোর ভিত্তিতে ভালো ফিচার হতে পারে। ২০০০ সালে ভোটার তালিকাভুক্তির বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক এবং অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল। এখনো এ বিষয়ে এবং ভোটার সংখ্যায় বিরাট লাফের ব্যাপারে বেশ কিছু ভালো ফিচার হতে

www.pathagar.com

পারে। এখানে দরকার অনুসন্ধিৎসার। যে সব এলাকায় মেয়েরা বহু বছর ধরে ভোট দিতে পারছেন না সেসব এলাকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ঐ ইউনিয়নগুলোতে নজর রাখলে কিছু ভালো কাহিনী পাওয়া যাবে।

নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসবে দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কার্যকলাপ, বক্তব্য ততই গুরুত্ব পাবে। সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক প্রতিবেদন, ফিচারের তখন রমরমা হতে পারে। এ জাতীয় কিছু বিষয়ের কথা বলা যায়: বিভিন্ন দাতা দেশ বা গোষ্ঠীর মনোভাব, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মনোভাব, জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলো এমন কি বিদেশী গণমাধ্যম কীভাবে নির্বাচনকে দেখছে ইত্যাদি নিয়ে একাধিক ফিচার হতে পারে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেও ফিচার পাতায় কড়া সাক্ষাৎকার, ব্যাখ্যামূলক ফিচার এবং বিতর্ক চালু রাখা উচিত। বস্তুত ফলাফল থেকেই শুরু হতে পারে নির্বাচনী গাথার নতুন এক পর্ব।

ভাষা বিষয়ে একটু সতর্কবাণী। আমরা ম্যাটম্যাটে মরা ভাষায় ফিচার লিখতে চাই না, সেটা ঠিক। তবে মনে রাখতে হবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ইস্যু এবং ব্যক্তিবর্গ কোনোভাবেই হালকা কেতায় দেখার বিষয় নয়। ভাষা আর বর্ণনা মানানসই রঙিন হলে ক্ষতি নেই তবে বেহিসেবি রঙ চড়ানোর সুযোগ এখানে নেই। লাইবেল বা অপলেখ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। নির্বাচনী কুশীলবদের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখতে তো হবে অবশ্যই, তবে প্রশংসা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ দুটো থেকেই একশ হাত দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সব শেষে ফিচার পাতা/ফিচারের চেহারা-ছবি নিয়ে দুচার কথা। ছবি ব্যবহার করে, রঙবেরঙের অঙ্গ সজ্জায় পাতাকে নজরকাড়া করা দরকার। নির্বাচনী পাতার জন্য আলাদা লোগোর যেমন দরকার তেমন কার্টুনের কথা ভুললে চলবে না। ভালো কার্টুন পাতার বাইরের চেহারা আর বিষয়বস্তুর মান দুইকেই সমৃদ্ধ করে। উপ-সম্পাদকীয়, অতিথি কলাম ইত্যাদি আঙ্গিকে নানান মতামতকে ঠাঁই দেয়া যায়। ব্যক্তি বিশেষের মতামত হিসেবে চিহ্নিত হয়েই লেখাগুলো ছাপা হতে পারে। তর্ক-বিতর্ক নিয়ে আলাদা পৃষ্ঠাও হতে পারে কখনো কখনো।

একজন সম্পাদককে একাধিক প্রতিবেদক/ফিচার লেখকের সাথে একজোট হয়ে নিয়মিত টিমে কাজ করতে হতে পারে। মুখ্যত দলপতির দায়িত্ব খোঁজখবর রাখা এবং সেই মতো পরিকল্পনা ছকে নেয়া। অন্য পত্রিকা কে কীভাবে এগুচ্ছে সেদিকেও চোখ রাখা ভালো। এসব কাজ অবশ্য প্রতিবেদকরা নিজেরাও করবেন। চোখ কান খোলা রেখে, মাথা খাটিয়ে কাজ করলে সম্পাদক-প্রতিবেদকের সৃষ্টিশীলতার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না, শুধু তথ্যনিষ্ঠতা ও যথার্থ বস্তুনিষ্ঠতার গন্ডি না পেরোলেই হলো। ফেব্রুয়ারী ৭, ২০০১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি ফিচার উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হলো।

এখনো ভোট দিতে পারে না মেয়েরা

যে সময়ে জেন্ডার ইস্যুতে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন, মানবাধিকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এনজিও এমনকি সরকার সোচ্চার সে সময়েও পটুয়াখালী জেলার পাংগাশিয়া ইউনিয়নের মহিলা ভোটররা ভোট দিতে যান না, কোনো দিন যানওনি। অথচ ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে, এলাকার মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে, মহিলারা চাকরি করেন, প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং তাদের ভোট না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাববার অবকাশ রয়েছে। তারা ইচ্ছে করেই ভোট দেন না, নাকি

www.pathagar.com

অলিখিত কোনো নিয়মের বেড়াজালে আটকে দেওয়া হয়েছে তাদের ভোটাধিকার? নাকি আছে কোনো ফতোয়া? রহস্য জানতে ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টারের প্রতিনিধিদল তথ্যানুসন্ধানে গিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে, কথা বলেছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে। তাদের দেওয়া বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে জানা-অজানা নানা বিচিত্র তথ্য।

পটুয়াখালী জেলা সদর ছাড়িয়ে ৮ কি.মি. উত্তরে দুমকী থানার একটি ইউনিয়ন পাংগাশিয়া, থানা সদর থেকে ১০ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত এ ইউনিয়নটিই একটি গ্রাম। সাধারণত গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেকগুণ উন্নত সবুজ গাছপালা ঘেরা এ গ্রামটিতে পল্লী বিদ্যুতের কল্যাণে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে প্রায় প্রতিটি ঘরেই। রেডিও তো বটেই টেলিভিশনও রয়েছে অসংখ্য। গ্রামের বেশিরভাগ এলাকাতে সারা বছরই রিক্‌শা চলে। গাড়িতেও অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থাও রয়েছে। অধিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। চাকরি ও ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন প্রচুর লোক। শিক্ষার হার মোটামুটি ভালোই। শিক্ষার জন্য রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ-মাদ্রাসা এমনকি মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য রয়েছে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছোট-বড় কয়েকটি হাটবাজার এবং রাইস মিল রয়েছে এখানে। অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম তবে সংখ্যায় কম হলেও হিন্দু ধর্মের অধিবাসীরাও রয়েছেন।

খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী ইউনিয়নের মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৪০ জন। এদের মধ্যে ৬ হাজার ৪০৫ জন পুরুষ এবং ৪ হাজার ৬৩৫ জন মহিলা। পুরনো ভোটার তালিকায় এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮ হাজার ২৬৬, ৫ হাজার ৪৬২ এবং ২ হাজার ৮০৪ জন।

ইউনিয়নের মহিলাদের ভোট না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে বেশিরভাগ লোকই বলেছেন, স্থানীয় মরহুম পীর মাওলানা হাতেম আলী সাহেবের সম্মানার্থে এলাকার মহিলারা ভোটকেন্দ্রে যান না। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা কিংবা ফতেয়া জারি করা হয়নি। যারা এ বক্তব্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন পাংগাশিয়া নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বর্তমান খাদেম মোঃ আব্দুল জব্বার, ৪নং পাংগাশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ হামিদ মৃধা, সহ-প্রধান শিক্ষক এ কে মোহাম্মদ আলী, সরকারী শিক্ষক মতিয়ার রহমান, পাংগাশিয়া আল মদিনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আব্দুল কাদের খান, ভোটার হাসিনা বেগম, রিজিয়া বেগম, মোসাম্মৎ গোলবানু, শিক্ষিকা মোর্শেদা জাহান, স্থানীয় মুরুব্বি আজাহার আলী আকন (৮৫), ইউপি সদস্যা মিসেস ফরিদা জালাল, কলেজছাত্র আবুল বাসারসহ আরো অনেকে।

এ মন্তব্য একেবারে ভুল নয় এমন প্রমাণও মিলেছে। ৮নং ওয়ার্ডের ভোটার ৭৫ বছর বয়সী মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি বলেন, সম্ভবত ১৯১৯ সালে অর্থাৎ পাংগাশিয়া নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সে বছর অক্ষয় তালুকদার নামের একজন মেম্বার পদপ্রার্থী এই কেন্দ্রে মহিলাদের ভোট দিতে নিয়ে এলে তৎকালীন এবং এলাকার প্রথম পীর মওলানা হাতেম আলী তাদের ভোট দিতে বাধা দেন। সেই সঙ্গে এ ইউনিয়নের মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বংশানুক্রমিকভাবে পীর সাহেবের নীতি বর্তমান পীর সাহেবও সে নিষেধাজ্ঞা চালু রেখেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরো কজন মহিলা এবং একজন শিক্ষক এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন। অপরদিকে এই এলাকার ভোটার আবদুর রব মোল্লা (৭০) জানান, কোনো এক

www.pathagar.com

নির্বাচনের সময় মহিলারা ভোট দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মরহুম পীর সাহেব মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত কজন মহিলা ভোটারের কেউ কেউ বলেন, বাড়ির পুরুষেরা তাদের ভোট দিতে যেতে দেন না। এতে নাকি গুনাহ হয়। মুসলিমদের দেখাদেখি ইউনিয়নের হিন্দু মহিলা ভোটারদেরও ভোটদান বন্ধ রয়েছে। তবে অনেকেই বলেছেন, অন্য বাড়ির মাহিলারা ভোট দিতে গেলে তারাও যাবেন। ভোট দিলে গুনাহ হয় কিনা এর জবাবে প্রায় সবাই বলেন 'না' ভোট দিলে গুনাহ হয় না। কেউ কেউ ভোট দেওয়া ফরজ বলেও স্বীকার করেছেন। যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা সবাই বলেছেন ভোট প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এ ইউনিয়নের কোনো মহিলা ভোট দেননি।

যে কারণেই হোক এ ইউনিয়নের কোনো মহিলা কোনোদিন ভোট দেননি এ রেকর্ড ভেঙেছেন ইউনিয়নের একমাত্র মহিলা। মিসেস ফরিদা জালাল। তিনি বিগত ইউপি নির্বাচনে জীবনে প্রথমবার ভোট দিয়েছেন। তিনি ৩নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য হিসেবে প্রার্থী ছিলেন এবং নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য শিক্ষিকা আকলিমা বেগম, ভোটার গোলেনূরসহ আরো কজন আগামীতে ভোট দিতে যাবেন এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইউপি সদস্য মিসেস ফরিদা জালাল গত ইউপি নির্বাচনে ভোট দিয়ে মহিলাদের ভোট না দেওয়ার রেকর্ড ভেঙেছেন। কেউ তাকে কিছু বলেননি। তিনি আগামী নির্বাচনে মহিলাদের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন বলে 'প্রথম আলো' প্রতিনিধিকে জানান। তবে কোনোদিন ভোট না দেওয়ার জন্য মহিলাদের মধ্যে সংকোচ ও অজ্ঞতা রয়েছে। মিসেস ফরিদা জালাল আরো বলেন, ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ইউনিয়নের মহিলাদের পূর্ব থেকেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবেদক দলটি যখন ওই এলাকায় সরেজমিন তদন্ত করছিলেন তখন একজন তরুন তাদের প্রায় ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

যেখানেই মহিলারা মুখ খুলছে সেখানেই ওই তরুণ আগাম কথা বলে তাদের বক্তব্য ঘুরিয়ে দিয়েছে। আল মদিনা মহিলা মাদ্রাসার এক শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলার সময় ওই মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে একই আচরণ করতে দেখা গেছে। এ কারণে মনে হয়েছে মহিলাদের ভোট না দেওয়ার আসল কারণটি কোনো মহল যে কারণেই হোক প্রকাশ করতে চান না। তথ্যানুসন্ধান শেষে রিকশাচালক আবুল কালাম আকন (২৭) প্রশ্ন করছিলেন, মহিলারা ভোট দিতে পারে না, আর কোনো কাজে তো বাধা নেই, মহিলারা স্কুল-কলেজে যায়, চাকরিও করে। তাছাড়া মহিলা মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষকরা পড়াবেন কেন? দেশে কি মহিলা শিক্ষক নেই? এতে কি পর্দা ভঙ্গ হয় না? প্রশ্নটি পর্যবেক্ষক দলেরও। সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক এমন নির্দেশ রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অথচ ৪নং পাংগাশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো মহিলা শিক্ষক নেই, কোনোদিন ছিলও না।

পটুয়াখালী জেলা নির্বাচন অফিসার বিমল চন্দ্রশীল বলেন, পাংগাশিয়া পীরের কারণে ওই ইউনিয়নের মহিলারা ভোট দিতে যান না। তবে এ ব্যাপারে কোনো ফতোয়া রয়েছে কিনা তিনি তা বলতে পারেন না বলে জানান। মহিলাদের ভোটদানে উৎসাহিত করার ব্যাপারে তারা কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, গত ইউপি নির্বাচনের আগে চেয়ারম্যান, মেম্বার ও মহিলা মেম্বর পদপ্রার্থীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে জেলা ও থানা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত এলাকাবাসী মহিলা ও পুরুষ

www.pathagar.com

সকলেই মহিলাদের ভোট না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে নির্বাচন অফিসের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব হয়নি। তার এ বক্তব্যের সত্যতা মিলেছে ইউপি সদস্যা মিসেস ফরিদা জালাল, স্থানীয় অধিবাসী মোঃ ফেরদৌস আকনসহ আরো অনেকের কথায়। এ ব্যাপারে ওই নির্বাচনের সকল প্রার্থী নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবেই তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে তারা জানান। পাংগাশিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীর হোসেন ঢাকায় থাকার কারণে প্রতিবেদন তৈরির সময় এ প্রতিবেদনে তার বক্তব্য দেওয়া গেল না।

দক্ষিণাঞ্চলের একটি ইউনিয়নের কোনো মহিলা ভোটার ভোট দেন না,যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ অন্ধ অনুসরণ দেশ ও জাতির জন্য বড় লজ্জার। এ প্রথা ভাঙতে হবে। এজন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, স্কুল-কলেজ- মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, মহিলা সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাধ্যমেই মহিলাদের বোঝাতে হবে। কোনোদিন ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ায় মহিলারা ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাদের এ অজ্ঞতা দূর করতে প্রয়োজন এখন থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু করা। এ কাজে স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা, শিক্ষিকা, ইউপি সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মহিলারা ভোট দিতে চান, সুতরাং তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে সব সরকারি চাকরিজীবীকে ভোটদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহিলাদের ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি করা একান্ত জরুরি।

ধীরেন হালদার/শ্যামল সরকার
প্রথম আলো ফেব্রুয়ারী ৭, ২০০১

www.pathagar.com

ভোটার বনাম প্রার্থী

মোয়াজ্জেম হোসেন

ভোটার এবং প্রার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং পারস্পরিক। প্রার্থীর চাহিদা থাকে ভোটের এবং ভোটার ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। জন প্রতিনিধিদের কাছে ভোটারদের নানা রকম প্রত্যাশা থাকে এবং ধরে নেয়া হয় যে প্রতিনিধিরা তাঁদের সেসব আশা পূরণ করবেন।

এই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই প্রার্থী এবং ভোটার বিভিন্ন আচরণ করে থাকেন। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা ভোটারদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করে থাকেন, যদিও পরবর্তী কালে তাঁরা তা বেমালুম ভুলে যান।

প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত, নানা ঘটনায় ভোটারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ভোটারের আচরণে প্রার্থী কীভাবে সাড়া দেন ইত্যাদি তুলে ধরা সাংবাদিকের কাজ। প্রার্থী এবং ভোটারের ওপর কোনো রিপোর্ট লিখতে গেলে একজন সাংবাদিককে ভোটার এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে নানা বিষয় বুঝতে হবে।

যাঁরা জনপ্রতিনিধি বা তা হতে আগ্রহী তাঁদের ভোটারদের সঙ্গে একটি কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এবং সময়ে সেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে হয়। প্রার্থী-ভোটার সম্পর্ক বা একের প্রতি অন্যের আচরণটা প্রত্যক্ষ করা যায় মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে। সাধারণত মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হলেই প্রার্থীরা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কাকে ভোট দেবেন সে ব্যাপারে ভোটারেরও মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রার্থীর আচার ব্যবহার ভোটারের পছন্দকে প্রভাবিত করে। ভোটার এবং প্রার্থীর মধ্যকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক, একের প্রতি অন্যের আচরণের ধরন এগুলো রিপোর্টি-এর জন্য খুবই মূল্যবান উপাদান। নির্বাচনী প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে কতকগুলো বিষয় তুলে ধরা হলো যা গভীর মনোযোগের দাবি রাখে।

মনোনয়নোত্তর অবস্থা

মনোনয়নপত্র জমা দেয়া এবং প্রত্যাহার করা স্থানীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রক্রিয়ার সময় নানা বিষয় একসঙ্গে তড়িঘড়ি করে ঘটতে থাকে এবং তা ভোটার ও প্রার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত তৈরি, ক্ষমতাসীন প্রার্থীর যোগ্যতা,

www.pathagar.com

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্ক, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব রিপোর্ট হতে পারে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের মুখে, স্থানীয় মাস্তানদের ভয়ে, ভোটারদের একাংশের অনুরোধে অথবা ধনাঢ্য প্রার্থীর প্ররোচনায় অনেক প্রার্থী তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে বা রাজনীতিতে কোনো ধরণের মেরূকরণ হলে তা রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা ভোটারদের এবং স্থানীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করলে তা পাঠককে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

প্রার্থী-ভোটার প্রত্যক্ষ সম্পর্কে

ভোটার এবং প্রার্থীর সরাসরি যোগাযোগ শুরু হয় প্রচারভিযানের সাথে সাথে। এই পর্যায়ে ভোটারের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রার্থী নানা রকম পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করেন। ভোটাররা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করেন প্রার্থীরা কীভাবে বিভিন্ন বিষয় তাঁদের কাছে উপস্থাপন করছেন, ভোটারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রার্থী কোন দৃষ্টিতে দেখছেন এবং কীভাবে তাতে সাড়া দিচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভোটারের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁরা প্রার্থীদের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে মূল্যায়ন শুরু করে দেন। প্রার্থীরাও নানা জায়গায় নানা বিষয়ে খাপ খাইয়ে নেবার, সমঝোতা করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

দলীয় পরিচিতি

একজন প্রার্থীর দলীয় পরিচিতি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে বড় ভূমিকা রাখে। কারণ দলীয় কর্মকাণ্ড এবং দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রার্থীর নিজের কর্মসূচির অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে একজন নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থী এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য

কোনো কোনো পরিবারকে বংশ পরম্পরায় একই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। ওই রকম পরিবার থেকে কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিলে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই এক ধরনের জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি পেয়ে যান নিজস্ব এলাকায়। প্রচুর জমির মালিক বা বিরাট ব্যবসা আছে এমন পরিবারের প্রার্থীর স্বাভাবিকভাবেই এলাকার উচ্চবিত্ত বা বণিক শ্রেণীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকে। যখন কোনো রাজনৈতিক দলের ধনাঢ্য প্রার্থী ভোটারের সামনে হাজির হন তখন ভোটররাও কম বেশি প্রভাবিত হন। অন্যদিকে যে প্রার্থীর রাজনৈতিকভাবে কোনো পরিচয় নেই এবং যাঁর ধন সম্পদের পরিমাণও খুব কম তাঁর পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করা বেশ কঠিন। আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়েও নির্বাচনে ভালো করতে পারেন না।

অর্থ ও পেশীশক্তি

অর্থ-সম্পদ প্রার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচন কমিশন একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করে। ১৯৯৬ সালে সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা তিন লক্ষ টাকা ছিল। ২০০১ সালের

www.pathagar.com

নির্বাচনে তা বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ করার সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশন। একজন প্রার্থীর পক্ষে খুব সহজে এই ব্যয় সীমা লঙ্ঘন করা সম্ভব। কারণ একজন প্রার্থী কোথায় কখন কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন তা পরিমাপ করবার বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি নির্বাচন কমিশনের হাতে নেই।

গত কয়েকটি নির্বাচনে পেশীশক্তির ব্যবহার খুব লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থী পেশীশক্তি ব্যবহার করেন মূলত ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য অর্থাৎ ভয় দেখানোর জন্য, কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে ভোট দেবার অথবা না দেবার ভয়। বলা হচ্ছে এজন্য কালো টাকা ব্যবহার করা হয়। স্বৈরশাসনামলে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য ব্যাপক হারে "মাস্তান, অস্ত্র এবং অর্থ" ব্যবহার করা হয়েছিল।

একজন প্রার্থীর আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই বোঝা যাবে যদি এলাকার বিভিন্ন সংগঠন, অবৈধ টাকার মালিক বা মাস্তানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন প্রার্থী ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জাতীয় এবং স্থানীয় বিষয়ে একজন দলীয় প্রার্থী এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি দু'রকম। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কোনো দলীয় বাধ্যবাধকতা বা নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু একজন দলীয় প্রার্থীকে সব কিছুকে তাঁর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করতে হয়। প্রার্থীর নিজস্ব বিবেচনা সেখানে অনেকটা অকার্যকর।

প্রার্থীর আবাস ও মর্যাদা

একজন প্রার্থীর আচরণ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাসস্থানের অবস্থান দ্বারা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ নিরক্ষর। যাঁরা মনোয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা সাধারণত শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক জরিপে দেখা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের ৬৯ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁরা মনোনয়ন পেয়েছিলেন বড় দলগুলোর কাছ থেকে। যাঁরা ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আট শতাংশ প্রার্থী নিয়মিতভাবে গ্রামে বসবাস করতেন, ২০ শতাংশ বসবাস করতেন থানা সদরে এবং বাকি ৭২ শতাংশ বসবাস করতেন শহরগুলোতে। এ থেকেই বোঝা যায় ভোটার এবং প্রার্থীদের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে। ওই একই জরিপে দেখা যায় ৩৮ শতাংশ ভোটারের প্রার্থী সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। জরিপে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এ থেকে প্রতীয়মান হয়: "প্রার্থী ও নির্বাচনী এলাকার মধ্যকার এ দূরত্ব এক ঘোরতর সামাজিক সমস্যা।"

ভোটারদের আচরণ

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটাররা কীভাবে অংশগ্রহণ করেন বা কীভাবে সম্পৃক্ত হন তা একজন রিপোর্টারের বা নির্বাচন নিয়ে যিনি লেখালেখি করেন তাঁর জানা থাকা দরকার। কে বা কারা দেশ শাসন করছেন, রাজনীতিতে ভোটারদের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্তি, শিক্ষার হার, এলাকায় কোনো প্রার্থীর উন্নয়নে অবদান, পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের প্রত্যাশা এসব বিষয়গুলো একজন ভোটারের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

www.pathagar.com

এরকম কোনো বিষয়ে রিপোর্ট করতে হলে দরকার মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, মতামত জরিপ, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং যে সমস্ত গবেষণা বা জরিপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সেগুলোর সাহায্য নেয়া। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে জরিপ করেছিল তা থেকে রিপোর্টাররা নানা ধরনের সাহায্য পেতে পারেন। পরবর্তীতে আরও অনেক জরিপ হয়েছে বা এখনো হচ্ছে।

ভোটাররা সাধারণত তিনটি পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান:

ক) মনোনয়ন

খ) নির্বাচনী প্রচারণা এবং

গ) ভোট দান।

ক) মনোনয়ন: এই প্রক্রিয়ার সংগে ভোটাররা সরাসরি জড়িত নন। কিন্তু ভোটাররা একজন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য রাজি করাতে পারেন। মনোনয়ন দেবার সময় ভোটাররা কোনো প্রার্থীর পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দলকে চাপ দিতে পারেন বা লবি করতে পারেন। একইভাবে তাঁরা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার ব্যাপারেও চাপ প্রয়োগ করতে পারেন।

কাকে মনোনয়ন দেয়া হবে এ ব্যাপারে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের মতামত নেয় না। বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। প্রধান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ বা কাকে মনোনয়ন দেয়া হবে এই সিদ্ধান্ত সাধারণত রাজধানী শহর বা মেট্রোপলিটন শহরের দলীয় প্রধান কার্যালয়গুলো থেকে নেয়া হয়, যেখানে সাধারণ ভোটারদের পৌছানো প্রায় দুঃসাধ্য।

খ) নির্বাচনী প্রচারণা: নির্বাচনী প্রচারণা যখন উৎসবের আকার ধারণ করে তখনও অনেক ভোটার প্রচারণায় অংশ নেন না। আবার যাঁরা ভোটার হবার যোগ্য নন তাঁরাও প্রচারণায় অংশ নেন। অন্যদিকে পুরুষ ভোটাররা মহিলা ভোটারদের থেকে প্রচারণায় বেশি অংশ নেন।

প্রচারণার সময় প্রার্থীরা ভোটারদের সংগে সরাসরি যোগাযোগ করেন মূলত:

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে দেখা সাক্ষাৎ;

খ) মিছিল; এবং

গ) জন সমাবেশের মাধ্যমে।

এসব ছাড়াও একজন প্রার্থী তাঁর এজেন্ট, ক্যাসেট রেকর্ডার, বিজ্ঞাপন, ইশ্‌তেহার, বুকলেট, পোস্টার, লিফ্‌লেট, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন।

গ) ভোট দান: শেষ পর্যায়ে একজন ভোটার যখন ভোট দিতে যান তখন প্রার্থী সম্পর্কে তাঁর কাছে যে তথ্যগুলো থাকে সেগুলোকে তিনি বিবেচনায় আনেন। যেমন:

১। প্রার্থীর বয়স, শিক্ষা এবং পেশা,

২। প্রার্থীর অর্থনৈতিক অবস্থা,

www.pathagar.com

৩। প্রার্থীর দলীয় পরিচিতি,

৪। প্রার্থীর বাগ্মিতা,

৫। প্রার্থীর জনসংযোগ,

৬। প্রার্থীর নৈতিক চরিত্র,

৭। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে প্রার্থীর সম্পৃক্ততা।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ভোটারকে যে সমস্ত বিষয় প্রভাবিত করে এটি তার পরিপূর্ণ তালিকা নয় । আরও অনেক বিষয় আছে যা ভোটারকে প্রভাবিত করে।

পরিবারের সদস্যদের প্রভাবের বিষয়টি এখানে ছোট করে দেখা উচিত নয়। এদেশের যুবক, মহিলা এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, নিকটতম আত্মীয়, মত মোড়ল (opinion leader) বা প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রার্থী নির্বাচন করেন। সাধারণত মত মোড়লরাই 'ভোট ব্যাংক' নিয়ন্ত্রণ করেন। ভোটারদের ওপর তাঁদের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

ভোটার কাকে ভোট দেবে এ সিদ্ধান্ত নিতে নির্বাচনী প্রচারণারও একটি ভূমিকা রয়েছে। ভোটারের বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থা, গণমাধ্যমে সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক অবস্থান এসব বিষয়ও ভোটারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে। এখানে কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হলো, ভোটারদের মনে নিশ্চয়ই আরও অনেক বিষয় থাকে।

হুজুগে বিষয়

হঠাৎ করে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেতে পারে যার জন্য জাতীয় পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা কোনো বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রার্থীর জনপ্রিয়তায় পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এটি সাধারণত নির্বাচনের আগের দিন বা দু'এক দিন আগে ঘটে। নানা কারণে এটি ঘটতে পারে, তাতে ভোটারদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও প্রভাবিত হয়। একটি মাত্র ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে ভোটারের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। শেষ মুহূর্তের এই হুজুগ যে কোনো একটি অপপ্রচারের কারণেও হতে পারে।

Bibliography

1. Hossain, Monowar 1992. A study on Voter Behaviour in Bangladesh during 1990 and 1991 Elections.

2. Hossain, Mahbub; Rahman, Hossain Zillur and Sen, Binayak. 1991. BIDS survey of Election '91, Preliminary Findings.

www.pathagar.com

সদালাপী সাংবাদিক

ওবায়েদুল হক

রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, চিকিৎসকসহ সমাজের অন্যান্য বহু পেশার মানুষ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কম বেশি ভূমিকা পালন করে থাকেন। এদের সাথে সাংবাদিকদের সার্বক্ষণিক এক ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। বলতে গেলে, তাঁদের চর্তুদিকে সাংবাদিকদের ঘুরতে হয়। এ সময় সাংবাদিকরা কাজ করেন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াগুলোর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক ও পাহারাদার হিসেবে, ওপর-থেকে-দেখা উপগ্রহ হিসেবে নয়।

জনস্বার্থে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁদের সাথে পেশাগত কর্তব্যের খাতিরেই সাংবাদিকদের এক ধরনের মানবীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। বস্তুত সাংবাদিকদের প্রধান কাজ হচ্ছে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশে-বিদেশে প্রতিনিয়ত যা কিছু ঘটছে সবকিছু রিপোর্ট করা। আজকের পৃথিবীর সঠিক চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা ও নিজেদের বিচার-বুদ্ধির আলোকে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে মনোমালিন্য বা অস্বাভাবিক সম্পর্ক সাংবাদিকদের উক্ত জনসেবামূলক কাজের ক্ষতি করতে পারে। পক্ষান্তরে, রাজনীতিবিদদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সমঝোতা সৃষ্টি এবং তথ্যের সহজতর প্রবাহকে নিশ্চিত করতে পারে।

জনগণের স্বার্থে রাজনীতিবিদরাও সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। জন কল্যাণে কাজ করাই উভয়ের অভিন্ন উদ্দেশ্য। মোদ্দা কথা, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের জনগণের কল্যাণেই কাজ করা উচিত। উভয় পক্ষের মধ্যে এই ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি হলে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমে যায়।

তবে, জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত কোনো রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী সাংবাদিকদের পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। কোনো রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী সেসব বিষয়ে কখনোই মুখ খুলবে না, যেসব বিষয় প্রকাশ করতে তারা ভয় পায়।

কিন্তু যেসব রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর কাছে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আছে তাদের সাথে সাংবাদিকদের সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেই হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বা অন্যান্যদের সাথে সাংবাদিকদের কথা না বলে উপায় নেই। জনস্বার্থের সাথে যেকোনোভাবে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপের সময় একজন সাংবাদিকের এই বিশ্বাসের জন্ম দেয়া উচিত যে, তাঁদের বক্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সাংবাদিক প্রকারান্তরে তাদের সাহায্যই করতে চায়। এক্ষেত্রে, জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট একজন সৎ ব্যক্তি খুশি মনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং তার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই একজন রিপোর্টারকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের স্বার্থে কাজ করে তার পক্ষে একজন রিপোর্টারকে বিপক্ষ শক্তি বা শত্রু হিসেবে বিবেচনা করারই কথা।

আন্তর্জাতিক মুক্ত সংবাদপত্র দিবসে (৫ই মে, ১৯৯৫) প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাপী মোট ১০৩ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৩০ জনের অধিক সাংবাদিককে টানতে হয়েছে জেলের ঘানি। ওই পরিসংখ্যান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা চর্চারত দুঃসাহসী সাংবাদিকরা সর্বদা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলেন। বস্তুত স্বাধীন সাংবাদিকতার সাথে কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব সবসময়ই চলছে।

পেশাগত সততা

সাংবাদিকদের উচিত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকজনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। তবে এই সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পেশাগত সততা বিসর্জন দিয়ে কোনো তথ্য প্রদানকারী উৎসের আস্থা অর্জন করলে তাকে 'সুবিধাবাদ' নামে আখ্যায়িত করা যায়, তাকে কখনোই নীতিজ্ঞান সম্পন্ন সাংবাদিকতা বলা যায় না।

বক্তৃতা রিপোর্টিং

সাংবাদিক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে পেশাগত সাংবাদিকতার কলা-কৌশলসমূহ সম্পর্কে জানতে হবে। এটি প্রথম শর্ত। দ্বিতীয়ত যে সংবাদপত্রে তিনি কাজ করেন সেই সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। যদি সংবাদপত্রটি কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হয় তবে সেই স্বার্থ দেখা ছাড়া একজন সাংবাদিকের তেমন কিছুই করার থাকে না। দলের একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে এই সংবাদপত্রের সম্পাদককে ও দলের মর্জি অনুসারে কাজ করতে হয়। বস্তুত দল কর্তৃক প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় উপদেশাবলী মাথায় নিয়েই এই ক্ষেত্রে সম্পাদক কাজ শুরু করেন। দলীয় কোনো সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের বিশ্বস্ততার সাথে ওই সংবাদপত্রের নীতিমালা মেনে চলতে হয় এবং সর্বদা দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যেতে হয়।

বক্তৃতা বা কোনো জনসভার রিপোর্ট করার সময় দলীয় পত্রিকার সাংবাদিককে সংশ্লিষ্ট দলের সুবিধার্থে বস্তুনিষ্ঠতা বিসর্জন দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে সে পূর্বপরিকল্পিত এমন রিপোর্ট করবে যা দলের জন্য সুবিধাজনক। অবশ্য ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্রের একজন মহৎ ও সুযোগ্য সাংবাদিক রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। তবে শর্ত হচ্ছে সে ক্ষেত্রে মালিককে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী হতে হবে।

একজন যোগ্য সাংবাদিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। তাঁকে একাধারে শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বহু বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সর্বোপরি, তাঁকে হতে হয় মানসিকভাবে সুদৃঢ় ও সৎ। একজন ভাল ও যোগ্য সাংবাদিক কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে রিপোর্ট করেন না। কোনো তথ্য পেলে, তার সত্যাসত্য যাচাই করে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন।

www.pathagar.com

জনসভায় সাধারণত বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। সব বক্তব্য আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে সমান ট্রিটমেন্ট পায় না। বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকে। প্রায়শই দেখা যায়, কোনো বক্তা সংবাদপত্রে কতটা স্থান পাবেন তা নির্ধারিত হয় বক্তার গুরুত্বানুসারে, বক্তৃতার গুরুত্বানুসারে নয়।

নীতিগতভাবে সাংবাদিকদের সবসময় ন্যায় নীতি ও সত্যের পক্ষে থাকা উচিত। অনৈতিক কোনো কিছুই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত যে, যা কিছু নীতিগতভাবে সঠিক নয় তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক হতে পারে না। নিজের করা কোনো ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিক কখনো দ্বিধা করবেন না। তিনি ভালো করেই জানেন ভুল করা স্বাভাবিক এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে ভুল করতে পারেন।

সাংবাদিকদের সর্বদা একটা নীতিবাক্য মনে রাখা উচিত। নীতিবাক্যটি হচ্ছে: 'সত্য সর্বদা পবিত্র, মতামত স্বাধীন'। সম্পাদকীয় মন্তব্যে সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রতিফলিত হয়। যে কেউ এই মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। কিন্তু সত্যকে সবারই গ্রহণ করতে হবে। তাই কোনো সংবাদপত্র নীতিগতভাবে কোনো সত্যকে বিকৃত করতে পারে না। তাতে সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হয়।

সত্যিকারের মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদপত্র শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পরিবেশে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য যে কোনো পেশাজীবীর চেয়ে সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন, "চারটি বৈরী সংবাদপত্র হাজার বেয়নেটের চেয়েও অধিক ভীতিকর।" গণতান্ত্রিক পরিবেশে সংবাদপত্রের বিপুল ক্ষমতার স্বীকৃতি মেলে নেপোলিয়নের মন্তব্যে।

নির্বাচনে কারচুপি ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বনের চর্চা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। এধরনের চর্চা একটি দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কারচুপি ও 'কালো' টাকার ব্যবহার এক সময় পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই প্রহসনে পরিণত করে এবং গণতন্ত্রকে পরিণত করে অবজ্ঞার বস্তুতে

কয়েক বছর পূর্বের কথা। কোনো এক গণভোট অনুষ্ঠানের দিন লণ্ডনের এক সংবাদপত্রের জনৈক সাংবাদিক ঢাকার রাস্তায় এক ভোটারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভোট দিতে গিয়েছিলেন?"

উত্তরে ভোটার বললেন, "না"। সাংবাদিকের প্রশ্ন, "কেন"?

ভোটার উত্তর দিলেন, "ভোট দিতে যাবার কোনো মানে হয় না। কারণ, যদি আমি 'হাঁ' ভোট দিই তবে তা 'হাঁ' ভোট হিসেবেই গণ্য করা হবে; যদি 'না' ভোট দিই তবে সেটাও 'হাঁ' ভোট হিসেবেই রেকর্ড করা হবে। 'হাঁ' বা 'না' যেই ভোটই দিই না কেনো তা সর্বদা 'হাঁ' ভোট হিসেবেই গণনা করা হবে।"

বাংলাদেশী স্টাইলে নির্বাচনের এই হয়েছিল হাল। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে গণতন্ত্রের প্রশ্ন। যেখানে গণতন্ত্র নেই সেখানে যেকোনো নির্বাচন প্রহসনমূলক হতে বাধ্য। গণতন্ত্রকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে সত্যিকার অর্থে অবাধ, পরিচ্ছন্ন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া আবশ্যক। লজ্জাজনক হলেও সত্য যে আজও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমাদের আবেদন জানাতে হয়। সংগ্রাম করতে হয়। আজও 'রামের ভোট শ্যাম দিয়ে দিতে পারে' ধরণের ভয় আছে। আর এটাই

www.pathagar.com

প্রমাণ করে যে, এদেশে কখনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই গণতন্ত্রও এখানে অস্থিতিশীল।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনীতিবিদ ও তাদের কার্যকলাপসমূহকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণ করার রেওয়াজ বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত এই কাজটি করে সাংবাদিকরা। রাজনীতিবিদরা যেহেতু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে সেহেতু তাদের কাজ-কর্ম বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সাংবাদিকরা তাদের কাজ-কর্ম ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে ব্যাপক হারে রিপোর্ট করে থাকে।

তবে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের সাংবাদিকদের পক্ষে রাজনীতিবিদ ও তাদের কার্য-কলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। রাজনৈতিক নেতাদের পর্যবেক্ষণ করা ও নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় তাদের ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করার মত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চাই গণতান্ত্রিক মেজাজ ও সহনশীলতা, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনুপস্থিত। তাই এসব দেশে রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করতে যাওয়া সাংবাদিকদের জন্য সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ।

শত বাধা-বিপত্তি ও ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকদের উচিত জন জীবন প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে রিপোর্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে হতে হবে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য পথ হিসেবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজেরা সচেতন হওয়া এবং জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা সাংবাদিকদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাংবাদিকতার আদর্শের প্রতি যথাযথ নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, স্থান ও কাল ভেদে যেকোনো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে সাংবাদিকদের উচিত জনস্বার্থের পক্ষে নির্ভিক ধর্মযোদ্ধার উৎসাহ নিয়ে কাজ করে যাওয়া এবং জনগণের মুখপত্র হয়ে উঠা। এভাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই সাংবাদিকরা উন্নীত হতে পারে 'চতুর্থ রাষ্ট্রের' সম্মানজনক পদমর্যাদায়।

www.pathagar.com

নির্বাচনী ইশ্‌তেহার

এম এম আকাশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে নির্বাচন করানো শুরু হয় ১৯৯১ সালে। ১৯৯৬ সালে বিধানটি একটি সাংবিধানিক আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যথাক্রমে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে দুটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এ পদ্ধতিতে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনটি ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান প্রধান দলগুলো ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই কর্মব্যস্ততার একটি অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে নিজ নিজ দল বা জোটের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচনী ইশ্‌তেহার প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা। অতীতে সবগুলা প্রধান দলই এই "ট্র্যাডিশান" রক্ষা করে নিজ নিজ দলীয় নির্বাচনী ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে এসেছে।

বাংলাদেশে অবশ্য ভোটারদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশের পক্ষেই এসব নির্বাচনী ইশ্‌তেহার নিজে পাঠ করা এবং অনুধাবন করা খুবই দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বললেই চলে। তবু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে এর গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত তাঁরাই এসব নিয়ে এখনও পর্যন্ত মাথা ঘামিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ও রাজনৈতিক মেঠো বক্তৃতার মাধ্যমে ইশ্‌তেহারের বাণী সাধারণ লোক-সমাজে পৌঁছে যায়। এই ইশ্‌তেহারগুলোর আরেকটি গুরুত্ব হচ্ছে এগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের লিখিত ঘোষণা, যার একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। গবেষকরা এই দলিলগুলো থেকে দলগুলোর তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন এবং দলীয় অবস্থানের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছবিও কালক্রমে এ থেকে বেরিয়ে আসবে। তাছাড়া সচেতন ভোটার সমাজ বিজয়ী দলকে তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলোর ভিত্তিতে জবাবদিহিতায় বাধ্য করতে পারেন। অবশ্য এসব কিছুই নির্ভর করবে গবেষকদের আন্তরিকতা ও ভোটারদের সচেতনতার মাত্রার ওপর।

এক্ষেত্রে একটি উদ্যোগ হচ্ছে সেড কর্তৃক প্রতি নির্বাচনী বছরে গবেষক-সাংবাদিক-লেখকদের রচনাবলী নিয়ে নির্বাচনী তথ্যপঞ্জী প্রকাশ। গত ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেভাগে সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, নির্বাচন বিশ্লেষকদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এ বইটি সেড

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছিল (দেখুন সেড, ১৯৯৫) এবং সেখানে গত নির্বাচনের পূর্ববর্তী নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশ্‌তেহার নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে (দেখুন দিলারা বেগম, ১৯৯৫)। যদিও ঐ প্রবন্ধে হাকিমকে উদ্ধৃত করে (দেখুন হাকিম, ১৯৯৩) লেখিকার সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি ছিল: "বাংলাদেশের ভোটারদের সচেতন শ্রেণী নির্বাচনী ইশ্‌তেহারকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাঁরা দেখেছেন ইশ্‌তেহারগুলো গালভরা প্রতিশ্রুতিসর্বস্ব। ক্ষমতায় গিয়ে কোনো দলই এসব অঙ্গীকরি পালন করে না। পূর্ববর্তী শাসনামলগুলোতে ভোটাররা যে সব বঞ্চনার শিকার হয়েছেন তারই ফল হিসাবে এসেছে এ সব সন্দেহপ্রবণতা।" তবুও এই আলোচনা অব্যাহত রাখার একটি মূল্য আছে। মূল্যটি হচ্ছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী দলগুলোকে চিহ্নিত করে পরবর্তী ভোটের আগেই জনগণকে তা জানিয়ে দিলে তাদের ভোট দান সিদ্ধান্ত আরও যৌক্তিক হতে পারে। অবশ্য অমর্ত্য সেন যেমন বলেছেন, "দীর্ঘ দিন ধরে বঞ্চিত মানুষের আশা করার ক্ষমতাই যদি লোপ পায়, তাহলে সে সঙ্কট থেকে সহসা উদ্ধার পাওয়া অত সহজ নাও হতে পারে" (দেখুন সেন, অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, পৃ:৪৭) । আমাদের ভোটাররাও যদি বর্তমানে চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে এসব আলোচনার মূল্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। কিন্তু তারপরেও চেষ্টা অব্যাহত রাখাই মানুষের ধর্ম।

গত আলোচনায় দিলারা বেগম যে প্রধান দলগুলোর নির্বাচনী ইশ্‌তেহার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সে দলগুলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (সংক্ষেপে বিএনপি), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (সংক্ষেপে আ.লীগ)। জাতীয় পার্টি (সংক্ষেপে জাপা), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (সংক্ষেপে জামাত), বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সংক্ষেপে সিপিবি) এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (সংক্ষেপে বাকশাল)। এই ইশ্‌তেহারগুলো ছিল ১৯৯১ এর নির্বাচন উপলক্ষে প্রণীত ইশ্‌তেহার। এইবার আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব ১৯৯৬ এ প্রণীত নির্বাচনী ইশ্‌তেহার বিষয়ে। ১৯৯১ সাল থেকে '৯৬ সালের মধ্যে রাজনৈতিক নদীতে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। বাকশাল নিজ অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে। ফলে ১৯৯৬ সালে বাকশাল প্রণীত কোনো স্বতন্ত্র ইশ্‌তেহার ছিল না। সিপিবিও অন্যান্য বামদলগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে বামফ্রন্ট গঠন করে '৯৬ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে সিপিবির সভাপতি টেলিভিশনে বক্তৃতা প্রদান কালে তাদের দলীয় অবস্থান পৃথকভাবে সেখানে সংক্ষেপে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এবারও আমরা ১৯৯৬ এর যেই "ইশ্‌তেহারগুলো" নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

ক) "জাতীয় সংসদ নির্বাচন, '৯৬ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

খ) "নির্বাচনী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, '৯৬" বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

গ) "জাতীয় সংসদ নির্বাচন, '৯৬ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার" জাতীয় পার্টি।

ঘ) "মেনিফেষ্টো" জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

ঙ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ উপলক্ষে ৬ই জুন তারিখে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত সিপিবির সভাপতি তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, মঞ্জুরুল আহ্‌সান খানের ভাষণের মুদ্রিত কপি।

www.pathagar.com

পদ্ধতিগত সমস্যা

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের কাঠামো বিভিন্ন হওয়ায় এদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কিছুটা কৃত্রিম ও কঠিন হয়ে পড়েছে। যেমন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ইশ্‌তেহারে একটা বড় অংশই নিবেদিত হয়েছে নিজ নিজ শাসনামলের কৃতিত্ব ও অন্যের শাসনামলের সমালোচনা বর্ণনায়। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামী ও সিপিবির আলোচনায় নিজস্ব শাসনামলের সম্পর্কে কথা আসেইনি, কারণ তারা কখনো শাসন ক্ষমতাতেই ছিল না। আবার ইশ্‌তেহারের ভূমিকা লিখতে গিয়ে একেক দল এক এক সময় থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা শুরু করেছে। ফলে তাদের বক্তব্যের বিস্তৃতি ও বিষয়বস্তুও একই মাত্রায় থাকেনি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেও একেক দলের অনুপুঙ্খতার (Concreteness) মাত্রা এবং ক্ষেত্র বা বিষয় নির্বাচনও (Area Selection) একেক রকম বিধায় সেখানেও তুলনা করা সর্বদা সহজসাধ্য হবে না।

উপরোক্ত সমস্যাবলীর কিছুটা সমাধানের জন্য প্রবন্ধে আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব করছি। নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে প্রধানত তিনটি জিনিস থাকে, যথা:

ক) দেশের রাজনৈকি ইতিহাস সম্পর্কে নিজ নিজ দলের মূল্যায়ন;

খ) নিজেদের শক্তির দিক এবং অপরের দুর্বলতার দিক বর্ণনা; এবং

গ) প্রতিশ্রুতিসমূহ।

আমরা এই প্রবন্ধে তিনটি দিক নিয়েই আলোচনা করতে আগ্রহী। তবে প্রথম দুটি বিষয়ের আলোচনা হবে দল-ভিত্তিক। অর্থাৎ এসবক্ষেত্রে দলীয় বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ দল ধরে ধরে পালাক্রমে বর্ণনা করা হবে। তবে "প্রতিশ্রুতির" আলোচনার সময় আমরা ক্ষেত্র ধরে ধরে অগ্রসর হব। যেমন, "সংবিধান" বিষয়ে আওয়ামী লীগ কী বলেছে, বিএনপি কী বলেছে, জাতীয় পার্টি কী বলেছে ইত্যাদি। এইভাবে দলের নিজস্ব মত এবং ক্ষেত্র বা বিষয় অনুসারে বিভিন্ন দলের প্রতিশ্রুতি—উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী ইশ্‌তেহারগুলোর পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য আরও পরিস্ফুটিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দলীয় মূল বক্তব্য: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ যদিও, ৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক আসন (১৪৬টি) এবং সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল (প্রায় ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট) কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ছিল খুবই সাদামাটা এবং তন্বী আকারের। মাত্র ১৩ পৃষ্ঠা। যে জায়গায় জামায়াতে ইসলামীর "ম্যানিফেষ্টোর" আয়তন ছিল ৩১ পৃষ্ঠা। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের আয়তনও বেশ বড়, যথাক্রমে ২২ পৃষ্ঠা এবং ৩১ পৃষ্ঠা। এ থেকে বোঝা যায় যে ৯৬ সালের ইশ্‌তেহারে আওয়ামী লীগ বাগাড়ম্বর যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য যত্নবান ছিল। বস্তুত নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের মাত্র তিন পৃষ্ঠার মধ্যে আওয়ামী লীগ তার "অতীতচারিতা" সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

এই তিন পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মূল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিএনপি শাসনামল। আওয়ামী লীগ দাবি করে যে বিএনপি আমলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, লুটপাট, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অপকর্মে দেশ ছেয়ে যায়। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ বিএনপির পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি প্রত্যাখান করে স্বীয় তত্ত্বাবধানে একটি ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। তবে এই নতুন সংসদের কার্যদিবস ছিল মাত্র চার দিন। এই সংসদ ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থায়ী অন্তবর্তীকালীন বিধান সন্নিবেশিত করার পর পরই ভেঙ্গে যায়। এই ভাবেই তৈরি হয় '৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের পটভূমি। আওয়ামী লীগ এই ঘটনাকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে দলের ও জনগণের একটি বিজয় হিসাবে চিত্রিত করে।

এই পর্যায়ে ইতিবাচক বক্তব্যের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ "বঙ্গবন্ধুর সুখী ও শোষণমুক্ত" বাংলাদেশ কায়েমের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা পুনরায় তুলে ধরে। তবে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় যে চারটি মূলনীতি ছিল: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র তা সংশোধন করে আওয়ামী লীগ লিখেছে "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নবতর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে" (পৃঃ-৩)।

লক্ষণীয় যে উপরোক্ত বক্তব্যে "সমাজতন্ত্রের" ও "শ্রেনী সংগ্রামের" কোনো স্থান নেই। অবশ্য ৯১ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারেও আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেছিল (দেখুন দিলারা বেগম, ১৯৯৫)। সুতরাং বলা চলে অতীতের মত '৯৬ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের মতাদর্শ ছিল শ্রেণী সমঝোতা ও মিশ্র অর্থনীতি।

বিএনপি

বিএনপির নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের ২২ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় ১১ পৃষ্ঠাই (অর্ধেক) ব্যয় হয়েছে 'রাজনৈতিক বক্তব্য' বর্ণনায়, যার সিংহ ভাগই হচ্ছে "অতীতচারিতা"। বিএনপি প্রথমেই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনামলকে। পক্ষান্তরে নিজের শাসনামলের সুফলগুলোও বেশ উদারভাবে তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধুর শাসনের বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান অভিযোগ তুলে ধরা হয়:

ক) দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা।

খ) দুর্নীতি ও অযোগ্য শাসনের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।

গ) গণতন্ত্র হত্যা করে এক দল ও এক ব্যক্তির শাসন তথা বাকশাল কায়েম।

নিজের শাসনামলের (১৯৯১-৯৫) যেসব কৃতিত্বের দাবি করা হয় তা হচ্ছে:

ক) স্বৈরশাসক এরশাদ আমলে অর্থনীতির যে দেউলিয়াত্ব সৃষ্টি হয়েছিল (যেমন: বাজেটের শতকরা ১০০ ভাগের বেশি পরনির্ভরতা) তা থেকে দেশকে উদ্ধার করা।

www.pathagar.com

খ) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা।

গ) অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা ।

এ ছাড়া নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের এই অংশে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের সমালোচনা করা হয় এবং ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি নবায়ন না করার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়। লক্ষণীয় যে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য বিধান প্রণয়নের যে ঘটনাকে "আন্দোলনের বিজয়" হিসাবে চিত্রিত করতে চেয়েছে, বিএনপি তাকে সংবিধান রক্ষা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি মহান পথ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে তাই লিখেছে, "৬ষ্ঠ সংসদের স্থায়ীত্বকাল যত স্বল্পই হোক তার গুরুত্ব ও অবদান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সংবিধানের ইতিহাসের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে" (পৃঃ-৭)।

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ষষ্ঠ সংসদকে একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের ফল হিসাবে দেখেছে এবং কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি। লক্ষণীয় যে একমাত্র বিএনপিই তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের শিরোনামে লিখেছিল: "নির্বাচনী ঘোষণা: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬" । পক্ষান্তরে অন্য সব দল নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে '৯৬ এর নির্বাচনকে 'সপ্তম' হিসাবে উল্লেখ এড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারছেন।

জাতীয় পার্টি

'৯৬ এর নির্বাচনে জাতীয় পার্টি প্রথমে অংশগ্রহণে রাজি ছিল না। তারা প্রথমে কারাবন্দী এরশাদের মুক্তিকে নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। পরে অবশ্য তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে এর ব্যাখ্যা প্রদান করে লেখেন:

"আমরা জাতীয় পার্টি আমাদের জন্য এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আসন্ন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এরশাদ মুক্তিকে একটি মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ নির্বাচন হবে এরশাদ মুক্তির প্রশ্নে এক অঘোষিত গণভোট," (পৃঃ-৩)।

জাতীয়পার্টি অবশ্য সাহাবুদ্দীন সরকার ও বিএনপি সরকার উভয়ের তীব্র সমালোচনা করেছে। আক্ষেপ করে নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে লেখা হয়েছে যে বিএনপি অন্য দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তথা আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠী এবং স্বাধীনতা বিরোধী জামাতে ইসলামীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিলেও এরশাদ ও তার দলকে কোনো ছাড় দেয়নি। কিন্তু আদর্শগত বিচারে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি অনেক বেশি পরস্পরের কাছাকাছি। জাতীয় পার্টি ও বিএনপি উভয়ের জন্ম-প্রক্রিয়া মোটামুটি একই রকম অর্থাৎ প্রথমে সেনা শাসন এবং ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গণতান্ত্রিক দল গঠন ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি। এছাড়া উভয় দলই ইসলাম ধর্মকে রাজনীতিতে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে থাকে এবং প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার রীতিকে সমর্থন করে না। উভয় দলই "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে" "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের" তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করে। উভয় দলই "মুক্ত বাজার অর্থনীতির" দৃঢ় একনিষ্ঠ সমর্থক। অবশ্য নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে উপরোক্ত

www.pathagar.com

মিলগুলো প্রতিফলিত হলেও জাতীয়পার্টির মধ্যে সর্বদাই দুটি পরস্পর বিরোধী সুবিধাবাদী প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। একটি আওয়ামী লীগমুখী, আরেকটি বিএনপিমুখী। হয়তো এ জন্যই তাদের ভাবাদর্শের ঘোষণায় একই সঙ্গে "ধর্মাশ্রয়ী বক্তব্য" ও ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উভয়ই স্থান পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত স্লোগানটির কথা উল্লেখ করা যায়। ইশ্‌তেহারের প্রচ্ছদেই উল্লিখিত স্লোগানটি ছিল: "মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুদৃঢ় করা ও ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা।"

বস্তুত জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের ৩১ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৬ পৃষ্ঠা বা অর্ধেক জুড়েই রয়েছে রাজনৈতিক বক্তব্য। অবশ্য এই রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এরশাদের শাসনকালের সাফল্যের বিবরণ। লক্ষণীয় যে মোট প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রদত্ত এই বিবরণে স্থান লাভ করেছে মোট ৫৭টি সাফল্যের বর্ণনা। এই সাতান্ন সাফল্যের তালিকায় "ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা" থেকে শুরু করে "এশিয় কবিতা উৎসবের আয়োজন" পর্যন্ত ইত্যাদি বহু কিছুই স্থান পেয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামী '৯৬ এর নির্বাচনে তেমন ভালো করেনি। ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা মাত্র ৮.৬১ শতাংশ ভোট পায় এবং ৩টি আসনে জয়ী হয়।

'৯৬ এর নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে তারা প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় বেশ গুছিয়ে তাদের সংগঠনের রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরে। বাকি ২৩ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহের সুবিস্তৃত বিবরণ।

প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠার রাজনৈতিক বক্তব্যটির শিরোনাম হচ্ছে "ভূমিকা" এবং শেষে রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমের স্বাক্ষর। এই ভূমিকায় গোলাম আযম বলার চেষ্টা করেছেন যে মানব রচিত বিধানে চললে জাতির কোনো মুক্তি হবে না, বরং আল্লাহ্‌র বিধান বা কুরআন ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক চললেই মুক্তি সম্ভব।

লক্ষণীয় যে এরকম মৌলবাদী কট্টর বক্তব্য উত্থাপন করার পর পরই এই বক্তব্যের একটি অপেক্ষাকৃত উদার ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন গোলাম আযম। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় যাওয়া মাত্রই "চোরের হাত কাটা", "সুদ প্রত্যাহার" বা "জিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যার" ইসলামী আইন চালু করে দেবে না। সর্ব প্রথম মানুষের মৌলিক অভাব দূর করে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে, সকল মানুষকে সচেতন ও ইসলামী মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমেই এসব ইসলামী আইন চালু করা হবে। তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে লিখেছেন, "আল্লাহ্‌ তায়ালা সুদ, মদ হারাম করাসহ সকল আইন দীর্ঘ সময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সাঃ) এভাবেই তা বাস্তবায়ন করতে বলেছেন" (পৃ:-৫)।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

বেতার-টিভির সংক্ষিপ্ত ভাষণে সিপিবি সভাপতি যে রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেন তা নিম্নরূপ:

ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান একটি গণমুখী বিধান।

খ) প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থায় ক্ষমতার অদল-বদল হলেও মূলত ধনিক শ্রেণীই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

www.pathagar.com

গ) কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এজেন্ট, অনুৎপাদনশীল মধ্যস্বত্বভোগী, আমলা-মুৎসুদ্দীদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে প্রকৃত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে হবে ও ক্ষমতায় বসাতে হবে।

ঘ) পাশাপাশি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকেও ঠেকাতে হবে।

এছাড়া সাধারণভাবে সিপিবি সভাপতি তাঁর বক্তব্যে অভিযোগ করেন যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির রাজনীতি ক্রমশ আদর্শহীন ও বাণিজ্যিক-দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিতে পরিণত হচ্ছে। 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে সিপিবি'র বক্তব্য হচ্ছে, তারা দেশে এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে না। বরং সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সৃষ্টিই তাদের মূল লক্ষ্য। আর বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েত মডেল বা অন্য কোনো দেশের মডেল অন্ধভাবে অনুসরণ না করে যুগোপযোগী ও দেশোপযোগী মডেল নির্মাণে তারা বিশ্বাসী। এই নবায়িত সমাজতন্ত্রের মডেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে: এটা কেন্দ্রীভূত-আমলাতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় হুকুমে পরিচালিত হবে না। এটা হবে 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ'। যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হবে সকলের স্বাধীনতা এবং সকলের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হবে প্রত্যেকের স্বাধীনতা।

প্রতিশ্রুতিসমূহ: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে '৯৬ এর নির্বাচনে সবচেয়ে স্বল্পভাষী ছিল আওয়ামী লীগ। তারা মাত্র দশ পৃষ্ঠার মধ্যে ২১টি ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপর সংক্ষেপে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ব্যাখ্যা করেছে। এই ২১ দফাই তাদের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান হাতিয়ার। সেই তুলনায় বিএনপি প্রায় ১২পৃষ্ঠা জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাইপে মোট ২০টি ক্ষেত্রে ১৩৩ টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

জাতীয় পার্টিও ২০টি ক্ষেত্রে ১৪৪টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এ জন্য তারা ৩১ পৃষ্ঠার ইশ্‌তেহারের প্রায় অর্ধেক বা ১৬ পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছে।

জামাত অবশ্য এক্ষেত্রে সকলকে হার মানিয়েছে। তারা ২৭টি ক্ষেত্রে ২৪৭টি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে। এ জন্য তাদের ২৮ পৃষ্ঠার ইশ্‌তেহারের ২৩ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে।

যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টির কোনো স্বতন্ত্র নির্বাচনী ইশ্‌তেহার নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি না সে জন্য এই অধ্যায়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কোনো বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের আলোচনা তাই উপরোক্ত চার পার্টির "নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর" মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

যেহেতু উপরোক্ত চারটি দল বিশ থেকে সাতাশটি ক্ষেত্রকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির জন্য বেছে নিয়েছে সে জন্য আমাদেরকে আলোচনার পরিসর সীমাবদ্ধ করতে হচ্ছে। যে সব ক্ষেত্রে দলগুলোর প্রতিশ্রুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান সে সব সাধারণ ও পার্থক্য নির্দেশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রকে আমরা এখানে তুলনার জন্য বেছে নিয়েছি। বাছাইকৃত এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে: সংবিধান, পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি। এই তিনটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ পালাক্রমে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

সংবিধান: আওয়ামী লীগ যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষিত আদর্শ থেকে এখনো সরে আসেনি, কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে বর্তমান প্রচলিত সংবিধান থেকে 'অষ্টম সংশোধনী' প্রত্যাহারের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়ার প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ তার '৯৬ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে প্রদান করেনি। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়েছিল। বস্তুত সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধনের কোনো রকম ইঙ্গিত বা প্রতিশ্রুতিই আওয়ামী লীগের '৯৬ সালের ইশ্‌তেহারে নেই।

পক্ষান্তরে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি বিশেষভাবে বর্তমানে সংবিধানে যে সব বিধান আছে: "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস," "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" এগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেছে যে এগুলো দৃঢ়ভাবে রক্ষা করায় তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় পার্টি আরও আগ বাড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে "কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না" এবং "এই মর্মে সংবিধান সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।"

জামায়াতে ইসলামী ঘোষণা করেছে, সংবিধানে যাবতীয় সব কিছু 'কুরআন' এবং 'সুন্নাহ্‌র' আলোকে সংশোধন করে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

পররাষ্ট্রনীতি: আওয়ামী লীগ "সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরীতা নয়" এই মূলনীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পাশাপাশি বিশেষভাবে ওআইসি ও সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে এই যে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ১৯৯৭ সালে তারা বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করবে না। তারা ইশ্‌তেহারে আরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করে পানি সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করবে।

পক্ষান্তরে বিএনপি প্রথমেই ভারতকে একটি আধিপত্যবাদি শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে কতিপয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভারতবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে। তারা গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা নেয়ার জন্য "সর্বাত্মক ব্যবস্থা" নেয়ার কথা উল্লেখ করে। লক্ষণীয় যে "দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরের" মাধ্যমে সমাধানের কথা তারা বলছে না। বিএনপি অবশ্য আওয়ামী লীগের মতোই সার্ক ও ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তারা আরও বাড়িয়ে উল্লেখ করেছে "আসিয়ান" ও "জোট নিরপেক্ষ" গ্রুপগুলোর কথা। বিএনপি "ট্রানজিট" ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে যে তারা ক্ষমতায় গেলে "সামরিক প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রকে বাংলাদেশের স্থল, জল, আকাশ ব্যবহার করতে দেবে না।" তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে বেসামরিক ট্র্যানজিট কি বিএনপি অনুমোদন করবে?

জাতীয় পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সাধারণভাবে আওয়ামী লীগের মতোই ঘোষণা করা হয়েছে যে "কারো প্রতি শত্রুতা নয়, সবার প্রতি বন্ধুত্ব," এই মূলনীতিই হবে তাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। কিন্তু ভারত সম্পর্কে তারা তাদের আপত্তিগুলোও জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষত ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি নবায়ন না করার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, " খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের মধ্যে সম্পাদিত যুক্ত ইশ্‌তেহারে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ৯ এবং ১১ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করা হবে।"

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী "মুসলিম বিশ্বের সংহতি" ও "ইসলামী আদর্শকে" তাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেছে। সকল "সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী প্রভাব বলয়" থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা।

অর্থনীতি: '৯৬ সালের ইশ্‌তেহারে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে "মুক্ত বাজার অর্থনীতির" পক্ষে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতীতের "সমাজতন্ত্র ঘেঁষা" বদনাম ঘুচানোর জন্য আওয়ামী লীগ ইশ্‌তেহারের বিভিন্ন জায়গায় আরও কতকগুলি বিশেষ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। সেগুলো হচ্ছে: "ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না," " দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হবে। "দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালনে অতীতে আওয়ামী লীগের ভুল-ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতীতের ভুল-ত্রুটি দেশবাসী ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা। জাতীয় ঐকমত্যই হবে সরকার পরিচালনায় আমাদের নীতি।" লক্ষণীয় যে সমগ্র ইশ্‌তেহারে এই বক্তব্যগুলোকে বিশেষ জোর দেয়ার জন্য পৃথক Bold টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে।

বিএনপিও আওয়ামী লীগের অনুরূপ মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলেছে। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ক্ষমতায় গেলে "মুক্ত বাজার অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "সংস্কার কর্মসূচিকে আরও ব্যপক ও গভীর করবে।" অবশ্য এর পর পরই তারা এর বিরুদ্ধে একটি সাবধানতাসূচক বাক্য যোগ করে লেখে: "একই সাথে এই নীতির (মুক্ত বাজার) আনাড়ি ও যথাযথ বিচার বিশ্লেষণহীন প্রয়োগের ফলে দেশী শিল্পের ভিত্তি ও বিকাশ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি" রাখবে। বস্তুত বিএনপি শাসনামলে অতি দ্রুতবেগে আমদানি অবাধ করার যে খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সম্ভবত সেদিকে লক্ষ রেখেই এই বাক্যটি যোগ করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টির অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি "মুক্ত বাজার অর্থনীতির" আরও বেশি অনুকূল। তারা সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ প্রবর্তিত "কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখা হবে।"

তবে কৃষি ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির সংস্কার কর্মসূচি অন্য দুই পার্টির তুলনায় এক দিক দিয়ে বেশ অগ্রসর। কৃষি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ভর্তুকি প্রদানের কথা বলেছে, বিএনপি সুলভে কৃষি উপকরণ কৃষককে পৌঁছে দেবার কথা বলেছে, কিন্তু জাতীয় পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি শুরুই হয়েছে "ভূমি সংস্কারকে প্রসারিত ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা" এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে। অবশ্য এই উচ্চারণ ও আন্তরিকতার মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে। (স্মরণ করা যেতে পারে যে ক্ষমতায় এসেই জেনারেল এরশাদ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি কৃষি সংস্কার ও ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার, বর্গা সংস্কার ও ন্যূনতম কৃষি মজুরি সংক্রান্ত কতিপয় আইন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন এরশাদ সরকার ও পরবর্তী সকল সরকারই এই আইনগুলো বাস্তবায়নের কোনো আন্তরিক উদ্যোগ নেয়নি। ফলে আইনগুলো আজ পর্যন্ত শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে)।

জামায়াতে ইসলামী বিস্তৃতভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার, কৃষি সংস্কার, ভূমি সংস্কার, শিল্পনীতি,

www.pathagar.com

বাণিজ্যনীতি, শ্রমনীতি ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিসমূহ ব্যক্ত করেছে। তবে সর্বত্রই মূল সুরটি হচ্ছে "ইসলামী অর্থনীতি" কায়েম যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে "মুক্ত বাজার অর্থনীতি", কিন্তু তাতে সুদ থাকবে না এবং জাকাতের ভিত্তিতে সাম্য কায়েম করা হবে। জামায়াতে ইসলামী পুরুষ ও নারীর সমান বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে নারীকে পুরুষের মতো অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সমান বিচরণের অধিকার দেয়নি। নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে উল্লেখ করা হয়েছে, "নারীদের শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জন ও জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে" (পৃ:-২৬)। বলা বাহুল্য যে "শরীয়তের সীমাটি" নারীদের জন্য পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিতই হবে!

উসংহার

'৯৬ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে উল্লিখিত সাধারণ রাজনৈতিক বক্তব্য এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে আমরা এখন পুনরায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও সিপিবির একটি সাধারণ মূল্যায়নের চেষ্টা করতে পারি। সাধারণত একটি দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের আদর্শ ও কর্মসূচি অনুসারে ডান থেকে বামে বিস্তৃত একটি রেখার বিভিন্ন অবস্থানে বসানো হয়ে থাকে। রাজনীতি বিজ্ঞানীরা তাই করে থাকেন।

সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের আলোচ্য পাঁচটি রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্রতী হই তাহলে আমরা হয়তো নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবো:

১।	সিপিবি	: বামপন্থি দল
২।	আওয়ামী লীগ	: উদারপন্থি দল তবে ডানপন্থি ঝোঁক সম্পন্ন
৩।	বিএনপি	: ডানপন্থি দল
৪।	জাতীয় পার্টি	: চরম ডানপন্থি
৫।	জামায়াতে ইসলামী	: রক্ষণশীল ডানপন্থি দল

উপরোক্ত বিশ্লেষণ দলগুলোর নিজেদের চোখে সত্য মনে না হলেও, তাদের বাস্তব লিখিত দলিলের দর্পণে এ ধরণের একটি চিত্রমালাই ভেসে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. SEHD, The Reporter's guide: Handbook On Election Reporting. Dhaka, 1995.

২ Begum, Dilara. Manifesting Manifestoes, in Handbook on Election Reporting. SEHD, 1995.

৩. Hakim, Muhammad A. 1993. Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnun. The University Press Limited, Dhaka.

৪. সেন, এ কে, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ষষ্ঠ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৬।

www.pathagar.com

নির্বাচনী সংবাদ সম্মেলন

সাখাওয়াত আলী খান

রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল বিভিন্ন সময় নির্বাচন সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে থাকে। সংবাদ মাধ্যমকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করার জন্য এসব সংবাদ সম্মেলন করা হলেও এসবের আর একটি উদ্দেশ্য থাকে। তারা তাদের সংগৃহীত তথ্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এবং জনগণের ব্যবহারের জন্যও সংবাদ সম্মেলন করে থাকে। যা হোক, যে কোনো বার্তা সংবাদ মাধ্যমে পৌঁছে দেয়াই সংবাদ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা এসব বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁরা সব সময় চান তাঁদের কথা, আদর্শ বা তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছাক। নির্বাচন বা গণতন্ত্র নিয়ে বছরের যে কোনো সময় সংবাদ সম্মেলন হতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচার পর্বে কোনো সংবাদ সম্মেলন হলে তা বেশি মনোযোগ দাবি করে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে সব সময় কিছু না কিছু তৈরি তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কর্মীকে যে কোনো সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হয়। একজন প্রতিবেদক যে কোনো সংবাদ সম্মেলন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি অতিসাধারণ সংবাদ কাহিনী লিখে ফেলতে পারেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় সংবাদ সম্মেলন থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যেখান থেকে পরবর্তী কালে অনুসন্ধান চালিয়ে একটি বড় ঘটনার উন্মোচন সম্ভব। ওয়াটারগেট কেলেংকারির ঘটনা উন্মোচন সম্ভব হয়েছিল দু'জন তরুণ সাংবাদিকের ক্লান্তিহীন অনুসন্ধানের ফলে এবং এই দুজন সাংবাদিক তাঁদের জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। একটি সাধারণ সিঁদেল চুরির ঘটনা থেকে তারা এক অসাধারণ রাজনৈতিক কেলেংকারির ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি

গবেষণা প্রতিবেদন, পুস্তক, হ্যান্ড-আউট, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এসব প্রস্তুত করা তথ্য সাধারণত সংবাদ সম্মেলনে সব সময়ই পাওয়া যায়। সংবাদ সম্মেলনে একজন রিপোর্টার মুখোমুখি হতে পারেন কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির, প্রার্থীর, নির্বাচনী কর্মকর্তার, নির্বাচন পর্যবেক্ষকের বা অন্য কোনো পেশাজীবীর। রিপোর্টার প্রশ্ন করবার এবং নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইবার একটা সুযোগ সেখানে পেয়ে যান।

www.pathagar.com

সংবাদ সম্মেলনে বিলি করা কাগজ এবং প্রশ্ন-উত্তর থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁরা আরও ভালো রিপোর্ট তৈরি করতে চান তাদের সংবাদ সম্মেলনে আসার আগে একটু প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। নির্বাচনী প্রচারণাকালে ডাকা কোনো সংবাদ সম্মেলনে যদি কেউ আসেন তবে নিম্নলিখিত ধারণাগুলো তাঁকে সাহায্য করবে:

ক) বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস এবং নির্বাচন পদ্ধতি,

খ) নির্বাচনী আইন এবং তার ফাঁকফোকর,

গ) নির্বাচনী আঁতাতের পিছনের খবর,

ঘ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সবল ও দুর্বল দিক,

ঙ) অতীত নির্বাচনের অনিয়ম,

চ) যদি কোনো বড় রাজনৈতিক দল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে তবে ওই রাজনৈতিক দলের ইতিহাস, নেতাদের জীবনবৃত্তান্ত, নির্বাচনী ইশ্তেহার এবং ওই দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা,

ছ) যদি কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল সংবাদ সম্মেলন করে তবে তাদের প্রকাশিত রিপোর্ট, পুস্তক, অন্যান্য রেকর্ড এবং যে তথ্য তারা সরবরাহ করে তার গ্রহণযোগ্যতা,

জ) নির্বাচন কমিশন যদি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে তবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কে কোন দায়িত্বে রয়েছেন, সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, বিভিন্ন নির্বাহী ব্যক্তিত্বদের ক্ষমতা, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি। সম্ভব হলে আগেই সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার সংগে একবার যোগাযোগ করে আসতে হবে।

নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখার জন্য একজন সাংবাদিককে গবেষণা পত্র, পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্ট, পেশাদারী নির্বাচনী বই, যদি থাকে এবং নির্বাচন কমিশনের সবধরণের প্রকাশনা সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং কোনো কোনো পত্রিকার মর্গে নির্বাচনের ওপর পেপারকাটিং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। একজন সাংবাদিকের কাছে ওসব পেপারকাটিং মূল্যবান তথ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে করণীয়

সতর্কতার সাথে শোনা: সংবাদ সম্মেলন চলাকালে একজন সাংবাদিককে অত্যন্ত মনোযোগী হতে হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজকদের উপস্থাপিত বক্তব্য সতর্কতার সাথে শোনা এবং তার বিস্তারিত নোট নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের ব্যাপারেও মনোযোগী হতে হবে। এর ফলে একজন সাংবাদিক যথাযথ প্রশ্ন করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারবেন। এমনও হতে পারে অন্যের করা প্রশ্নের উত্তর থেকে সাংবাদিক তার রিপোর্টের ইন্ট্রো খুঁজে পেয়েছেন।

দরকার বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের: যথাযথ এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করা সংবাদ সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব থেকে একজন রিপোর্টার ফলো-আপ রিপোর্ট বা অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত ইঙ্গিত পেতে পারেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত যে সমস্ত কাগজপত্র বিলি করা হয় তা দ্রুত পড়ে ফেললে

www.pathagar.com

ভালো প্রশ্ন করা সহজ হয়। কোনো কোনো সময় আয়োজকরা সংবাদ সম্মেলনের আগেই লিখিত কাগজপত্র পত্রিকার অফিসে পৌঁছে দেয়। যারা সংবাদ সম্মেলন কভার করতে চান তাদের ওইসব কাগজপত্র আগে আগেই পড়ে ফেলা এবং কিছু কিছু প্রশ্ন তৈরি করে রাখা ভালো। তা ছাড়া সংবাদ সম্মেলন চলার সময়ে অনেক নতুন প্রশ্নের প্রেক্ষিত তৈরি হয়।

উত্যক্ত বা বিরক্ত না করা: অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে সংবাদ সম্মেলনের বক্তা বা আয়োজকদের বিরক্ত করা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাঁদেরকে তাঁদের কথা বলতে দেয়া ভালো। নিজের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি প্রদর্শন করা অযৌক্তিক। কিন্তু নানা বিষয়ে অবশ্যই ব্যাখ্যা চাওয়া যৌক্তিক। বক্তাকে সরাসরি এবং যথাযথভাবে কথা বলতে দিতে হবে। একটি ভালো প্রশ্নের কারণে আয়োজকরা বেশ খোলামেলা হতে পারেন তথ্য দেবার ব্যাপারে।

যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট না হয় বা অপরিষ্কার থাকে তবে একজন রিপোর্টার বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আবার প্রশ্ন করতে পারেন। তবে তাঁকে ক্রোধান্বিত বা উত্তেজিত হলে চলবে না। যদি কোনো বক্তা গণমাধ্যমকে আক্রমণ করে কথা বলেন তাহলেও সাংবাদিককে শান্ত থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অশিষ্ট প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তবে একজন রিপোর্টার সমগ্র সংবাদ সম্মেলনের পরিবেশ কেমন ছিল তা তাঁর রিপোর্টে তুলে ধরতে পারেন।

প্রস্তুতি ও মনোযোগ: নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদরা নানা বিষয়ে খুব বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়েন, সুতরাং একটি টেপরেকর্ডারের ব্যবহার খুব প্রয়োজনীয় হতে পারে। নিজের নেয়া নোট বা স্মৃতিশক্তি সব সময় ফলদায়ক নাও হতে পারে। সুতরাং সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

নির্বাচনের সময় সংবাদ সম্মেলন বিশেষ ধরনের এবং সতর্কতামূলক মনোযোগের দাবি রাখে। কোনো কোনো সময় উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচারণার জন্য সংবাদ সম্মেলন করা হয়, যেখান থেকে রাজনৈতিক ধারার হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ করা যেতে পারে। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজকদের কাছে থেকে কী জানতে চান সে বিষয়েও রিপোর্টারের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

কর্মরত গণমাধ্যমের নীতি বিষয়ে খেয়াল রাখা: সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিককে প্রশ্ন করার আগে তিনি যে সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যমের জন্য কাজ করছেন তার নীতি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। তবে সাংবাদিকের উচিত জনগণের আগ্রহকে অগ্রাধিকার দেয়া। সংবাদ সম্মেলন থেকে একজন সাংবাদিক জনগণের আগ্রহ আছে এমন কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোনো প্রার্থী সংবাদ সম্মেলনে তার নির্বাচনী ব্যায়ের পরিমাণ বা টাকার উৎস সম্পর্কে এড়িয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে একজন সংবাদিক বিষয়টি তদন্ত করে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারেন। কারণ এসব বিষয়ে জনগণের জানার আগ্রহ আছে।

নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনের পর বিজয়ী এবং পরাজিত উভয় দল বা প্রার্থীই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে

www.pathagar.com

পারেন। এ ধরনের সংবাদ সম্মেলন সাধারণত নির্বাচনের দিন বিকেলে বা নির্বাচনের পরদিন আয়োজিত হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন বিকেলে আওয়ামী লীগ এ ধরণের একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঢাকায় আয়োজিত ঐ সংবাদ সম্মেলনে তারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রচুর সাংবাদিকের সমাগম হয়েছিলো।

নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একজন সাংবাদিকের হাতে নির্বাচনের আংশিক বা সম্পূর্ণ ফলাফল এবং রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বা নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের তৈরি করা সকল পরিসংখ্যান থাকতে হবে।

নির্বাচনোত্তর সাংবাদ সম্মেলনে বিজয়ী প্রার্থীর বা দলের কাছে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে কীভাবে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। যদি দলীয় প্রধান উপস্থিত থাকেন তবে তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে তিনি কাদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

যদি অসফল বা পরাজিত প্রার্থী বা দলের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ সম্মেলন করা হয় তবে সেখানে অনেক আবেগের বিষয় চলে আসতে পারে। যদি একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়া দলের সংবাদ সম্মেলন হয় তবে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে রিপোর্টারকে তা কভার করতে হবে। বিরোধীদল হিসেবে কী ভূমিকা তারা পালন করবেন এ বিষয়টি দলীয় প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

খ

বিভাগ

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচন
বৃটিশ ও পাকিস্তানি আমল

সাখাওয়াত আলী খান

পেঙ্গুইনের রাজনীতি বিষয়ক অভিধানে অধ্যাপক ডেভিড রবার্টসন মন্তব্য করেছেন, "নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটকে আসন বরাদ্দ বা কে বিজয়ী হয়েছে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি (পৃ:১০০)।" এটি নির্বাচনী ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত একটি সংজ্ঞা।

সমসাময়িক বিশ্বে আমরা প্রধানত তিন ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা লক্ষ করি। এগুলো হলো: (ক) সরল বহুত্ব ব্যবস্থা (Simple Plurality System) ; (খ) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা; এবং (গ) সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক ব্যবস্থা (রবার্টসন, ১৯৮৭:১০১)।

বাংলাদেশে বৃটিশ ধাঁচের সরল বহুত্ব ব্যবস্থা কমবেশি অনুসৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন এবং গণনা শেষে ভোট পুনর্বণ্টনের কোনো বিধান নেই। এর ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়েও কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেন যদি তিনি সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে থাকেন।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় নির্বাচনে ভোটদানকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দুই অংশেরই প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়। এ ব্যবস্থায় বিরাট আকারে বহু আসন বিশিষ্ট নির্বাচনী এলাকা (Constituency) গঠন করা হয় এবং ভোটারদের মতানুযায়ী অগ্রাধিকারের অনুপাতে আসন বরাদ্দ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি বড় নির্বাচনী এলাকায় যদি ৬টি আসন থাকে তবে সব দলের মধ্যে সেগুলো ৩:২:১ অনুপাতে ভাগ করে দেয়া হয়। এভাবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দল পায় ৩টি আসন, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দল পায় ২টি আসন এবং তৃতীয় দলটি পায় ১টি আসন। সরল বহুত্ব ব্যবস্থায় যদি এই বড় নির্বাচনী এলাকাটি ৬টি আসনে বিভক্ত থাকত, তবে কেবল সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দলটি ৬টি আসনই দখল করে নিতে পারত। এ জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় নির্বাচনী এলাকা সবসময় বিরাট হয়ে থাকে। যেমন, ইসরাইলে সমগ্র দেশই একটি একক নির্বাচনী এলাকা। বড় আকারের নির্বাচনী এলাকায় আসন বণ্টনের জটিলতার কারণে এ ব্যবস্থায় কখনো কখনো ভোট পুনর্বণ্টন করার প্রয়োজন পড়ে এবং সেক্ষেত্রে ভোটারদের প্রদত্ত দ্বিতীয় অগ্রধিকার গণনায় আনা হয়।

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থায় জয়ী হতে হলে প্রার্থীকে জনগ্রাহ্য (Popular) ভোটের অধিকাংশ পেতে হয়, সরল বহুত্ব ব্যবস্থার মতো কেবল সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট নয়। যদি প্রথম গণনায় কোনো প্রার্থীই এরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পান, তখন দ্বিতীবার ভোট প্রদান বা দ্বিতীয় গণনা অনুষ্ঠিত হয়; এতে কম সফল প্রার্থীদের ভোটকে ভোটারদের প্রদত্ত দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের হারে পুনর্বন্টন করা হয়।

উল্লিখিত সবগুলো ব্যবস্থায় (এবং অন্যান্য ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবেচনায় যেগুলোর একটি অপরটি থেকে বেশ আলাদা) কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে, তা সম্ভবত প্রবর্তিত হয়েছিল একটি স্পষ্ট ও সামগ্রিক উপায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা অবিভক্ত ভারতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল এবং কিছু ছোটখাট পরিবর্তন সাপেক্ষে এটিই এখনো আমাদের দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। ষাটের দশকে সামরিক শাসক আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা তার পতনের পরই পরিত্যক্ত হয় এবং পুরনো ব্যবস্থাটিই বাংলাদেশে পুন:প্রবর্তিত হয়। সামরিক শাসনের সময়কাল বাদে এদেশের প্রায় সব নির্বাচনই সরল বহুত্ব ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়।

একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতে, এখন বাংলাদেশে আমরা যেমনটি পেয়েছি, সাধারণ নাগরিকের আকাঙ্খা থাকে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বাটলার (Butler), পেনিম্যান (Penniman) ও র‍্যানি (Ranney) এমন নির্বাচনকে 'গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন' বলে বর্ণনা করেছেন। নিচের ছটি শর্তের সবগুলো অথবা বহুলাংশে পালিত হয়েছে এমন নির্বাচনকে তারা গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন:

১। সব প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটদানের অধিকার যথেষ্টভাবে রক্ষিত হয়েছে।

২। পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে নিয়মমতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার কোনো উল্লেখযোগ্য অংশকে বা গোষ্ঠীকে দল গঠন এবং প্রার্থী প্রদানে বাধা দেয়া হয়নি।

৪। প্রধান আইন পরিষদের সবগুলো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এবং সাধারণত হয়ে থাকে।

৫। যৌক্তিক ও ন্যায়ানুগভাবে প্রচার সম্পন্ন হয়েছে। এমনটি ঘটেনি যে, আইন, সহিংসতা কিংবা উস্কানির মুখে প্রার্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা তুলে ধরতে পারেননি অথবা ভোটাররা সেসব শুনতে বা আলোচনা করতে পারেননি।

৬। অবাধে ও গোপনীয়তাসহকারে ভোট প্রদান হয়েছে; সেগুলোর গণনা ও প্রকাশ সততার সাথে হয়েছে এবং আইনত যে প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন তারা নতুন নির্বাচন ও মেয়াদ পূরণ হবার পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকেছেন।

(বাটলার, পেনিম্যান ও র‍্যানি ১৯৮১:৩, উদ্ধৃত সিং ও বোস, নয়া দিল্লী ১৯৮৪:১১)

বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোর যথার্থতা যাচাই এর জন্য উল্লিখিত মানদণ্ড সহায়ক হতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৩৭ থেকে জাতীয় নির্বাচনসমূহ

১৯৩৫ এর গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে বাংলা ও আরো কয়েকটি প্রদেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন প্রণয়নকারী পরিষদের বিধান রাখা হয়। ৬২ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষে প্রাদেশিক গভর্নর ও আইনসভা কর্তৃক মনোনীত হবেন যথাক্রমে ৫ জন ও ২৭ জন সদস্য এবং বাকিরা নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনী আসনগুলোর বণ্টন ছিল এরকম সাধারণ শহুরে: ২, গ্রামীণ: ৮, মুসলিম শহুরে: ১, মুসলিম গ্রামীণ:১৬ এবং ইউরোপীয়: ৩।

নিম্নকক্ষ অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী। মন্ত্রীসভাকে এ পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। বাংলায় এ পরিষদের সদস্য ছিল ২৫০ জন। এর আসন বণ্টন ছিল নিম্নরূপ, মুসলিম: ১১৭টি, বর্ণ হিন্দু: ৪৮টি, তফসিলী হিন্দু: ৩০টি এবং বিশেষ আসন: ৫৫টি।

হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ১২টি ছিল শহরে এবং বাকি ১১টি ছিল গ্রামে। বিশেষ আসনগুলো বণ্টন করা হয় এভাবে ইউরোপীয়: ১১, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান: ৪ (১টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত), ভারতীয় খ্রীস্টান: ২, বাণিজ্য ও শিল্প: ১৯, ভূ-স্বামী: ৫, শ্রমিক: ৮, বিশ্ববিদ্যালয়: ২ এবং মহিলা: ৪। সব মহিলা আসনই ছিল শহর এলাকায়। এর মধ্যে ২টি সংরক্ষিত ছিল মুসলিম মহিলাদের জন্য আর বাকি ২টি সাধারণ প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ভোটদানে স্বীকৃত অধিকার লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল সম্পত্তির মালিকানার। যে কেউ (পুরুষ বা মহিলা) যিনি কম পক্ষে আট আনা পৌর কর বা 'cess' (এক ধরণের কর, দ্রষ্টব্য কার্ক প্যাট্রিক ১৯৮৯ঃ২০৬) কিংবা কমপক্ষে ছয় আনা চৌকিদারী কর বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করতেন, তিনিই ভোট দেয়ার অধিকার পেতেন। সাক্ষরতা ছিল লিঙ্গনির্বিশেষে একটি বিকল্প যোগ্যতা। তাছাড়া, যেসব পুরুষ ভোট দানে অধিকারী ছিলেন তাদের স্ত্রী বা বিধবারাও অনুরূপ অধিকার পেতেন (মোমেন ১৯৭২ঃ৩২-৩৩)। ১৯৩৫ এর গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিধান বজায় ছিল। এ ব্যবস্থা বাংলার মুসলিমদের জন্যে একটি আপাত সুবিধা বলে পরিগণিত হতো। তাদের জন্যে সংরক্ষিত ১১৭টি আসন নিয়ে ৫৫টি বিশেষ আসনের মাত্র ৯টিতে জয় লাভ করলে তাঁরা নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পেতে পারতেন। তদুপরি, মহিলাদের ২টি এবং শিল্প বাণিজ্যের ১টি আসনও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বস্তুত মাত্র ৬টি অতিরিক্ত আসনে একতাবদ্ধ হতে পারলে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষমতায় যেতে পারতেন। এ কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৩৭ এর নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত, বাংলার প্রধান তিনটি দল এ নির্বাচনে অংশ নেয়। এগুলো ছিল মুসলিম অভিজাত ও ব্যবসায়ী মহলের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ, মুসলিম মধ্যবিত্তের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস।

এসব দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার থেকে দেখা যায়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিষয়ে জোর দিয়েছে। এ দু'টি দলই ১৯৩৫ এর গর্ভনমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ এটি'র প্রবল বিরোধিতা করেন (করিম, ১৯৯৪)। মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate) বজায় রাখার জন্যে জোর দাবি করে এবং মুসলিম সংহতি ও সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। নির্বাচনী ইশ্‌তেহার মতে কংগ্রেসের কর্মসূচি সমাজতন্ত্রী

www.pathagar.com

বলে মনে হয়; তবে মুসলিম লীগ ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে। অন্যদিকে, কৃষক-প্রজা পার্টি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে চরমপন্থী কর্মসূচির পক্ষে জোর দেয়। তারা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে মত দেয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ২৫০ টি আসনের জন্যে ৬৪২ জন প্রার্থী ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, ৪৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬, ৬৯৫, ৪৮৩; মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় এ সংখ্যা ছিল ৩,৪৫৮,৩৬৪। প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

মুসলিম নির্বাচনী এলাকাগুলোতে মুসলিম লীগ ৩৯টি আসনে, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৬টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩৬টি আসনে জয়লাভ করে। শহুরে নির্বাচনী এলাকার ৬টি আসনেই মুসলিম লীগ জয়ী হয়। এ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে তার (নাজিমুদ্দিনের) পটুয়াখালীস্থ জমিদারী এলাকায় পরাজিত করেন। ফজলুল হক এই নির্বাচনে ১৪,৪১৩ ভোট পান। অপরদিকে খাজা নাজিমুদ্দিন পান ৬,৩০৮ ভোট। ক্ষমতাশালী নাজিমুদ্দিনের নিজ জমিদারী এলাকায় পরাজয় বরণ এ নির্বাচনের যথার্থতাকে নির্দেশ করে।

সাধারণ নির্বাচনী এলাকাগুলোতে কংগ্রেস ৪৭টি আসনে, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৭টি আসনে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দল ৪টি আসনে জয়লাভ করে। বিশেষ আসনে, মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হয় ৬টিতে। যদিও কংগ্রেস আইন সভায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনে জয়ী হয়, তবুও দলীয় নির্দেশক্রমে দলের নেতা শরৎচন্দ্র বোস মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য গভর্ণরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এ অবস্থায় এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও অ-কংগ্রেসী হিন্দুদের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হন। তাঁর এ মন্ত্রিসভা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

১৯৪৬-এর নির্বাচন

১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অর্জন করে ১১৪টি আসন, যেখানে মুসলিম নির্বাচনী এলাকা থেকে ১৯৩৭-এ তারা পেয়েছিল ৩৯টি আসন। এবারে মুসলিম লীগ ৪টি বিশেষ আসন ও ৬টি শহুরে আসনের সবগুলোতে এবং ১১১টি গ্রামীণ আসনের ১০৪টিতে বিজয়ী হয়। কৃষক-প্রজা পার্টি (কেপিপি) ১৯৩৭-এ যেখানে ৩৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল, এবারে তারা জয়ী হয় মাত্র ৪টি আসনে। এমারত পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২টি আসন জিতে নেয়। মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় অন্য কোনো দল কোনো আসন পায়নি। সর্বমোট গৃহীত ভোটের ৮৩.৬৪ শতাংশ পায় মুসলিম লীগ, আর কেপিপি পায় মাত্র ৫.৩৯ শতাংশ। অবশ্য কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা) দু'টি আসনে জয়লাভ করেন। মুসলিম লীগ বিরোধীদের ৭৬.২১ শতাংশেরই জামানত এ নির্বাচনে বাজেয়াপ্ত হয়।

মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল পূর্ণাঙ্গ। এ দলের বহুসংখ্যক পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড গ্রামাঞ্চলেও দেখা যায়। এগুলোতে বিভিন্ন জনপ্রিয় শ্লোগানের প্রকাশ দেখা যায় যেমন: 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী উচ্ছেদ কর', কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক', 'মজুর হবে মালিক', 'পাকিস্তান কৃষক আর শ্রমিকের জন্য' ইত্যাদি। মুসলিম লীগ সমর্থিত সংবাদপত্র 'মিল্লাত' এ বলা হয়, মুসলিম লীগের দাবিমতে যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে 'সর্বহারা' মুক্তি পাবে এবং সব

www.pathagar.com

ধরণের কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাবে (হারুন-অর-রশীদ ১৯৮৭:২২২)। এ পত্রিকায় আরো দাবি করা হয়, মুসলিম লীগ সার্বিকভাবে কৃষি সংস্কার করবে, খাদ্য সংকটের সমাধান করবে, পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে, প্রধান ও বড় শিল্প কারখানাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবে, কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটাবে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এবং বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার করবে (হারুন-অর-রশীদ)।

আদমজী, ইস্পাহানী, মেমন, খোজা ও বোহরাদের কাছ থেকে মুসলিম লীগের নির্বাচনী তহবিল সংগৃহীত হয়। প্রাদেশিক মুসলিম চেম্বার্স অফ কমার্স এবং বণিক সমিতিও লীগের নির্বাচনী তহবিলে সহৃদয় সহায়তা যোগায়। এমনকি, গরীব মুসলমানেরাও 'জিন্নাহ তহবিলে' টাকা দান করে। এটি জানা গেছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় মেটানোর পরেও মিঃ জিন্নাহ্‌র নিকট ৪০ লক্ষ রূপীর উদ্বৃত্ত তহবিল জমা ছিল (হারুন-অর-রশীদ ১৯৮৭ঃ ২২৪)। নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের সময়ে সার্বিকভাবে তহবিল সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। প্রায় ২০,০০০ ছাত্র নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কলকাতা ও ঢাকার ছাত্রদেরকে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্যামফ্লেট, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি বক্তারা বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। এ নির্বাচনে জামাতুল-উলেমা-ই-ইসলামের ব্যানারে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করেন (হারুন-অর-রশীদ ১৯৮৭ঃ ২২৬)। বাঙালী মুসলিম ভোটারদের মাঝে পাকিস্তানের দাবি ছিল খুব জনপ্রিয়। 'পাকিস্তান' নামের সেই স্বপ্নের দেশ পাবার আশায় তারা মুসলিম লীগকে ভোট দেয়। নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগাররা ছিলেন বলিষ্ঠ ও অতিরিক্ত ঈর্ষাপরায়ণ। লীগের সমর্থক প্রভাবশালী 'দৈনিক আজাদ' আগ্রহের সাথে লীগ বিরোধী প্রার্থীদের সাথে দুর্ব্যবহারের সংবাদ প্রচার করে (আজাদ, মার্চ ২, ১৯৪৬)। নির্বাচনে বিজয়ের পর এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬-এর ২৩শে এপ্রিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৫৪-এর নির্বাচন

অবিভক্ত বৃটিশ ভারতে ১৯৩৫-এ প্রবর্তিত গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে পাকিস্তানে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়। এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সম্বলিত একটি ব্যবস্থা। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভিন্ন কারণে মুসলিম লীগ ভোটারদের বিশ্বাস হারায়। নির্বাচনের পর মুসলিম আসনসমূহে দলগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

দল	আসন সংখ্যা
যুক্তফ্রন্ট	২২৩
মুসলিম লীগ	১০
খিলাফত-ই-রব্বানী	১
স্বতন্ত্র	৩
মোট	২৩৭

www.pathagar.com

সংখ্যালঘিষ্ঠ আসনে দলগত অবস্থান:

দল	আসন সংখ্যা
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪
তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন	২৭
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১০
কম্যুনিস্ট পার্টি	৪
গণতন্ত্রী দল	৩
বৌদ্ধ	২
খ্রীষ্টান	১
স্বতন্ত্র	১
মোট	৭২

সূত্র: হক ১৯৬৬:৮০, ৮১

আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নিজামে ইসলাম এবং কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থিত গণতন্ত্রী দল -এই চারদলের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে 'ব্যালট বিপ্লব' সাধন করে। এর পিছনে ছিল এ কে ফজলুল হক, এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ও মৌলানা ভাসানীর ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের মধ্যে প্রধান দাবিগুলো ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদাদান, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী উচ্ছেদ, কৃষকদের মাঝে জমি বিতরণ এবং পাট শিল্পের জাতীয়করণ। মুসলিম লীগের বস্তুত কোনো নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ছিল না। এ দল থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তারা নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে, তারা দাবি করেন যে তারাই ভোট পেয়ে ক্ষমতায় যাবার অধিকারী, কেননা দেশে রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ অভ্যুদয়ের ফলে ইসলাম ও পাকিস্তান দুই-ই বিপন্ন হয়ে পড়বে। মুসলিম লীগ নেতারা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় বিলাসবহুল উড়োজাহাজ, ট্রেন ও স্টীমার ব্যবহার করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দু'টি প্রধান দৈনিক 'আজাদ' ও ইংরেজী 'মর্নিং নিউজ' সক্রিয়ভাবে তাদেরকে সমর্থন যোগায়। মুসলিম লীগ অভিযোগ করে যে, বিরোধীদল ভারতীয় অর্থ দিয়ে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে।

যুক্তফ্রন্ট এর নির্বাচনী প্রচারণার ফলে ফ্রন্ট বহু সংখ্যক ছাত্র-কর্মীর সমর্থন লাভ করে। মূখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বিরাট ব্যবধানে ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের নিকট পরাজিত হন। মুসলিম লীগের অনেক প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, যেহেতু তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় গৃহীত মোট ভোটের এক-অষ্টমাংশ অর্জনে ব্যর্থ হয়।

২২৮ টি মুসলিম আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সবগুলো মহিলা আসনেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। নির্বাচনের সময়ে বা পরে ভোট প্রক্রিয়ায় সহিংসতা বা প্রতারণার বিষয়ে কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। বাকেরগঞ্জ জেলায় ভোটার তালিকায় কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং পরে তা সংশোধন করা হয়। যারা এজন্যে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী অপরাধ বিষয়ক একটি অর্ডিন্যান্সের আওতায় ব্যবস্থাও

www.pathagar.com

নেয়া হয়। ভোটারদের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার করে নির্বাচনকালে বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা হয়। নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ও দুইজন অবসর প্রাপ্ত জেলা জজের সমন্বয়ে। কেবল পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং একটি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বাতিল করা হয়। মুসলিম নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ৩৭.৬০ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করে। পরিষদে নির্বাচিত বেশির ভাগ প্রার্থীই ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ ও রাজনীতিতে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ১৯৫৪'র ২৫শে মার্চে এ, কে, ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যদিও এটি খুব স্বল্পস্থায়ী হয়।

ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকার-সমর্থিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক বিরোধী জোট চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে ও অবাধে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্যে যুক্তফ্রন্ট অবিস্মরণীয় বিজয় অর্জন করে।

'মৌলিক গণতন্ত্র' -এর অধীনে নির্বাচন

১৯৫৮-এর অক্টোবরে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান (যিনি পরে নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন) একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬২ সালে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সামরিক শাসনের আওতায় পাকিস্তানকে শাসন করেন। তার এ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি ও পরিষদ সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে। তিনি নির্বাচনে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর পদ্ধতিও চালু করেন।

আইয়ুব যুক্তি দেন যে তিনি ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে বৃটিশ ধাঁচের যে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু ছিল তা দেশের জন্য উপযুক্ত নয়। ১৯৫৯ সালের ২৭শে অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থা গোড়াতে স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য গৃহীত হয়; কিন্তু পরে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে (যে শাসনতন্ত্র আইয়ুব খান পাকিস্তানের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন) এ ব্যবস্থা দেশের রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মণ্ডলী (Electoral College) হিসেবে সংযুক্ত হয়। স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচনী কাঠামো ছিল, তাকেই তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইউনিয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ, ভারত বিভাগের আগে ও পরে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে, যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত হতো।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে নতুন ব্যবস্থায় গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ, ছোট শহরের শহর কমিটি এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ইউনিয়ন কমিটির মতো ৮,১২৬ টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮০,০০০ সদস্য (যাদের বলা হয় মৌলিক গণতন্ত্রী) নির্বাচিত হন। প্রতিটি পরিষদ অথবা কমিটি গড়ে দশ হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের প্রতি এক হাজার জন যৌথ নির্বাচক মণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। পরিষদ বা কমিটিগুলো নিজ নিজ চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। এসব পরিষদ বা কমিটির চেয়ারম্যার ও সদস্যরা বিভিন্ন অনুপাতে উচ্চতর পর্যায়ের থানা বা তহশিল পরিষদ, জেলা পরিষদ, বিভাগীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক (উন্নয়ন উপদেষ্টা) পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন। থানা থেকে প্রাদেশিক পর্যায় পর্যন্ত সব পরিষদেই প্রধান হিসেবে অ-নির্বাচিত সরকারী কর্মকর্তারা

www.pathagar.com

দায়িত্ব পান। এইসব পরিষদ মূলত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। ইউনিয়ন থেকে বিভাগ পর্যন্ত এ পরিষদগুলোকে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার চার স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৬২-এর শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক পরিষদ পুন:প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত প্রদেশের গভর্ণরই প্রদেশের শীর্ষ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ বা শহর কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রতিটি ইউনিয়ন বা শহরকে কতকগুলো ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ভোট দেবার যোগ্যতাসম্পন্ন 'সকল ব্যক্তি'র নাম সম্বলিত একটি তালিকা থাকবে। পাকিস্তানের একজন নাগরিক যিনি একুশ বছরের বেশি বয়সী এবং কোনো একটি এলাকায় ছ'মাসের বেশি সময় ধরে বাস করছেন, তিনিই এ ব্যবস্থায় ভোট দিতে পারবেন।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত গণভোট ইতোপূর্বে নির্বাচিত ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুব খানের প্রতি তাদের পূর্ণ (৯৫%) আস্থা প্রকাশ করেন। এতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল না এবং মৌলিক গণতন্ত্রীরা কেবল 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দিয়েছিলেন। আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৫৯ সালে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা এ নির্বাচনে ভোট দেন। জাতীয় পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৬; দু'টি প্রদেশের প্রতিটি থেকে ৭৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা সদস্য নেয়া হয়। প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিটিতে ছিল ৫ জন মহিলাসহ ১৫৫ জন সদস্য। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে ১৫৫ জনের মাত্র ৪ জন নির্বাচিত হন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থেকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত ৪০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে ৪,৯৬৫ জন ছিলেন হিন্দু।

১৯৬৫-এর প্রথম দিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় এবং পাকিস্তানের দুই অংশের ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর প্রায় সকলে এ নির্বাচনে ভোট দেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধীদল এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র বোন মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্কে মনোনয়ন দেয়; কিন্তু অনুগত মৌলিক গণতন্ত্রীরা অনায়াস ব্যবধান বজায় রেখে আইয়ুব খানকে নির্বাচিত করেন। সম্মিলিত বিরোধীদল তাদের প্রার্থীর পক্ষে জনগণের মাঝে বেশ উৎসাহ ও সমর্থন সঞ্চারে সক্ষম হয়, বিশেষত: পূর্ব পাকিস্তানে; কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে তাদের প্রচারণা ভোটারদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের পর একটি সামরিক শাসনের অধীনে, যে শাসকেরা পরে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম স্বৈরাচারী ও নিষ্ঠুর শাসকদল হিসেবে পরিচিত হয়েছে, ১৯৭০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল উল্লেখযোগ্য রকমের অবাধ ও সুষ্ঠু। সেনাবাহিনী, তাদের প্রাক্তন নেতা আইয়ুব খানের অনানুষ্ঠানিক বিদায়ের পর অনেকটা সংযত আচরণ করে এবং এ নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের সাফল্যে তারা সম্ভবত আগের অবস্থানে ফিরে যায়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের যোগসাজশে সেনাবাহিনী নির্বাচনের ফলকে নাকচ করে দিতে সচেষ্ট হয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ঐতিহাসিক ছয় দফা স্থান পায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগের এ ছয় দফা দাবিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এ দল কেন্দ্রীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি জিতে নেয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০০টির মাঝে আওয়ামী লীগ জয়ী হয় ২৮৮টি আসনে (মজিদ, ১৯৯৩ঃ১০)। অন্যান্য দল পায় মাত্র ১২টি আসন।

৩০০ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু এ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি। সবচেয়ে অযৌক্তিক, ষড়যন্ত্র মূলক ও নির্দয় সামরিক আক্রমণের মুখে বাংলাদেশের জনগণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে এদেশের জনগণ যে ব্যালট বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়।

References

1. Azad (Bengali daily). March 2, 1946. Calcutta.
2. Butler, David; Penniman, Howard R. and Ranney, Austin. 1981. Democracy of the Polls: A Comparative Study of Competitive Elections. American Enterprise Institute for Public Policy Research.
3. Harun, Shamsul Huda. 1986 Bangladesh Voting Behaviour: A Psephological Study 1973. University of Dhaka.
4. Huq, M. Mahfuzul. 1966. Electoral Problems in Pakistan. Asiatic Society of Pakistan. Dacca.
5. Islam, Sirajul and Rashid, Harun-or. 1993. History of Bengal: 1704-1971. First Part, Political History (in Bengali). Asiatic Society of Bangladesh.
6. Karim, Nehal. 1994 Bangalee Muslims and the Genesis of Pakistan. The Dhaka University Studies, Vol. 51, No. 2, December 1994. Dhaka: The Registar, Unviersity of Dhaka.
7. Kirk Patrick, E.M. and others 1989. Chambers 20th Century Dictionary. Ahmedabad, Banglore, Bombay, Calcutta,Hydrabad, Lucknow, Madras, New Delhi: Allied Publishers Ltd.
8. Majid, Shirin. 1993. Sheikh Mujib Theke Khaleda Zia (From Sheikh Mujib to Khaleda Zia). Dhaka.
9. Momen, Humaira, 1972. Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937. S. Rahman. Dacca.
10. Rashid, Harun-or. 1987. The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947. Asiatic Society of Bangladesh. Dhaka.
11. Robertson, David. 1987. The Penguin Dictionary of Politics. Middlesex, England: Penguin Books Ltd.
12. Singh, V.B. and Bose , Sankar. 1984. Election in India, Data Handbook on Lok Sabha Elections 1952-80. New Delhi/Beverly Hills/London: Sage Publications.

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন

ফিলিপ গাইন

অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বায়ত্বশাসন ও গণতন্ত্র অর্জনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূর করার জন্য এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলেছে কর্তৃত্বমূলক (Authoritarian) শাসন। আজকের বাংলাদেশ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মাঝে মোট ১৩ বছর আয়ূব খান ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৫ বছর ধরে সামরিক শক্তির কঠোর প্রভাব অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে ৬ বছর ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-৮১) এবং আরও ৯ বছর ছিল জেনারেল এইচ এম এরশাদের শাসনাধীনে।

এই দীর্ঘ সময়ের কর্তৃত্বমূলক শাসন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বলা যায়, এই কর্তৃত্বমূলক শাসনের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দেশকে আরো কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।

বৃটিশদের চালু করা রাজকীয় কর্তৃত্ববাদ এদেশের সর্বনিম্ন পর্যায়ে (গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো) যে গণতান্ত্রিক কাঠামো ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে (ব্লেয়ার, চৌধুরী, গাস্তিল, রিখটার ১৯৯২:২)। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা অবস্থায় ছিল, যার ফলে তারা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। যা হোক, ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও তা এ দেশে দীর্ঘ-আকাঙ্খিত গণতন্ত্র বয়ে আনতে পারেনি। সেই থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আজকের বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীনে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই ছিল উদাসীন। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। একটি গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন হওয়ার আগেই ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক আইন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে সামরিক একনায়ক আয়ূব খান শুরু করেন এক পরোক্ষ ও ছদ্ম গণতন্ত্রের যুগ।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম উন্মুক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এই ফলাফল মেনে নেয়নি, যা আওয়ামী লীগকে চরম হতাশায়

www.pathagar.com

ফেলে দেয়। এই ফলাফলের সুবাদে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু চলে আসতো পশ্চিম থেকে পূবে। শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদী, বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এতে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এদেশে শুরু করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং স্মরণকালের বর্বরতম গণহত্যা। ভারতের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

পাকিস্তান শাসনামলের অভিজ্ঞতা এদেশের মানুষের মনে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত রেখে গেছে। এখানে এখনও পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে সবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারছে না। ফলে, "এদেশের রাজনৈতিকদল ও গোষ্ঠীগুলো বিরোধীদলের ভূমিকাই শুধু রপ্ত করতে পেরেছে। কিন্তু দেশ শাসনের দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি" (ব্লেয়ার এবং অন্যান্য, ১৯৯২)।

সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শাসনের ধারা, যা পাকিস্তানে কঠিন শিকড় গেড়ে বসেছিল, তার প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উন্নয়নের ওপর। সামরিক শাসকরা সব সময়ই নিজেদেরকে জাতির সংকটজনক অবস্থায় 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে উপস্থাপন করেছে; আর আমলারা তাদের এই প্রয়াসে সহায়তা করেছে। নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় এবং প্রতারণামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রবণতা সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনে জয়লাভের সুবাদে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭২ সালে নতুন সরকার দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক একটি সংবিধান প্রণয়ন করে যা ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উদার শাসনতন্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে এই শাসনতন্ত্রে কিছু অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন আনা হয় এবং দেশ ব্যাপক দুর্নীতি, গুপ্তহত্যা, অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, ভোট ডাকাতি, সামরিকশাসন এবং নিবর্তনমূলক আইনের মধ্যে নিপতিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই অশান্তি, অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতা জাতিকে নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়।

মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশ তিন বছর সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগ এক সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। মুজিব সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে স্বল্প সময়ের জন্য এক বেসামরিক সরকার গঠিত হয়। এর কয়েক মাস পরে '৭৫-এর নভেম্বর মাসে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং মাত্র ৪ দিনের মাথায় আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনিও ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন।

তারপর থেকে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় সামরিক বাহিনীর হাতে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেনা অধিনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সংসদীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জিয়াউর রহমান তা স্থগিত ঘোষণা করেন।

জিয়াউর রহমান দেশে একটি বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তণের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন

www.pathagar.com

করেন; ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে।

১৯৮১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। যদিও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তবুও সামরিক বাহিনী রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও ক্ষমতাধর রয়ে যায়। তবে সাত্তার রাষ্ট্র পরিচালনায় বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কিছুটা চেষ্টা করেন। এই সময় জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে আরেকটি শক্তিশালী সামরিক হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয় দেশ। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তিনি সাত্তারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সংসদ ভেঙে দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এরপর ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে এক গণভোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বৈধ করার চেষ্টা করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাচন। ১৯৮৬ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। একটি সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং এমন একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন যাতে তিনি নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবেন।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের সময় থেকে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালের শেষার্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমবর্ধমান গণসমর্থন অর্জন করে। ছাত্রদের মধ্যে স্বৈরাচারী ক্ষমতা আরোপের প্রচেষ্টা ছাত্র সমাজকে আন্দোলনের রাস্তায় নামতে বাধ্য করে (টিম, ১৯৯০)। কিন্তু যে আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদের গণবিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে তা ছিলো মূলত শান্তিপূর্ণ। জনগণের ক্ষমতাই ছিল আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। এরশাদ পতনের এই আন্দোলনে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। এদের সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনের (ফেব্রুয়ারী ১৯৯১) পূর্ব পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য এই সরকার গঠিত হয়।

কিছু সংক্ষিপ্ত সময়কাল ছাড়া এরশাদের পতনের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় সব সময় একটি সাংবিধানিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে (হাকিম, ১৯১১)। এমনকি অনেকে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন লাভের ভিত্তিতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠনকারী আওয়ামী লীগের '৭৩-পূর্ব শাসনামলের সাংবিধানিক বৈধতার ব্যাপারেও প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচনের ইতিহাস

স্বাধীনতার সময় থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশে ৭টি সংসদ নির্বাচন, ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ৩টি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের অক্টোবরে দেশের অষ্টম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার

www.pathagar.com

কথা। এই প্রেক্ষিতে দেশের গণতন্ত্র আজ এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন।

কিন্তু এটা সত্যিই দুঃখজনক যে অতীতের বেশিরভাগ নির্বাচনই ছিল কারচুপি ও প্রতারণামূলক। অনেক নির্বাচনেই নিজের পছন্দ মতো জনপ্রতিনিধি বা সরকার নির্বাচিত করার অধিকারও ছিল না জনগণের। ভোট ডাকাতি, ভোট ছিনতাই এবং মিডিয়া ক্যু (গণমাধ্যমের সাহায্যে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত বা বিকৃত করা) বাংলাদেশের নির্বাচন সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নির্বাচনগুলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়নি, বরং তা হয়েছে কোনো একটি সরকারকে বৈধতা দেয়ার জন্য কিংবা সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলোকে নিশ্চিত করার জন্য। সামরিক বা বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এ নির্বাচনগুলোকে। তবে, নির্বাচনী অনিয়মের মাত্রা সবচেয়ে কম ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচনে।

প্রথম সংসদ নির্বাচন ও মুজিব শাসনামল

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ। আওয়ামী লীগের বিরোধীরা চেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কারণেই ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাই করে নিতে হয় আওয়ামী লীগকে। এ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ১,০৯১ জন্য প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। মোট ৩,৫২,০৫,৬৪২ জন ভোটারের মধ্যে ১,৯৩,২৯,৬৮৩ জন (৫৫.৬১%) এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে মোট ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২৮২ টিতে জয়লাভ করে, সেই সাথে ৭৩% 'পপুলার ভোট' অর্জন করে। তবে, অবশিষ্ট ১১টি আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় (যা নীচের সারণীতে দেখানো হয়নি)।

সারণী-১: ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের সরকারি ফলাফল

দল	প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	(%)
আওয়ামী লীগ	২৮৯	২৮২	১,৩৭,৯৩,৭১	(৭৩.২০)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	০১	১২,২৯,১১	(০৬.৫২)
জাতীয় লীগ	০৮	০১	৬২,৩৫৪	(০০.৩৩)
স্বতন্ত্র	১২০	০৫	৯,৮৯,৮৮৪	(০৫.২৫)

সূত্র: সোবহান, ১৯৯১, এ রিপোর্ট অন ইলেকশন টু দ্য ফিফ্‌থ ন্যাশনাল পার্লামেন্ট, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৯১; বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন।

নির্বাচনে অনিয়মের প্রবণতা এদেশে শুরু হয় ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদ নির্বাচন থেকেই। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেই সময় আওয়ালী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা ছিল না। তারপরেও এ দলটি নির্বাচনে অনিয়মের আশ্রয় নেয়। জানা যায় অন্তত ১৫টি আসনে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস, পোলিং এজেন্ট অপহরণ এবং ব্যালট বাক্স ছিনতাই এর ঘটনা ঘটায় (সোবহান, ১৯৯১)।

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যে সংবিধান কার্যকরী হয়, তা ব্যাপকভাবে সংশোধিত হয়েছিল তার প্রণেতা দলটির দ্বারাই। এই সংশোধনীগুলো (মোট চারটি) সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনে। "একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক সংবিধান একনায়কতান্ত্রিক (Totalitarian) রূপ পরিগ্রহ করে" (হাকিম ১৯৯৩:৩)। ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টম্বেরে প্রবর্তিত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুযারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ হয়, যার মাধ্যমে দেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে চালু হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকখানি খর্ব করা হয় এবং সর্বময় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। মুজিব শাসনামলের এই সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। পরবর্তী সরকারগুলোর শাসনামলে সংবিধানে আরো বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয় যা দেশের সংবিধানের গণতান্ত্রিক চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে।

গণভোট ও দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৭৫ থেকে '৭৮ সালের মধ্যে বেশ্ কতকগুলো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৎকালীন সামারিক শাসক জিয়াউর রহমান সংবিধানের মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন করেন। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার', 'বাঙালী' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ এবং মুজিব আমলে প্রবর্তিত সর্বময় একদলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত দ্বিতীয় সংসদের মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলোকে বৈধতা দেয়া হয়।

সরকারি গণমাধ্যমে দাবি করা হয় ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে অনুষ্ঠিত গণভোটে শতকরা ৮৮.৫ ভাগ ভোটার অংশগ্রহণ করে। জেনারেল জিয়ার শাসনকে বৈধ করার জন্যই এ গণভোট আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সামরিক শাসন থেকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি শাসনে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করা হয় যাতে জেনারেল জিয়া অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ওসমানীকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনে ৫৪% ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৭% জিয়াউর রহমান পান বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয় লাভ করে। ২৯টি রাজনৈতিক দলের ২,১২৫ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ৩,৮৩,৬৩,৮৫৮ জন ভোটারের ৫০.২৪ শতাংশ অর্থাৎ ১,৯৬,৭৬,১২৮ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন।

www.pathagar.com

সারণী-২: ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সরকারি ফলাফল

দল	প্রার্থীসংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	(%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	২০৭	৯৭,৩৪,২৩৬	(৪১.১৬)
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	৪৭,৩৪,২৭৭	(২৪.৫০)
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	৫,৩৫,৮২৬	(০০.৩৬)
মুসলীম লীগ ও ডেমোক্রেটিক লীগ (রহিম)	২৬৬	২০	১৯,৪১,৩৯৪	(১০.০৮)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৪০	৮	৯,৩১,৮৫১	(০৪.৮৪)
ন্যাপ (মোজাফফর)	-	১	৪,৩২,৫১৪	(০২.২৪)
গণফ্রন্ট	-	২	১,১৫,৬৬২	(০০.৬০)
সাম্যবাদী দল	-	১	৭৪,৭৭১	(০০.৩৯)
জাতীয় লীগ	-	২	৬৯,৩১৯	(০০.৩৬)
ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট	-	১	৩৪,২৫৯	(০০.১৮)
জাতীয় একতা পার্টি	-	১	৪৪,৪৫৯	(০০.২৩)
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১৯,৬৩,৩৪৫	(১০.১০)

সূত্রঃ সোবহান, ১৯৯১ এবং হাকিম, ১৯৯৩

জিয়া ও এরশাদের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন

১৯৮১ সালের ৩০শে মে কতিপয় সামরিক অফিসার কর্তৃক সংঘঠিত অভ্যুত্থানের ফলে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেন। মোট ভোটারের ৫৫.৪৭ শতাংশ এ নির্বাচনে ভোট দেন এবং প্রদত্ত ভোটের ৬৫.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বিচারপতি সাত্তার দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের হত্যাজনিত শূন্যতা থেকে বিএনপি'কে রক্ষা করার প্রয়াস পান (হাকিম, ১৯৯৩:১১)। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসা এবং সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করে (সোবাহান, ১৯৯১:১৬)।

এ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে আপত্তি দাখিল করা হয় নির্বাচন কমিশনের কাছে। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করায় উক্ত আপত্তির কোনো সুরাহা হয়নি।

এরশাদ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হবে" এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনামলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংসদ বাতিল করা হয় এবং সকল প্রকার

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় (হাকিম, ১৯৯৩:১২)।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ ও কৌশলগত বেসামরিক প্রতিষ্ঠানে সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করে তিনি সমগ্র প্রশাসনকে সামরিকীকরণ করেন। তিনি এটা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেন যে দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা দরকার। দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেয়ার বিষয়ে তার পরিকল্পনা তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

১৯৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল এরশাদ সংসদ নির্বাচনের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার মুখে তিনি তা বাতিল করেন। এর আগে ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ এক গণভোটের মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাজনৈতিকভাবে বৈধকরণের চেষ্টা করেন। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৭২.১৪ ভাগ ভোট পড়ে গণভোটে।

নির্বাচন কমিশনের মতে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ ভোট পেয়ে এরশাদ দেশের সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট হন, যদিও স্থানীয় ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা মনে করেন ভোটারের সংখ্যা ১৫% থেকে ২০%-এর বেশি ছিল না। এরশাদের শাসনব্যবস্থাকে সমর্থনকারীরা এই গণভোটকে এক 'গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক' বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু বিরোধীরা বলেন, এটা 'নিরর্থক প্রচেষ্টা' ছাড়া আর কিছুই নয় (হাকিম, ১৯৯৩:২৩)। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয় 'লার্নিং টু লিভ উইথ এ লাই' এ বলা হয় এ নির্বাচনে ২% এর বেশি ভোটার ভোট দেয়নি। এ গণভোটকে তারা 'ধোঁকা' হিসেবে আখ্যায়িত করে (সোবহান, ১৯৯১)।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

একটি 'সফল গণভোটের' পর এরশাদ তার সামরিকশাসনকে আইনসিদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। তিনি 'ঘরোয়া রাজনীতি'র অনুমতি দেন এবং ১৯৮৬ সালের প্রথম দিন থেকে 'প্রকাশ্য রাজনীতি'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ফলে এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রবল বিরোধিতার মুখে এরশাদ সরকার বুঝতে পারে যে সংসদ নির্বাচন না করে উপায় নেই।

ঐ সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপিই ছিল প্রধান দু'টি বিরোধীদল। তারা অসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি করতে থাকে। এ সময় এরশাদ সরকার কিছু ছাড় দেন এবং ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন যা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ৭ই মে। এতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দলগুলো অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোট এবং পাঁচদলীয় জোট এ নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে যা সম্ভবত পরবর্তীকালে এ দেশের রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ নির্ধারণ করে দেয়।

www.pathagar.com

সারণী-৩: ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের সরকারি ফলাফল

দল	প্রার্থীসংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	১,২০,৭৯,২৫৯ (৪২.৩৪)
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	৭৪,৬২,১৫৭ (২৬.১৫)
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭৬	১০	১৩,১৪,০৫৭(০৪.৬০)
কম্যুনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ	৯	৫	২,৫৯,৭২৮ (০০.৯১)
ন্যাপ (মোজাফফর)	১০	২	৩,৬৮,৯৭৯ (১.২৯)
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	-	৫	৩,৬৮,৯৭৯ (১,২৯)
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৬	৩	১,৯১,১০৭ (০.৬৭)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	-	৪	৭,২৫,৩০৩ (২.৫৪)
জাতীয় সমাজতান্ত্রি দল (সিরাজ)	১৪	৩	২,৪৮,৭০৫ (০.৮৭)
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	-	৪	৪,১২,৭৬৫ (১.৪৫)
বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	-	৩	১,৫১,৮২৮ (০.৫৩)
অন্যান্য	-	-	৪,৯০,৩৮৯ (১.৭৩)
স্বতন্ত্র	৪৫৩	৩২	৪৬,১৯,০২৫ (১৬.১৯)

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রতিবেদনঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬ (ঢাকা: ১৯৮৮)। দ্রষ্টব্য-হাকিম, ১৯৯৩ ও সোবহান ১৯৯১।

তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক ভীতি প্রদর্শন, সংঘাত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি লক্ষ করা যায়। নির্বাচনে অন্তত ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হয় (হাকিম ১৯৯৩:২৬)। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ যে জাতীয় পার্টি গঠন করেন, এ নির্বাচনে সে দলের পেশীশক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায় এবং সেই শক্তি বলে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন এবং ভোট কেন্দ্রে দখল করা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এই সমস্ত গুণ্ডাদের বাঁধা প্রদান করা থেকে বিরত রাখা হয়। এই সময় নির্বাচনী 'জোচ্চুরী' শব্দটি তার বাস্তব অর্থ লাভ করে। এ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের 'শোচনীয় পরিণাম' এবং 'উন্মাদনামূলক হতাশার অনুশীলন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (হাকিম, ১৯৯৩:২৭)।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: তৃতীয় সংসদ নির্বাচনের সহিংসতা, সংঘাত, কারচুপি ইত্যাদি রাজনৈতিক দল এবং জনগণের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, এরশাদ সরকারের অধীনে সত্যিকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান চিন্তাই করা যায় না। এ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী বছরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে দারুণভাবে ত্বরান্বিত করে।

বৈধতা পাবার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর এরশাদ যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করেন সব প্রধান বিরোধীদল তা বয়কট করে। তারা এ নির্বাচন প্রতিরোধেও সচেষ্ট হয়। সরকার ৫৪.২৩% ভোটারের অংশগ্রহণ এবং তার মধ্যে ৮৩.৫৭% এরশাদের পক্ষে ভোট দেয় বলে দাবি করে। পর্যবেক্ষকদের মতে ১৫% ভোটারেরও কম ভোটার নির্বাচনে ভোট দেয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ নিজেকে এবং তার সরকারকে বৈধকরণের সব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। ১৯৮৭ সালে প্রধান রাজনৈতিক জোটসমূহ একত্রিত হয়ে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়। নভেম্বর মাসে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা-অনিশ্চয়তা, লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, জনসভা, র‍্যালী, বয়কট এবং সংসদ থেকে বিরোধীদলের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ সরকার দুই প্রধান নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দী করে রাখে। ১৯৮৭ সালের ২৭শে নভেম্বর এরশাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ৬ই ডিসেম্বর তৃতীয় সংসদ ভেঙে দেন। শেষ উপায় হিসেবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এ নির্বাচন বয়কট করে। যেহেতু জনগণ নির্বাচনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই চতুর্থ সংসদ নির্বাচন তাদের মধ্যে কোনো উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। এ নির্বাচনে ২১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং অখ্যাত ৮টি রাজনৈতিক দলের ৯৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মোট ভোটারের ৫৪.৯৩ শতাংশ ভোট প্রদানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকৃত পক্ষে মোট ভোটারের ১ শতাংশের কম ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে বলে মত প্রকাশ করে। এ সংসদ নির্বাচনে, জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পায়। অন্যদিকে 'সম্মিলিত বিরোধীদল' ৭৬টি অখ্যাত রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত দুর্বল ও অনুগত নির্বাচনী জোট ১৯টি আসন লাভ করে।

সারণী-৪ : ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনের সরকারি ফলাফল

দল	প্রার্থীসংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
জাতীয় পার্টি	২৯৯	২৫১	১,৭৬,৮০,১৩৩ (৬৮.৪৪)
সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৯	১৯	৩২,৬৩,৩৪০ (১২.৬৩)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	২৫	৩	৩,০৯,৬৬৬ (১,২০)
ফ্রিডম পার্টি	১১২	২	৮,৫০,২৮৪ (০.৯৪)
অন্যান্য	-	-	২,৪২,৫৭১ (০.৯৪)
স্বতন্ত্র	২১৪	২৫	৩৪,৮৭,৪৫৭ (১৩.৫০)

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রেস ইনফরমেশন বিভাগ, পঞ্চম সংসদ নির্বাচন বিষয়ে একটি পটভূমি-নিবন্ধ, হ্যাণ্ড আউট নং-৪২৯, ফেব্রুয়ারী: ২০, ১৯৯১, পৃঃ ২৫ (দ্রষ্টব্যঃ হাকিম, ১৯৯৩ঃ ৩১)।

চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে এক নজীরবিহীন ভোট কারচুপি লক্ষ করা যায়। নির্বাচনের দিনে নির্বাচন বয়কটকারী প্রধান বিরোধীদলসমূহ কর্তৃক আহুত ধর্মঘটের কারণে রাস্তাঘাট ছিল জনহীন ও যানবাহন শূন্য এবং ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল প্রায় ভোটারবিহীন। ফলে জাল ভোট এবং কাল্পনিক গণনা চতুর্থ সংসদ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে ছিল না, সেহেতু 'জাতীয় পার্টির ভাড়া করা গুণ্ডাদের ভোট ডাকাতিতে কোনোই অসুবিধা হয় নি' (হাকিম, ১৯৯৩:৩১)।

www.pathagar.com

এরশাদের অধীনে উপজেলা ও স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন

১৯৮৫ এবং ১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচন এবং ১৯৮৮ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর ব্যবহার, সংঘাত এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ ভোটারদের মনে এমন বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে যে সমস্ত অনিয়ম হয়ে থাকে, তার কয়েকটি নমুনা হলো:ঃ

- সরকারি কর্মকর্তা/মন্ত্রী কর্তৃক ত্রাণসামগ্রী প্রদান অথবা নির্বাচনের পূর্বে ভীতি প্রদর্শন,
- নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে দলীয় কর্মী দ্বারা অন্যের ভোট প্রদান,
- প্রথাসিদ্ধ নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বাতিল করে দলীয় সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান,
- নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় মাস্তান বা গুণ্ডা দ্বারা সংঘাতমূলক তৎপরতা এবং ভীতি প্রদর্শন,
- ব্যালট পেপারে বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ এবং সই না নেয়া,
- ভোটার তালিকায় যোগ্য ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত না করা,
- একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা,
- ভোট কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্তৃক বে-আইনীভাবে ব্যালটবাক্সে ভোট প্রদান,
- ভোট ক্রয়, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ব্যালট পেপার চুরি, নির্ধারিত সময়ের আগেই ব্যালট পেপারে সীল দেয়া,
- নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা,
- প্রকৃত ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন,
- ভোটকেন্দ্র দখল,
- নির্বাচনী ফলাফলে কারচুপি।

এরশাদের পতন

চতুর্থ সংসদকে 'সবচেয়ে অপ্রতিনিধিত্বশীল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'হাইকোর্টের একক সত্তা' রহিত করার চেষ্টায় এবং ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ধর্ম ঘোষণা করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল ১৯৮৮ সালের ১লা জুন সংসদে পেশ করা হয়। প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন ২৫৪ ভোটে সংসদে এই বিল পাস হয়। তবে এরশাদ সরকার সমস্ত সমালোচনা এবং এর বিপক্ষের আন্দোলন অগ্রাহ্য করলেও সুপ্রীম কোর্ট এই সংশোধনীর প্রথম দফাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ায় এবং দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে বিভেদ সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করায় অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তোলা হয়। সর্বোপরি বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলো সংসদকে অবৈধ বলে দাবি করে এবং অবৈধ সংসদের সংবিধান সংশোধনের কোনো নৈতিক অধিকার নেই বলে মত প্রকাশ করে।

১৯৯০ সালের অক্টোবরে বিরোধীদলের আন্দোলন আবার গতি পায়। এ সময়ে রাজপথে বিরোধীদলের কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক ব্যাপক বিক্ষোভের সময় ৫ জন নিহত ও শত শত ব্যক্তি আহত হয়। এ ঘটনায় ২২টি প্রধান ছাত্র সংগঠন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য (APSU) গঠন করে। এই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য 'স্বৈরশাসক এরশাদ এবং তার সরকারের কবল থেকে' দেশকে

www.pathagar.com

উদ্ধারের শপথ নেয় (হাকিম, ১৯৯৩:৩২)। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আটদলীয় জোট এবং বামপন্থী পাঁচদলীয় জোট ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের রূপরেখা ভিত্তিক একটি যৌথ ঘোষণার স্বাক্ষর করে। এই যৌথ ঘোষণার চার দফা কর্মপন্থা (Modus operandi) সংক্ষেপে নিম্নরূপ (হাকিম, ১৯৯৩):

১। বিরোধীদল এবং জোটসমূহ শুধু নির্বাচন বয়কটই করবে না, এরশাদের অধীনে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রতিহত করবে।

২। এরশাদকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩। এই নির্দলীয় সরকার নির্বাচন পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনবে এবং সমস্ত নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

৪। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত একটি 'সার্বভৌম সংসদের' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের উত্তরণের ওই যৌথ ঘোষণা একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। সর্বশেষ উপায় হিসেবে এরশাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু এগুলো কোনো কাজে লাগেনি।

১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা সকল মহল থেকে সমালোচিত ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। দেশব্যাপী সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ রাখা ছাড়াও ছাত্রদের সমর্থন এবং বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী যেমন সাংবাদিক, চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী ও অন্যান্যদের সমন্বিত সহযোগিতায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। জনগণের চাপে এরশাদের প্রতি সামরিক বাহিনীর সমর্থন দুর্বল হয়ে পড়লে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। অসামরিক উপায়ে এই স্বৈরশাসনের অবসান জনমনে বিরাট আশার সঞ্চার করে।

পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচন: গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন

একটি ব্যতিক্রমী পরিবেশে পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের স্বৈরশাসনের সময় নির্বাচন প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদকে অন্তরিন করে জাতির সামনে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। একটি নতুন নির্বাচন কমিশন তিনজন বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পালন করা হয় এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সমস্ত নির্ধারিত তারিখ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। নজিরবিহীন নির্বাচনী কারচুপির জন্য অভিযুক্ত জাতীয় পার্টিকেও এ নির্বাচনের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৫টি আসনে নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১। রাজনৈতিক দলগুলো এবং জনগণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত মহল থেকে এ নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বোত্তম সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমস্ত দল চুলচেরাভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যাতে করে পরবর্তীকালে, এরশাদ বিরোধিতার মতো, কেউ এ অপবাদ না দিতে পারে যে তার উত্তরসূরিরাও অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় এসেছে।

২। নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা এবং জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাকে নতুনভাবে দাঁড় করায়। এটিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন: নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যাপারে অধ্যাদেশ জারি, নির্বাচনী আইন সংশোধন, নির্বাচনী অপরাদের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি, কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে রেকর্ডসংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে

৫। সন্ত্রাস, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা অঙ্গে পরিণত হয়েছিল, এই নির্বাচনে তা অনেকাংশে অনুপস্থিত ছিল। শেষ মুহূর্তের প্রচারাভিযানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষণীয় সহনশীলতার পরিচয় দেয়।

৬। প্রধান দু'টি রাজনৈতিকদল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ই দু'জন মহিলার নেতৃত্বে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রক্ষণশীল সমাজে। বিএনপি'র নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়া আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা।

সূত্র: টিম এবং গাইন ১৯৯১, বাংলাদেশ; মানবাধিকার পরিস্থিতি; হাকিম, ১৯৯৩: ৪২

এসব কারণে এই নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল সন্তোষজনক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। বেশ অনেক বছর পরে ভোটাররা কোনো প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন সন্দেহাতীতভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল। আগের নির্বাচনগুলোর সাথে তুলনা করলে এটিকে এক 'অনন্য' নির্বাচন বলতে হয়। দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকদের মতে এটি ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান দেশসমূহের জন্য একটি আদর্শ নির্বাচন।

অংশগ্রহণকারী প্রার্থী: পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ৭৬টি রাজনৈতিক দলের ২,৩৫০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (টিম এবং গাইন, ১৯৯১:৮৭)।

www.pathagar.com

এ ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪২৪ জন্য নির্দলীয় প্রার্থী। মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত থাকে যাদের নির্বাচিত করবেন সংসদের ৩০০ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য। এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংসদের সবগুলো আসনে প্রার্থী দেয়। সবগুলো আসনে প্রার্থী দেবার মত রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত আওয়ামী লীগ ২৬৪টি আসনে প্রার্থী দেয় (হাকিম, ১৯৯৩)। কারণ আটদলীয় জোটের অন্যান্য শরীক দলগুলোর জন্য তারা বাকী আসনগুলো ছেড়ে দেয়। গণ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টি ২৭২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়। তাদের কয়েকজন নেতা পলাতক অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাসহ ৪৭ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানে একজন প্রার্থীর সর্বাধিক পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিয়ম রয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তার সবগুলো আসনেই তারা জয়লাভ করেন। একাধিক আসনে বিজয়ী প্রার্থীকে নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হয় তিনি কোন আসনটির প্রতিনিধিত্ব করতে চান। বাকি আসনগুলো তাকে ছেড়ে দিতে হয় এবং সেগুলো শূন্য হয়ে যাওয়ায় উপনির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করে নিতে হয়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর এক সমীক্ষায় এ নির্বাচনের প্রার্থীদের বিষয়ে একটা চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের শতকরা ৮৮ ভাগই কমপক্ষে কলেজ গ্রাজুয়েট। যে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৩০ ভাগের নিচে সে দেশে এই পরিসংখ্যান সার্বিকভাবে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে উচ্চ অবস্থান নির্দেশ করে। একই সমীক্ষা থেকে জানা যায় শতকরা ৮২ জন প্রার্থী ছোট বা বড় ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবী।

সারণী-৫: ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকৃত আসনের সংখ্যা

দল/স্বতন্ত্র প্রার্থী	আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০
জাতীয় পার্টি	২৭২
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪
জাকের পার্টি (জেডপি)	২৫১
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৬১
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামআওয়ামী লীগী লীগ (বাকশাল)	৬৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৬৮
ফ্রিডম পার্টি	৬৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০
বাংলাদেশর কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৪৯
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩
অন্যান্য দল *	৪২৯
স্বতন্ত্র	৪২৪
মোট	**২,৭৮৭**

* ৬১টি ক্ষুদ্র দল যাদের কোনোটিই ৪০ জনের বেশি প্রার্থী দেয়নি।

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন সূত্র ব্যবহার করে হাকিম কর্তৃক সংকলিত। দ্রষ্টব্য-হাকিম, ১৯৯৩:৪৭

সারণী-৬ : ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দল/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রাপ্ত আসন ও ভোটের শতকরা হার

দল/স্বতন্ত্রপ্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৪০	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮	৩০.০৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	১১.৯২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮	১২.১৩
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫	১.৮১
বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৫	১.১৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)	১	২.২৫
ওয়ার্কার্স পার্টি	১	০.১৯
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	১	০.৩৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০.৪৫
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)	১	০.৭৬
ইসলামী ঐক্য জোট	১	০.৭৯
স্বতন্ত্র প্রার্থী	০	৪.৩৯
অন্যান্য দল	৩	৪.৭৮
মোট	**৩০০**	

মোট ভোটার	৬,২২,৮৯,৫০৬
মোট বৈধ ভোট	৩,৪১,০৩,৭৭৭
বাতিলকৃত ভোট	৩,৭৪,০২৬
প্রদত্ত ভোট	৩,৪৪,৭৭,৮০৩
প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৫৫.৩৫

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন সূত্র ব্যবহার করে হাকিম কর্তৃক সংকলিত। দ্রষ্টব্য : হাকিম, ১৯৯৩:৫৪

www.pathagar.com

উপনির্বাচন: বিএনপি'র বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর উপাখ্যান

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের পর বিভিন্ন সময়ে মোট ২৩টি আসন শূন্য হয়। এই শূন্য আসনগুলোতে পরে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাররা আশা করেছিলেন এই উপনির্বাচনগুলোও ২৭ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের মতো অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১১টি নির্বাচনী এলাকায় অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে সহিংসতা ঘটে। ভোটার তালিকায় ভুল এবং অন্যান্য অনিয়মও এই উপনির্বাচনগুলোতে লক্ষ করা যায়।

সারনী-৭ : বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনসমূহ

ক্রমিক নং	নির্বাচনের তারিখ	সংসদীয় আসন	নির্বাচিত প্রার্থী	রাজনৈতিক দল
১.	সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯১	১৯ রংপুর-১	মোঃ আলহাজ্জ করিম উদ্দিন ভূসা	জাতীয় পার্টি
২.	ঐ	২০ রংপুর-২	শ্রী পরিতোষ চক্রবর্তী	জাতীয় পার্টি
৩.	ঐ	২৩ রংপুর-৫	মিজানুর রহমান চৌধুরী	জাতীয় পার্টি
৪.	ঐ	২৪ রংপুর-৬	শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন	জাতীয় পার্টি
৫.	ঐ	৪২ বগুড়া-৭	হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	বিএনপি
৬.	ঐ	১৯৮ ভোলা-২	মোশাররফ হোসেন শাহজাহান	বিএনপি
৭.	ঐ	১৮৪ ঢাকা-৫	মেজর(অব) কামরুল ইসলাম	বিএনপি
৮.	ঐ	১৮৮ ঢাকা-৯	ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার	বিএনপি
৯.	ঐ	২১৭ মাদারিপুর-১	নুর-ই-আলম চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
১০.	ঐ	২১৮ মাদারিপুর-২	শাজাহান খান	আওয়ামী লীগ
১১.	ঐ	২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	আমীর খসরু	বিএনপি
১২.	ডিসেম্বর ২১, ১৯৯১	১২৫ বাকেরগঞ্জ-৫	মুজিবুর রহমান সারোয়ার	বিএনপি
১৩.	অক্টোবর ১২, ১৯৯১	২০৭ রাজবাড়ী-১	কেরামত আলী	আওয়ামী লীগ
১৪.	অক্টোবর ১৫, ১৯৯১	১৫১ ময়মনসিংহ-৩	রওশন আরা বেগম	আওয়ামী লীগ
১৫.	ডিসেম্বর ২, ১৯৯১	১২০ ভোলা-৪	মোঃ জাফর উল্লাহ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
১৬.	মে ৩, ১৯৯৩	১৯০ ঢাকা-১১	সৈয়দ মোঃ মহসীন	বিএনপি
১৭.	মার্চ ২০,১৯৯৪	৯২ মাগুরা-২	কাজী সলিমুল হক	বিএনপি
১৮.	জুলাই ৭, ১৯৯৪	৩৯ বগুড়া-৪	জিয়াউল হক মোল্লাহ	বিএনপি
১৯.	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	৮৭ যশোর-৩	তারকুল ইসলাম	বিএনপি
২০.	জানুয়ারী ২৫, ১৯৯৫	৫৯ নাটোর -২	কাজী গোলাস মোর্শেদ	বিএনপি
২১.	ঐ	১২৬ বাকেরগঞ্জ-৬	প্রফেসর আব্দুর রশিদ খান	বিএনপি
২২.	ঐ	১৪৮ শেরপুর-৩	মোঃ মাহমুদুল হক	স্বতন্ত্র
২৩.	ঐ	১৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	শাহজাহান মিয়া	বিএনপি

মোট নির্বাচনী আসন	: ২৩
বিএনপি প্রার্থী জয়ী	: ১৩
আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী	: ০৫
জাতীয় পার্টি প্রার্থী জয়ী	: ০৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী	: ০১

www.pathagar.com

স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা লক্ষ করেন, কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় সন্ত্রাস, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে (টিম এবং গাইন, ১৯৯১)। এরশাদ শাসনামলে যে লক্ষ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন, তারা অন্যান্য নির্বাচন ও গণভোটের মতো এই উপনির্বাচনগুলোতেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হন। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনগুলোর মধ্যে মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট-কারচুপির অভিযোগ উঠে । সংবাদপত্রের পাতাতেও মাগুরা উপনির্বাচনের কারচুপির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বাচনের সময় অনেক মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রশাসন ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কাজ করে। বিরোধীদলগুলো মনে করে বিএনপি সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই তারা সংসদ নির্বাচন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানায় এবং বিএনপি সরকারকে নির্বাচনের ৯০ দিন আগে সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানায়।

কার্যত মাগুরার উপনির্বাচন থেকেই বিএনপি সরকার নির্বাচনের সময় তার নিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। বিরোধীদল পরবর্তী ছয়টি উপনির্বাচন বর্জন করে। এসব উপনির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল কম এবং সাধারণভাবে পরিবেশ ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এগুলোর একটিতে বিএনপি প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন; কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীও তাতে অংশ নেননি। উপ-নির্বাচন ছাড়াও স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচনেও ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

দীর্ঘ রাজনৈতিক সংকটের পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের "অবাধ ও সুষ্ঠু" নির্বাচনের মাধ্যমে সপ্তম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এবং ওই সংসদ তার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি সংসদ তার পূর্ণমেয়াদকাল উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়। তৎকালীন বিএনপি সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যকার বিবদমান রাজনৈতিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চের মাগুরা উপ-নির্বাচনের পর থেকে। অভিযোগ রয়েছে কারচুপির মাধ্যমে বিএনপি এই উপনির্বাচনে জয়ী হয়। মাগুরা উপনির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর মতো প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ বর্জন করে এবং প্রতিবাদ, সমাবেশ, সাধারণ ধর্মঘটসহ অন্যান্য সরকার বিরোধী কর্মকান্ড আরও জোরদার করে। এসবের মাধ্যমে তারা স্পষ্ট করে যে বিএনপির শাসনাধীনে তারা আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। তারা দাবি জানাতে থাকে পর পর তিনটি নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে হবে।

নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর আস্থা রাখা যায় না – এই বক্তব্যটি বিরোধী দলগুলো দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। কোন দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন হলে কারচুপি বন্ধ করা যাবে না। ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যবহার করবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলগুলোর এই দাবি নাকোচ করে দেন

www.pathagar.com

এবং বলেন এই দাবি সংবিধান সম্মত নয়। "একটি সমঝোতা করার জন্য কমনওয়েলথ ও আমেরিকানদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়" (ইকোনোমিস্ট ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৯৬)।

বিরোধী দলগুলো চতুর্দশ অধিবেশন থেকে চূড়ান্ত ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। বিরোধী দলের সাংসদরা একযোগে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন। একটানা ৯০ কার্যদিবসে সংসদে অনুপস্থিত থাকার কারণে ১৯৯৫ সালের ২০ জুন তারিখে তাদের আসনগুলো খালি হয়ে যায়। শূণ্য ১৪৭টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল নির্বাচন কমিশনের। বন্যার কারণে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করেনি (কমনওয়েলথ ১৯৯৭:৪)।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হওয়া অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ষষ্ঠ সংসদের স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ১২ দিন এবং এ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট আরও তীব্র হয়। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার বা মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন হতে হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করা দরকার যার জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন দরকার। সুতরাং সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রণয়নের জন্য বিরোধী সাংসদদের সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

এরকম একটি বিক্ষোভপূর্ণ পরিবেশে বিরোধীদের বর্জনের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যপী হরতাল ও সহিংসতার ভয়ে ভোটাররা ঘরের বাইরে বের হননি। সবমিলে ১০ শতাংশের মত ভোট পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়। অগ্রহণযোগ্য এই নির্বাচনে বিএনপি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ২০৫টি আসনের মধ্যে তারা ২০৩টি দখল করে এবং ৪৮টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। অতীতে নির্বাচন সংক্রান্ত যেসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছিল ওই নির্বাচনে বিএনপির কর্মীরা সেসব করে। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে অবৈধ ও সরকারকে বেআইনি বলে আখ্যায়িত করে। বিএনপি এই নির্বাচনকে "খুবই সুষ্ঠু ও অবাধ" হিসেবে চালাবার চেষ্টা করে। খালেদা জিয়ার নতুন সরকার ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করে।

বিরোধী দলগুলো সরকারের বৈধতা মেনে না নিলেও তাদের পাস করা ১৩তম সংশোধনী মেনে নেয়। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তণ করা হয়। বেশ কয়েক বছরের টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক হিসাবনিকাশের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি দৃঢ় ভিত্তি পায়। "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুটি প্রথম আলোচিত হয় ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে। প্রথমেই সকল রাজনৈতিক দলগুলো এই ধারণার প্রতি হুমড়ি খেয়ে পড়েনি। আওয়ামী লীগ ভেবেছিল তারা ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়ী হবে, তারা পরবর্তী নির্বাচনগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হোক তা চায়নি। এই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল জামাত। আওয়ামী লীগ এই ধারনাকে ১৯৯৩ সাল থেকে সমর্থন করা শুরু করে এবং বলতে থাকে বিএনপির অধীনে কোনো অবাধ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়" (এস কামাল উদ্দিন, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬)।

১৫ ফেব্রুয়ারীর সমস্যাসঙ্কুল নির্বাচনের পর বিরোধী দল দেশব্যপী সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল-

www.pathagar.com

মিটিং, রাজপথ-জলপথ ও রেলপথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন আরও চাঙ্গা করে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা কর্মসূচি অব্যহত রাখার ঘোষণা দেয়।

প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে এগার সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ৩০ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে। খালেদা জিয়ার এই পদত্যাগকে "নাগরিক অভ্যুত্থান" বলা যেতে পারে। রাজপথের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা দুজনেই পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সাদেক এবং তাঁর সহকর্মী অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা পদত্যাগ করেন। এপ্রিলের ৯ তারিখে সাবেক সরকারি আমলা আবু হেনা প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। ঘোষণা করা হয় ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে থাকেন তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসন এমনভাবে সাজাতে থাকেন যেন নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। দেশ একটি জটিল নির্বাচনের জন্য তৈরি হতে থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসনের ভার গ্রহণ করা এবং নির্বাচন কমিশনের পুনর্বিন্যাসের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে থাকে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ভোটারদের আস্থা ফিরে আসতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোও অনুধাবন করতে থাকে যে দেশের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে এবং নাগরিকদের আস্থা অর্জন করতে হলে একটি সত্যিকার নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দৃঢ় নৈতিক মনোবল এবং বাস্তববাদি পদক্ষেপের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য পুলিশ ৩৫,৫০০ দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করে এবং ৩,০০০ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে (এশিয়া উইক, জুন ১৪, ১৯৯৬)। কোনো দলের সমর্থকদের প্রতি তিনি কোনো দুর্বলতা দেখাননি। দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং দুদলের নেত্রী নির্বাচন যেভাবে এগুচ্ছিল তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

অবশেষে একটি পরিচ্ছন্ন এবং জটিল নির্বাচন যুদ্ধ তফশিল অনুযায়ী ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসার জন্য ১৯৯১ সালের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপুর্ণ ছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য এবং অপরিপক্ক গণতন্ত্রকে সংহত করার জন্য ১৯৯৬ সালের নির্বাচনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ও ঘটনা

ক) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সীমিত সময়ের ও সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে এটাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আস্থা রাখা যায় না।

খ) সংসদীয় নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা দেয় নির্বাচন কমিশনকে।

www.pathagar.com

গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীন থাকে। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তাঁর আদেশ না মানার জন্য সেনাবাহিনী প্রধান লে:জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমকে বরখাস্ত করেন। নির্বাচনের আগে সামরিক অভ্যুত্থানের একটা গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে। ঢাকার বাইরের গ্যারিসনগুলো থেকে সৈন্যরা নাসিমের ডাকে ঢাকার দিকে রওনা দেয়। কিন্তু সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকায় সেনা বিদ্রোহ দ্রুত থেমে যায়। মে মাসের ২০ তারিখে নাসিমকে বরখাস্ত করলে সংকটের সূত্রপাত হয় এবং মে'র ২২তারিখে ঢাকা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে।

ঘ) সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা এবং "আদালত কতৃক বলবৎ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ মুলতবি করা" (কমনওয়েলথ ১৯৯৭) ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা পায়।

ঙ) সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করে। আবু হেনা প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হবার পর নির্বাচন কমিশনে যেমন বিভিন্ন পদে বদলি হয় তেমনি আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভাগ, জেলা বা থানা পর্যায়ে নানা রদবদল হয়। পুলিশ প্রশাসনেও ব্যপক পরিবর্তন আনা হয়।

চ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধি তৈরি করে। আচরণ বিধি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় কী কী করতে পারবে বা কোন সব কাজ থেকে বিরত থাকবে তার একটি সীমারেখা টেনে দেয়।

ছ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন উভয়ের কাছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সমান গুরুত্ব পায়। সরকারি গণমাধ্যমে তারা সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে, তাদের খবরাখবর সমান গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।

সারনী-৮: ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন ও প্রাপ্ত ভোটের হার

দলের নাম	প্রার্থীসংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১১৬	৩৩.৬০
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.৪০
জামাত-ই-ইসলামী (বাংলাদেশ)	৩০০	৩	৮.৬১
ইসলামী ঐক্য জোট	১৬৫	১	১.০৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	১	০.২৩
স্বতন্ত্র প্রার্থী	২৮৫	১	১.০৬
অন্যান্য দল *	৮৫৫	০	১.৬৭
মোট	**২,৫৭৪**	**৩০০**	**১০০**

* নির্বাচনে অংশ নিয়ে ৭৫টি দল কোনও আসন পায়নি।

মোট রেজিস্ট্রিকৃত ভোটারের সংখ্যা	৫৬,৭১৬,৯৩৫
প্রদত্ত বৈধ ভোট	৪২,৪১৮,২৭৪
বাতিলকৃত ভোট	৪৬২,৩০২
প্রদত্ত মোট ভোট	৪২,৪৪০,৫৭৬
প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৭৪.৭০%

www.pathagar.com

ফলাফল: এইসব উদ্যোগ আয়োজনের কারণে ফলাফল হয়েছিল অবিশ্বাস্য। ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ভোটার অর্থাৎ রেজিস্ট্রিকৃত ভোটারের ৭৪.৫% তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে অবাধে এবং নির্ভয়ে। কয়েকটি জায়গার সামান্য কিছু অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে সর্বোপরি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল পর্যাপ্ত এবং ভোট গণনা ছিল যথাযথ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলো আচরণবিধি মেনে চলেছিল। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। সর্বোপরি একটি নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

এরপরও একটি বেদনার বিষয় হচ্ছে জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ হওয়ার পরও ৩০০ সদস্যের সংসদে তাদের মধ্য থেকে ১০ জনের কম নির্বাচিত হন (পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তিনজন নির্বাচিত হন যারা সকলেই বৌদ্ধ এবং পাঁচজন হিন্দু)। এর মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা প্রধান রাজনৈতিক স্রোতধারা থেকে কত বিচ্ছিন্ন তাই প্রতিফলিত হয়।

সারণী-৯: আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন

ক্রমিক নং	নির্বাচনের তারিখ	সংসদীয় আসন	নির্বাচিত প্রার্থী	রাজনৈতিক দল
১.	সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৯৬	৯৫, বাগেরহাট-১	শেখ হেলাল উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
২.	ঐ	৯৯ খুলনা-১	পঞ্চানন বিশ্বাস	স্বতন্ত্র
৩.	ঐ	১৩০ পিরোজপুর-২	তাসমিমা হোসেন	জাতীয় পার্টি
৪.	ঐ	২২০ শরিয়তপুর-১	মাস্টার মজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
৫.	ঐ	২৩১ সিলেট-৪	ইমরান আহমেদ	আওয়ামী লীগ
৬.	ঐ	২৭৬ লক্ষ্মীপুর-২	হারুনুর রশিদ	আওয়ামী লীগ
৭.	ঐ	২৭৯ চট্টগ্রাম-১	মোশাররফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
৮.	ঐ	২৯১ চট্টগ্রাম-১৩	মমতাজ বেগম	বিএনপি
৯.	ঐ	২০ রংপুর-২	মোঃ আনিছুল হক চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
১০.	ঐ	২৩ রংপুর-৫	এইচ এম আশিকুর রহমান	আওয়ামী লীগ
১১.	ঐ	২৪ রংপুর-৬	নূর মোহাম্মদ মণ্ডল	জাতীয় পার্টি
১২.	ঐ	২৭ কুড়িগ্রাম-৩	মোজাম্মেল হোসেন	জাতীয় পার্টি
১৩.	ঐ	৪১ বগুড়া-৬	মোঃ জহুরুল ইসলাম	বিএনপি
১৪.	ঐ	৪২ বগুড়া-৭	হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	বিএনপি
১৫.	ঐ	৬১ সিরাজগঞ্জ-১	ডঃ মোহাম্মদ সেলিম	আওয়ামী লীগ
১৬.	অক্টোবর ১৫, ১৯৯৬	২৩৯ হবিগঞ্জ-২	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	আওয়ামী লীগ
১৭.	ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৯৭	৩ ঠাকুরগাঁও-১	শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন	আওয়ামী লীগ
১৮.	জুন ৩০, ১৯৯৭	১৭৪ মানিকগঞ্জ-৩	আব্দুল ওহাব খান	বিএনপি
১৯.	জুলাই ২০, ১৯৯৮	১২৫ বরিশাল-৫	মোঃ মজিবুর রহমান সারোয়ার	বিএনপি
২০.	ডিসেম্বর ১০, ১৯৯৮	৬৯ পাবনা -২	এ কে খন্দকার	আওয়ামী লীগ
২১.	মে ৪, ১৯৯৯	৭৩ মেহেরপুর-১	প্রফেসর আব্দুল মান্নান	আওয়ামী লীগ
২২.	অক্টোবর ২৭, ১৯৯৯	২১২ ফরিদপুর-৪	ছালেহা বেগম	আওয়ামী লীগ
২৩.	নভেম্বর ১৫, ১৯৯৯	১৪০ টাংগাইল-৮	শওকত মোমেন শাহজাহান	আওয়ামী লীগ
২৪.	ডিসেম্বর ৮, ১৯৯৯	১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১	ডঃ আলাউদ্দীন আহমেদ	আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

২৫.	ঐ	৬৭ সিরাজগঞ্জ-৭	মোঃ চয়ন ইসলাম	স্বতন্ত্র
২৬.	ঐ	৫৬ রাজশাহী-৫	ডাঃ মোহাম্মদ আলাউদ্দীন	আওয়ামী লীগ
২৭.	এপ্রিল ২২, ২০০০	৫৬ রাজশাহী-৫	রায়হানুল হক	স্বতন্ত্র
২৮.	জুলাই ৩১, ২০০০	১২৮ ঝালকাঠি-২	আমির হোসেন আমু	আওয়ামী লীগ
২৯.	ডিসেম্বর ২০, ২০০০	১০৩ খুলনা-৫	নারায়ন চন্দ্র চন্দ	আওয়ামী লীগ
৩০.	ফেব্রুয়ারী ৫, ২০০১	৭২ পাবনা-৫	ডঃ মাজহার আলী কাদেরী	আওয়ামী লীগ
৩১.	ফেব্রুয়ারী ২৮, ২০০১	১০৫ সাতক্ষীরা-১	বিএমএ নজরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ

মোট নির্বাচনী আসন	: ৩০ (৫৬ রাজশাহী-৫ আসনে দুইবার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়)
আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী	: ১৯
বিএনপি প্রার্থী জয়ী	: ০৫
জাতীয় পার্টি প্রার্থী জয়ী	: ০৩
স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী	: ০৩

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন

References

Blair, Harry W. Ph. D; Chowdhury, Dilruba; Gastil, Raymond D. Ph. D (Team Leader); and Richter, William L. Ph. D. 1992. The Bangladesh Democracy Program (BDP) Assessment (final report). Prepared for USAID/Bangladesh and Bureau for Asia Democratic Affairs and Special Issues Branch. Sponsored by Private Enterprise Development Support Project II.

Commonwealth Observer Group. 1991. Parliamentary Elections in Bangladesh.

Gain, Philip (Editor, Manobadhikar Journal). 1991. GanoprojatantriBangladesher Shangbidhan: Sangshodhonisamuha (Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Amendments)

Hakim, Muhammad A. 1993. Bangladesh Politics: The ShahabuddinInterregnum. The Unviersity Press Limited, Dhaka.

Kamaluddin, S. Ballot Boycott: Opposition won't take part in elections. Far Eastern Economic Review, February 1, 1996.

National Democratci Institute for International Affairs. 1991.Bangladesh Parlimentary Elections. A post election report.

Subhan K.M. (Editor). 1991. A Report on Elections to the FifthNational Parliament. The Bangladesh Mukto Nirbachan Andolon.

Timm, R.W. 1991. Return to Democracy. Mimeograph.

Timm, R.W. & Gain, Philip. 1990. Upazila Election 1990 Observation.

Timm, R.W. and Gain, Philip . 1992. Bangladesh state of Human Rights, 1992. Coordination Council for Human Rights in Bangladesh (CCHRB).

www.pathagar.com

এক নজরে সপ্তম জাতীয় সংসদ

খাদিজা খানম

সপ্তম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে। এর প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই এবং এর চূড়ান্ত অধিবেশন শেষ হয় ২০০১ সালের ১৩ জুলাই। পাঁচ বছরের মেয়াদ পূরণ হবার কারণে সপ্তম সংসদের সমাপ্তি ঘটে। সপ্তম সংসদের মোট ৩৮২ কার্যদিবসে ২৩ টি অধিবেশন বসে। এই সংসদে উত্থাপিত ১৯৫ টি বিলের মধ্যে ১৮৯ টি বিল পাস হয়। তবে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিলের মধ্যে একটিও পাস হয়নি। 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ' বিল নামে একটি মাত্র বেসরকারি বিল পাস হয়।

১৯৯৬ সালের ১২জুনের নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ার ফলে সপ্তম জাতীয় সংসদকে ঘিরে মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্খা ছিল। সন্দেহ নেই, এই সংসদ ছিল ঘটনাবহুল। কিন্তু এই সংসদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুই অমীমাংসিত রয়ে যায়।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন, বিএনপি ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ৩২টি, জামায়েতে ইসলাম ৩টি, জাসদ (রব) ১টি, ইসলামী ঐক্য জোট ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১ টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি এবং জাসদকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং একে "জাতীয় ঐকমত্যের সরকার" বলে দাবি করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় বহুদলীয় গণতন্ত্রে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে কিছু নেই।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে। সপ্তম জাতীয় সংসদে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি এবং সাবেক সচিব ও মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতীয় সংসদের স্পিকার নিযুক্ত হন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মাদ এরশাদের পদত্যাগের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেন। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করে । ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সুপ্রীম কোর্টে তাঁর প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ফিরে যান। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৩

www.pathagar.com

জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হয় এবং ৯ অক্টোবর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের দশম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

সপ্তম সংসদের শেষ অধিবেশন চলাকালে ১০ জুলাই, ২০০১ তারিখে স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১২ জুলাই ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট আব্দুল হামিদকে স্পিকার এবং কুমিল্লা-৬ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক আলী আশরাফকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়। এডভোকেট আব্দুল হামিদ সপ্তম সংসদের শেষ দিনের কার্যাবলী পরিচালনা করেন।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ: পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও সপ্তম জাতীয় সংসদের মধ্যবর্তী সময়ে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের স্থায়ীত্বকাল ছিল মাত্র ১২ দিন। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে স্বল্প স্থায়ী সংসদ। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা ছিল। এ অবস্থায় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অনড় প্রধান বিরোধীদলগুলো এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে।

বিরোধীদলের দাবি উপেক্ষা করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। দেশব্যপী ধর্মঘট, বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন বর্জন ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ওই নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এই সংসদের কার্যদিবস ছিল মাত্র চারটি এবং কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করা হয়।

বিরোধীদলগুলো ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা এবং নতুন সংসদের বৈধতা অস্বীকার করলেও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাসকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরাকার আইনটি মেনে নেয়। এই আইনের বলে সকল জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিরোধী দলগুলোর কঠোর বিরোধীতার মুখে ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর একটি রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে। দ্রুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ১২ জুন, ১৯৯৬ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংখ্যাগরীষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ নতুন সংসদ গঠন করে।

সপ্তম সংসদে পাসকৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন

নিপীড়নমূলক আইন: নতুন সংসদকে ঘিরে ভোটারদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। তাদের আশা ছিল যেই ক্ষমতায় আসুক না কেনো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিপীড়নমূলক আইনগুলো বাতিল করবে। কিন্তু সপ্তম সংসদের শেষে এসে দেখা গেল বহুল আলোচিত নিপীড়নমূলক

www.pathagar.com

আইনের সবগুলো বাতিল হয়নি।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার পর ১৯৭৫ সালে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে যে আইন পাস করা হয়েছিল সপ্তম সংসদে তা বাতিল করা হয় । মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই আইন পাস করা হয়েছিল। এছাড়া আরেকটি মানবতাবিরোধী আইন অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনও এই সংসদে বাতিল করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের কোনো উদ্যোগ এই সংসদে নেয়া হয়নি যদিও এটি তাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে ছিল। এই নিপীড়নমূলক আইনটি শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নয় সাধারণ নাগরিকদের হয়রানী করার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনটি বাতিল করেনি বরং ১৯৯২ সালে তারা সন্ত্রাস দমন আইন নামে আরেকটি নিপীড়নমূলক আইন পাস করে। জনগণের ব্যাপক সমালোচনার মুখে দুবছর পর আইনটি বাতিল করা হয়। বিএনপি সরকারের মত আওয়ামী লীগ সরকারও বিরোধী দলের সংসদ বর্জন এবং ব্যপক সমালোচনা উপেক্ষা করে জননিরাপত্তার নামে নতুন এক নিপীড়নমূলক আইন পাস করে। জননিরাপত্তার প্রতি হুমকি সরূপ ৯টি অপরাধকে চিহ্নিত করে ২০০০ সালের ৩১ জানুয়ারী সংসদে জননিরাপত্তা আইন পাস হয়। জননিরাপত্তা আইনে চিহ্নিত ৯টি অপরাধের মধ্যে রয়েছে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্র ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ, গাড়ি ভাঙচুর, সম্পদের ক্ষতিসাধন,যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মুক্তিপণ দাবি বা আদায়, মিথ্যা মামলা দায়ের করা এবং এসব অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দান করা। এই আইনের আওতায় সর্বোচ্চ ১৪ বছর এবং সর্বনিম্ন ২বছরের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইনটি বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

প্রথমে এই আইনে জামিন দেওয়ার কোনো বিধান ছিল না। বিরোধীদলসমূহ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ একে মানবাধিকার বিরোধী আইন হিসেবে অভিহিত করে। পত্রপত্রিকায় এই আইনের ব্যাপক সমালোচনা ছাপা হয়। এই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০০ সালের ৫ এপ্রিল জামিন দেওয়ার বিধান রেখে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধনী) আইন পাস করে।

সপ্তম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল পাস হয়। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বঘোষিত হত্যাকারীদের বিচার করা যাচ্ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচারের পথ সুগম করার জন্যই 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (বাতিল) আইন- ৯৬' শিরোনামের এই আইনটি পাস করা হয়। আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং অনেক সাধারণ জনগণ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল আইনকে স্বাগত জানান।

সমালোচিত নতুন আইন: সপ্তম সংসদের একেবারে শেষের দিকে জুন ২০, ২০০১ তারিখে "জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা বিল, ২০০১" পাস হয়। বিলে বলা হয়েছে: জাতির পিতা অর্থ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার রূপকার এবং সংবিধানের (চতুর্থ সংশোধন) আইন

www.pathagar.com

১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) এর ৩৪ধারার (খ) দফা দ্বারা সাংবিধানিকভাবে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত। পরিবার-সদস্য অর্থ জাতির পিতার দুই কন্যা।

আইনের প্রাধান্য হিসাবে বলা হয়েছে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকবে যে, এসএসএফ অধ্যাদেশ ১৯৮৬ -এর অধীন ভিআইপি'র জন্য যেরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে সেরূপ নিরাপত্তা সরকার জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণকে আজীবন যে কোনো স্থানে প্রদান করবেন; নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার পরিবার-সদস্যগণের মতামতকে প্রধান্য দিবেন; তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উক্ত পরিবার-সদস্যগণের প্রত্যেকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এর বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাও তাঁদেরকে প্রদান করবেন।

প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়েতে ইসলামীর সংসদ-সদস্যদের অনুপস্থিতিতেই এই বিল পাস হয়। বিলের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আইন মন্ত্রীর দেয়া বিবৃতির সার-সংক্ষেপ হলো, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। সেসময় বিদেশে অবস্থানের কারণে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রাণে রক্ষা পান । সেই চক্রান্তের ধারাবাহিকতা এখনও লক্ষ করা যাচ্ছে। একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের অপচেষ্টা করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বিলটি সংসদে উপস্থাপনের পর থেকেই বিরোধী দলগুলো সংসদের বাইরে থেকে এর কঠোর সমালোচনা করে। বিলটি পাসের আগে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিএনপি'র ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার, ব্যারিস্টার আমিরুল হক ও মোঃ খালেকুজ্জামান 'নোট অব ডিসেন্ট' এ উল্লেখ করেন, "গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলিতে সংবিধানের প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৫৩ এবং ১ম তফসিল, ৩য় তফসিল ও ৪র্থ তফসিল বোঝায়। ইহার বাহিরে কিছু কথা এই বিলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সংবিধান বহির্ভূত। ইহা নির্বাচনী আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উপরন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ -এর সম্মুখীন করিবে এবং দ্বৈত শাসনের উদ্ভবের আশঙ্কা রহিয়াছে। পৃথিবীর কোনো দেশে এই ধরনের আইন প্রচলিত নাই। এই বিল আইনে পরিণত হইলে ইহা সংবিধান পরিপন্থী হইবে। বিশেষ করিয়া সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করা হইবে। কারণ ২৭ অনুচ্ছেদে আছে: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"(সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জুন, ২০০১)।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ২১ জুন, ২০০১ তারিখে জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা বিল, ২০০১ -এ সম্মতি দেন। আইনটি পাসের প্রতিবাদে ২৬ জুন বিএনপি ও তার জোটভুক্ত দলগুলো সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে।

এই বিশেষ নিরাপত্তার অংশ হিসাবে সরকারের মেয়াদ শেষেও শেখ হাসিনার বাসস্থান হিসাবে গণভবন বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে বলে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে।

সপ্তম সংসদের শেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের

www.pathagar.com

জন্য 'বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ বিল,২০০১' ও 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০০১' নামে যে দুটি পৃথক বিল পাস করা হয় তাও ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দেয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতার শেষ প্রান্তে এসে স্বায়ত্তশাসনের যে বিল দুটি পাস করেছে তা তাদের প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থি। এই দুটি নতুন আইনের বলে ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ বেতার-টেলিভিশনকে আগের মতোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল: ১৯৬৫ সাল থেকে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন নামে যে নিপীড়নমূলক আইন প্রচলিত ছিল সপ্তম সংসদে তা বাতিল করে "অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যার্পণ) আইন, ২০০১" পাস হয়। এই আইনের বলে বহু হিন্দু নাগরিক তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সংসদের ২২তম অধিবেশনে ৮এপ্রিল, ২০০১ তারিখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ বিল, ২০০১ পাস করা হয়। এই আইন অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে যে জমি বা ভবনাদি সরকারের দখলে আছে সেগুলো সম্পত্তির মূল মালিক বা তার উত্তরাধিকারী বা তার স্বার্থাধিকারীকে ফেরত দেওয়া হবে যদি তিনি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন। বিলটিতে উল্লিখিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এসব সম্পত্তি সম্পর্কিত দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ডিক্রি বাস্তবায়ন করবেন জেলা প্রশাসক।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন, ২০০১ পাস করায় আওয়ামী লীগ সরকারকে অভিনন্দন জানায়। যদিও এসব অর্পিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

বিরোধী সংসদ সদস্যদের ওয়াক আউট

সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকেই বিরোধী দলের ওয়াক আউট শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের ১৪জুলাই সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনই বিএনপি সংসদ সদস্যরা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ভঙ্গ করা এবং তাদের কথা বলতে না দিয়ে অধিকার ক্ষুন্ন করার অভিযোগে ওয়াক আউট করেন। স্পিকারের বিরুদ্ধে কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনে ৯৬'এর ১৮ জুলাই জামাত ও বিএনপি সদস্যরা পুনরায় ওয়াক আউট করেন, পরে জামাত সদস্যরা সংসদে ফিরে আসেন ।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বিল উত্থাপনের আগের দিন ১০ নভেম্বর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিএনপি দশ দফা দাবি জানিয়ে ওয়াক আউট করে। পঞ্চম সংসদে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল তাদের মতোই প্রধান বিরোধীদল বিএনপিও সপ্তম সংসদের পুরোটা সময় ধরে ওয়াক আউট ও সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিএনপি,জাতীয় পার্টির এক অংশ, জামায়াতে ইসলাম ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে গঠিত চারদলীয় ঐক্যজোট সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। তাদের ইস্যুগুলোর মধ্যে স্পিকারের কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন ও পক্ষপাতমূলক আচরণ, জোটের নেতা কর্মীদের হয়রানীমূলক গ্রেফতার, রাজনৈতিক সমাবেশ করার স্থান নির্ধারণ, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি, জননিরাপত্তা আইন, পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিএনপি সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখলে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাসিবুর রহমান স্বপন ও ডঃ আলাউদ্দিন নামে দুজন বিএনপি সংসদ সদস্য শেখ হাসিনার তথাকথিত ঐক্যমতের সরকারে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। এরপর ৮ মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে বিএনপি সদস্যরা সংসদে ফিরে যান এবং ফ্লোর ক্রসিং-এর অপরাধে স্বপন ও আলাউদ্দিনকে দল থেকে বহিষ্কার করে তাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিলের জন্য স্পীকারকে অনুরোধ জানান। স্পীকার তার রুলিং-এ বলেন, তাদের সদস্য পদ শূন্য হয়নি। এর প্রতিবাদে বিএনপি সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে এবং দীর্ঘ দিনের জন্য সংসদ বর্জন করে।

পরবর্তীতে ২০০০ সালের ২০ জুন বিরোধীদল ১৮তম সংসদ অধিবেশনে কিছুক্ষণের জন্য যোগ দেয়। তারা মূলত সংসদ সদস্য পদ রক্ষার জন্য সংসদে আসেন। সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদে বলা আছে কোনো সংসদ সদস্য ৯০ কার্য দিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। ২০জুন তারা সংসদ অধিবেশনে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর পুনরায় সংসদ ত্যাগ করেন। এরপর সপ্তম সংসদের শেষ দিন পর্যন্ত বিএনপি, জামাত,জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে গঠিত চারদলীয় ঐক্যজোট সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোটের সঙ্গে বেশিরভাগ সংসদ অধিবেশন বর্জন করলেও ২৯ মার্চ,২০০১ তারিখে জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর সদস্যরা যোগ দেন। তারা সংসদের শেষ দিন পর্যন্ত সংসদে ছিলেন।

সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩৮২টি কার্য দিবসের মধ্যে বিএনপি ২১৫ টিতে যোগ দেয়। এই ২১৫ দিনে তারা ৭৯ বার ওয়াক আউট করে। একইভাবে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ৪০০ কার্যদিবসের মধ্যে আওয়ামী লীগ যোগ দিয়েছিল ২৮২ টিতে এবং ওয়াক আউট করে মোট ৭০ বার। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৪ তম অধিবেশন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করেছিল অবশ্য এই সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশন থেকে বিএনপি ও তার জোটভুক্ত দলগুলো একনাগাড়ে সংসদ বর্জন করে। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়েই বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় সংসদের প্রায় অর্ধেক অধিবেশন বর্জন করে।

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যদিবস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন এবং ক্ষমতাসীন সাংসদদের অনুপস্থিতির ফলে প্রায়ই সংসদে কোরাম সংকট দেখা দেয়। এই সংসদের মোট কার্যদিবসের প্রায় অর্ধেক দিনই কোরাম সংকটের কারণে সংসদের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু হেনাকে ১৯৯৬ সালের ৯ এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) পদে নিয়োগ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার পাঁচ বছরের মেয়াদকাল ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শারিরীক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ২০০০ সালের ৮ মে পদত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবু হেনার পদত্যাগের পর ১৩ দিন সিইসি পদটি শূন্য ছিল। ২০০০ সালের ২২ মে সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান এমএ সাঈদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় সিইসি পদটি কখনোই শূন্য ছিল না। বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রচেষ্টার কারণেই বর্তমান সিইসি নিয়োগ বিলম্বিত হয়, যদিও এর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না।

এক নজরে জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদটি ৩০০ আসনের এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। প্রতি পাঁচ বছরে একবার ৩০০ জন সংসদ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ৩০০ জন সংসদ সদস্য এই ৩০ জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত করতেন। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন এবং বাজেট পাস করার দায়িত্বে নিয়োজিত। কমপক্ষে দুই -তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন সাপেক্ষে সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে। আইন পাস করা এবং বার্ষিক জাতীয় বাজেট পাস করার জন্য সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হলেই চলে। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদীয় দলগুলোর সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি সরকারের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য প্রধানমন্ত্রী সংসদের প্রতি দায়বদ্ধ।

জাতীয় সংসদের কার্যপরিচালনা বিধিতে প্রশ্নোত্তর, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, সিদ্ধান্ত, প্রাইভেট মেম্বরদের বিল ইত্যাদির সুযোগ আছে। আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা এবং তাদের স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এসব বিধি কার্যকর আছে। সংসদে বিতর্কের জন্য উত্থাপিত হওয়ার আগে সব অর্থবিলকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেতে হবে। সংসদে বিল পাস হওয়ার পর সেটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। পাঠানোর ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত না পাঠালে সেটি আপনা আপনিই আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদগুলোর মেয়াদ কাল, কার্যদিবস, অধিবেশন ও পাসকৃত আইনের খতিয়ান

জাতীয় সংসদ (নির্বাচনের বছর)	মেয়াদকাল	মোট অধিবেশন	মোট কার্যদিস	পাসকৃত আইনের সংখ্যা
১ম (১৯৭৩)	৩২ মাস	৮ টি	১৩৪ দিন	১৫৪ টি
২য় (১৯৭৯)	৩৬ মাস	৮ টি	২০৬ দিন	৬৫ টি
৩য় (১৯৮৬)	১৭ মাস	৪ টি	৭৫ দিন	৩৮ টি
৪র্থ (১৯৮৮)	৩১ মাস	৭ টি	১৬৮ দিন	১৪২ টি
৫ম (১৯৯১)	৫৬ মাস	২২ টি	৪০০ দিন	১৭২ টি
৬ষ্ঠ (১৯৯৬ ফেব্রুয়ারী)	১২ দিন	১ টি	৪ দিন	১ টি
৭ম (১৯৯৬ জুন)	৬০ মাস	২৩ টি	৩৮২ দিন	১৮৯ টি

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/ দৈনিক সংবাদ, জুলাই ১২, ২০০১।

www.pathagar.com

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন

সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টির কোনো সমাধান ছাড়াই সপ্তম জাতীয় সংসদ শেষ হয়। ফলে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। পরে ১৯৭৮ সালে Second Martial Law Proclamation Order -এর বলে আসন সংখ্যা ৩০ ও মেয়াদকাল ১৫ বছর করা হয় (পরবর্তীতে এই আদেশ সংবিধানে সংযোজন করে নেয়া হয়)। ১৯৯০ সালে চতুর্থ সংসদে নতুন করে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের জন্য ৩০টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত করা হয়।। সংবিধান অনুযায়ী সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে নারী আসনের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। সরকারি দল ২০০০ সালের ১৭ জুন জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়ানোর জন্য একটি বিল উত্থাপন করে। এই সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাসের জন্য সংসদের দুইতৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সেই সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়নি।

তথ্য সূত্র

ক) সরকার, অজিত ও বেগম দিলারা, এক নজরে পঞ্চম সংসদ, তথ্য পঞ্জি নির্বাচনী রিপোর্টিং, সেড, ১৯৯৬।

খ) দৈনিক সংবাদ, জুলাই ১২, ২০০১

গ) দৈনিক ইত্তেফাক, জুন ২১, ২০০১

ঘ) Dhaka Courier, July 26, 1996.

ঙ) The Report of the Commonwealth Observer Group. The Parliamentary Elections in Bangladesh, June 12, 1996. Commomnwealth Secretariat, 1997.

চ) Bangladesh Election Commission, Statistical Report: .7th JatiyoShangshad Elections, June 12, 1996. November 1998.

www.pathagar.com

জরুরি নির্বাচনী আইন এবং আইনের ফাঁক-ফোকর

ডঃ মোহিউদ্দিন ফারুক ও রিজওয়ানা হাসান

বাংলাদেশ সংবিধানের ধারাসমূহ, গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (৭২ সালের পি. ও. ১৫৫), গণ-প্রতিনিধিত্ব (মহিলাদের জন্য আসন) আদেশ, ১৯৭৩ (৭৩ সালের পি.ও. ১৭), ভোটার তালিকা আদেশ, ১৯৭২ (৭২ সালের পি. ও. ১০৪), নির্বাচন কমিশন আদেশ, ১৯৭২ (৭২ সালের পি.ও. ২৫), নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ আইন) বিধি, ১৯৯১ এবং এগুলোর পরবর্তী সংশোধনীসমূহ নির্বাচন বিষয়ক প্রতিবেদক, লেখক, পর্যবেক্ষক অথবা বর্ণনাকারীকে বিবেচনায় রাখতে হয় এবং প্রয়োজন মতো তার সাহায্য নিতে হয়। কাজেই তাঁদের জন্য এসব আইন-কানুন, সেসবের পরিধি ও দোষত্রুটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অত্যাবশক।

এই অধ্যায়ে সংবিধানের ধারাসমূহ, আইন, আদেশনামা ও অধ্যাদেশসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা ভোটারের অধিকার, নির্বাচনী আচরণবিধি নির্ধারণ, নির্বাচন কমিশনের কাঠামো, ভোটার তালিকা এবং নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশনের কাজ এবং রিটার্ণিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব, মনোনয়ন, ভোটদান ও ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা, দুর্নীতি, নির্বাচনী অপরাধ ও বিতর্ক এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তার বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাচনী এলাকায় ভোটদানের অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধান এই প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছে এবং সেটা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শাসন এ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এটা জনগণকে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয় এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের দায়ভার গ্রহণ করেন। সরকারের প্রধান দুটি অংশ, নির্বাহী ও আইন বিভাগ, জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন প্রণয়নকারীদের ওপরে। সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এই ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।" জাতীয় অথবা স্থানীয় নির্বাচনসমূহ প্রাপ্ত বয়স্কদের নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৭১(খ) ধারা অনুযায়ী "ভোটার অধিকার" বলতে কোনো নির্বাচনে একজন ব্যক্তির প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর অথবা না দাঁড়ানোর অথবা নিজেকে প্রত্যাহারের কিংবা ভোটদানের অথবা ভোটদান থেকে নিজেকে বিরত রাখার অধিকার বোঝানো হয়েছে।

সংসদীয় নির্বাচন

পঞ্চম সংসদে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ নেতাকে সরকার প্রধান ধরে জাতীয় সংসদের ওপরে ন্যস্ত করে। জাতীয় সংসদের সদস্য মোট ৩৩০ জন। এঁদের মধ্যে ৩০০ জন বাংলাদেশব্যাপী ৩০০টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে শুধু মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। বলা হয়, "সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যহতি পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে...।" এই ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন ৩০০ সদস্যের মাধ্যমে। ৩৩০ জনের প্রত্যেকেই সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছিল মূলত তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদীয় নির্বাচনের বিধান প্রণয়ন করা হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদীয় নির্বাচনের বিধান সংবিধানের ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ এবং ৫৮ঙ (২ক পরিচ্ছেদ) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত আছে। সংবিধানের ৫৮খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদ ভাংগিয়া দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।"

সংবিধানের ৫৮ঘ অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।"

www.pathagar.com

সংসদ সদস্য (এমপি)

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক পঁচিশ বছর বয়স অতিক্রম করলেই সংসদ সদস্য হবার উপযুক্ত (অনুচ্ছেদ ৬৬)। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি যথাযোগ্য আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বা দেউলিয়া ঘোষিত হয়, কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা অথবা স্বীকার করে, কোনো নৈতিক অসচ্চরিত্রতার কারণে কমপক্ষে দুইবছর কারারুদ্ধ থাকে এবং মুক্ত হবার পরে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত না হয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে যদি আইন তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে, অথবা ইতিপূর্বে কোনো আইনের দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলে সে সংসদ সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২ অনুচ্ছেদেও অযোগ্যতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সংবিধান অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৫৯) নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হচ্ছে গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। শহর এলাকায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার ওপরে স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া থাকে। চারটি বড় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। অন্যান্য শহর এলাকায় নির্বাচিত পৌরসভা আছে যা ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের মাধ্যমে সূচিত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে নির্দেশিত আছে যে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও বারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে যার মধ্যে অন্তত তিনজন মহিলা সদস্য থাকবেন। একইভাবে ১৯৯৯ সালে সিটি কর্পোরেশন আইনও সংশোধন করা হয়েছে। এই আইনে মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড কমিশনার পদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রেখে সরাসরি নির্বাচনের উল্লেখ আছে।

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে এবং তার সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।"

সেই অনুযায়ী ১৯৭২ সালের পি.ও. নম্বর ২৫-এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এবং গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশের ধারা ৫- এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কাজের বিবরণ আছে যার মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণে তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ ১১৯ যদিও নির্বাচন কমিশনের ওপরে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পন করেছে, প্রকৃতপক্ষে কমিশন স্থানীয় সরকার আইন-কানুনের আওতাধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করে।

নির্বাচনী এলাকা

ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২-তে নির্বাচনী এলাকার সংজ্ঞা দেয়া আছে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকা বলতে পল্লী এলাকায় গ্রাম এবং নগর এলাকায় মহল্লা বা সড়ক বোঝায় (ধারা ৩খ)। স্থানীয় প্রশাসনসমূহ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ (ধারা ৩গ)। সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকা বলতে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন এলাকা বোঝায় যার সীমা প্রায় সমান সংখ্যক ভোটারের ভিত্তিতে নির্দেশিত। সুতরাং সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা বলতে এমন (৩০০) এলাকা বোঝায় (ধারা ৩কক)।

ভোটার ও ভোটার তালিকা

ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-তে [ধারা ৩, দফা (কককক)] ভোটারের সংজ্ঞা দেয়া আছে, "... a person registered as voter and enrolled in the final electoral rolls prepared and published under this Ordinance."

আইনে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে পৃথক একটি আইনের সহায়তা নেয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি সর্বপ্রথম উল্লেখিত হয় বাংলাদেশ ভোটার তালিকা আদেশ, ১৯৭২ (পি.ও. নম্বর ১৯৭২-এর ১০৪)- এর মুখবন্ধে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে: "provide for preparation of electoral rolls for the purpose of election of representatives of the people to elective bodies।" ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই আদেশের অনেক সংশোধনী হয়েছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংশোধনীটি প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালের আদেশটির অনুরূপ: "provide for the preparation of electoral rolls for the purpose of election to different elective bodies and offices." ১৯৯৪ সালে করা সর্বশেষ সংশোধনীটি ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের বেশ কিছু ধারাকে প্রভাবিত করেছে। ভোটার তালিকা (সংশোধনী বিধি, ১৯৯৪-এর অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা হয়েছে যে, জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের (স্থানীয় অথবা সংসদ) উদ্দেশ্যে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকা তৈরি হবে ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবার পর। তালিকা তৈরির কাজ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত রেজিস্ট্রেশন অফিসার সম্পন্ন করবেন। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য তৈরি ভোটার তালিকায় থাকবে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিটি ব্যক্তির নাম যিনি বাংলাদেশের নাগরিক, সেই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা অথবা সেই এলাকায় বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বয়স আঠারো বছরের কম নয় এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষিত নন।

নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আরো বেশ কিছু ধারা

www.pathagar.com

যুক্ত হয়েছে। ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ধারা ৯-এ বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি একাধিকবার অথবা একাধিক এলাকার জন্য ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য নন।

নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খসড়া তালিকা প্রকাশ করার পরে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া তালিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে সেটাও সংশোধন করার সুযোগ থাকে। ভূয়া ভোট অথবা একই ভোটারের একাধিক ভোট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে আনীত সর্বশেষ সংশোধনীতে ভোটার পরিচয়পত্রের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। ল্যামিনেশন করা এসব পরিচয়পত্রে ভোটারের ছবি, নাম, তার স্বাক্ষর অথবা টিপসই, ভোটার তালিকা অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও নির্বাচন কমিশনের সীলমোহর থাকবে। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য আইনসম্মতভাবে রক্ষিত জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত রেজিস্টারে রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অধিকার থাকবে এবং প্রয়োজন মতো তিনি তা থেকে তথ্য ও প্রতিলিপি গ্রহণ করতে পারবেন। ভোটার তালিকা (সংশোধনী) বিধি ১৯৯৪-এর ধারা ১৫ নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকায় যে কোনো সময়ে যে কোনো নাম সংযোজন বা বিয়োজন ও সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করেছে।

নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারীর কাছে ন্যস্ত আছে।

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন সংকলিত আছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহ স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন প্রণেতাদের প্রণীত আইন ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ১৯৭২ সালের আদেশের প্রধান কিছু বিষয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো:

ক) রিটার্ণিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ইত্যাদি (ধারা ৭,৮,৯,১২,২০)

নির্বাচনী এলাকার সীমারেখা নির্ধারণের পর এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে এলাকা পর্যায়ে নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। রিটার্ণিং অফিসার তাঁর এলাকার ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত; প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ; মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষা; প্রার্থীদের তালিকা তৈরি; প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি কাজ করেন।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটার্ণিং অফিসার নিশ্চিত করবেন যে, কোনো ভোটকেন্দ্র কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রার্থীর কর্মচারী থেকে থাকেন, তাঁকেও প্রিসাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। যদিও এরকম কিছু ঘটলে তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো বা প্রতিবিধান খোঁজার অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করেন। তিনি যথাযথভাবে নির্বাচন

www.pathagar.com

পরিচালনার স্বার্থে রিটার্ণিং অফিসারের সহায়তা চাইতে পারেন।

খ) মনোনয়ন (ধারা ১২, ১৩, ১৩ক, ১৪, ১৫ ও ১৬)

নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র জমাদান ও প্রত্যাহারের তারিখ এবং নির্বাচনের তারিখ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর রিটার্ণিং অফিসার মনোনয়নপত্র আহবান করে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় ও স্থান উল্লেখ করা থাকে। প্রার্থী নিজে, তাঁর প্রস্তাবক অথবা সমর্থনকারী রিটার্ণিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন। মনোনয়নপত্রের সাথে জামানত হিসেবে ৫,০০০ টাকার রসিদ থাকে যা প্রার্থী নিজে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে যে কেউ জমা দিতে পারেন। মোট ভোটের কমপক্ষে এক অষ্টমাংশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরাজিত প্রার্থী এই জামানতের টাকা ফেরত পান। প্রার্থী অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রিটার্ণিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাছাই করেন। রিটার্ণিং অফিসারে মনোনয়নপত্র সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার পরে প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনে আপীল করতে পারেন। নির্বাচন কমিশন তাঁর পক্ষে রায় দিলে তাঁর নাম যুক্ত করে প্রার্থী-তালিকা সংশোধন করা হয়। মনোনীত প্রার্থী প্রত্যাহারের দিন অথবা তার আগেই তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নোটিশ দিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই তা ফিরিয়ে নেয়া বা বাতিল করা যাবে না। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরদিন রিটার্ণিং অফিসার চূড়ান্ত প্রার্থী-তালিকা প্রস্তুত করেন।

১৯৮৬ সালের একটি সংশোধনী (ধারা ১৩ক, অধ্যাদেশ নম্বর ১৯৮৬-র ১৮) অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বাধিক পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী হতে পারেন। ১৯৯৬ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধারা ১২ তে সংশোধনী আনা হয়। এর ফলে কোনো কোম্পানী বা অর্থনৈতিক প্রাতষ্ঠানের পরিচালক বা কোনো ফার্মের অংশিদার যিনি ঋণখেলাপি হয়েছেন এরূপ ব্যক্তির নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

গ) ভোটদান (ধারা ২৪, ২৫, ২৭, ৩০)

ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার বন্ধ না করা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। রিটার্ণিং অফিসার ভোটদানের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কোনো কারণে অথবা বেআইনীভাবে ব্যালট বাক্স তাঁর হেফাজতের বাইরে কেউ নিয়ে যাবার কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিলে নির্বাচন কমিশনের নতুন আদেশবলে সেই কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

যাঁরা সরকারি চাকুরি উপলক্ষে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করেন, তাঁরা এবং কারাবন্দীরা ডাকযোগে ভোটদানের একটি সুযোগ পান। রিটার্ণিং অফিসার এ ধরনের সরকারি কর্মচারী অথবা কারাবন্দীর কাছে ব্যালট পেপার পাঠান। প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

ঘ. ভোটগণনা (ধারা ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৬)

প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ বন্ধ করার অব্যবহিত পরে ভোটগণনার কাজ অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী,

www.pathagar.com

নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে হতে হবে। ভোটগ্রহণের সময় প্রিসাইডিং অফিসার ভোটারদের সীল দেয়া ব্যালট পেপার রাখার ব্যালট বাক্স ছাড়াও টেণ্ডারড ভোট, আপত্তিকৃত ভোট ও নষ্ট ব্যালট পেপার রাখার জন্য আরো তিনটি আলাদা প্যাকেট রাখতে পারেন।

১। টেণ্ডারড ভোট: এই ভোট হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির দেয়া ভোট তাঁর পরিচয়ে অন্য এক ব্যক্তি ভোট দিয়ে গেছেন।

২। আপত্তিকৃত ভোট: কোনো ভোটকে তখনই আপত্তিকৃত ভোট হিসেবে ধরা হয় যখন কোনো প্রার্থীর এজেন্ট অভিযোগ আনেন যে, কথিত ভোটার এর মধ্যেই এই কেন্দ্র অথবা অন্য কোনো কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে অথবা যার নামে ভোট দেয়া হয়েছে, এই ভোটার সে নয়। তার আগে অবশ্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নির্দিষ্ট অংকের টাকা ও মুচলেকা জমা দিয়ে জানাতে হয় যে তাঁর আনীত অভিযোগ তিনি আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন।

৩। নষ্ট ব্যালট পেপার: যখন কোনো ভোটার অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেলার পর ব্যালট পেপারটি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ফেরত দেন, তখন প্রিসাইডিং অফিসার সেটা 'নষ্ট ব্যালট পেপার' নামাঙ্কিত একটি প্যাকেট রাখবেন।

প্রিসাইডিং অফিসার শুধু ব্যালট বাক্স ও "আপত্তিকৃত ভোট" নামাঙ্কিত প্যাকেট থেকে বের করা ব্যালট পেপার গণনা করবেন। প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে দেয়া ব্যালট পেপার আলাদা প্যাকেট রাখা হবে। প্যাকেটের ওপরে ভেতরের ব্যালট পেপারের সংখ্যা লেখা থাকবে। যেসব ব্যালট পেপারে ভুলভাবে সীল দেয়া হয়েছে অথবা এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, কোনো প্রার্থীই সেটাকে নিজের অনুকূলে দাবি করতে পারছেন না, সেসব ব্যালট পেপার একটি পৃথক প্যাকেটে রাখা হবে এবং সেগুলো গণনা করা হবে না।

গণনার বিস্তারিত বিবরণসহ সমস্ত প্যাকেট প্রিসাইডিং অফিসার রিটার্ণিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। রিটার্ণিং অফিসার সকল ভোটকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একত্র করে সেই নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঙ) ফলাফল ঘোষণা (ধারা ১৯, ৩৮, ৩৯, ৬৬)

কোনো ভোটগ্রহণ ছাড়াই অথবা তারও আগে কোনো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ধারা ১৯-এ বলা হয়েছে যে, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি দেখা যায় যে, মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মাত্র একজন আছেন, সেক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসার তাঁকে সেই নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন।

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচনের ফলাফল লটারির মাধ্যমেও নিষ্পন্ন হতে পারে। যেমন: যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী একই সাথে সর্বোচ্চ কিন্তু সমান সংখ্যক ভোট লাভ করেন, সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে। লটারি হলে রিটার্ণিং অফিসার একটি লট তোলেন এবং সেটাতে যাঁর নাম লেখা থাকে তিনিই জয়ী বলে বিবেচিত হন।

কোনো নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাধারণ উপায় হচ্ছে সকল ভোটকেন্দ্র থেকে ফলাফল সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ ভোটলাভকারী প্রার্থীকে রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জয়ী ঘোষণা করা।

www.pathagar.com

চ. নির্বাচনী ব্যয় (ধারা ৪৪ক ও ৪৪খ)

১৯৭২ সালের অর্ডারের ধারা ৪৪ক ও ৪৪খ অনুযায়ী: "election expenses means, any expenditure incurred or payment made, whether by way of gift, loan, advance, deposit or otherwise, for the arrangement, conduct or benefit of, or in connection with, or incidental to, the election of a candidate, including the expenditure on account of issuing circular or publications or otherwise presenting to the electors the candidate or his views, aims or object..."

২০০১ সালের সংশোধনী অনুসারে একজন প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা।

১৯৯১ ও ২০০১ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু বিধি প্রণয়ন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া আছে যে, নির্বাচনী ব্যয় বা তার কোনো অংশ নিম্নোক্ত কাজে ব্যবহার করা যাবে না:

১। বহুরঙা পোস্টার ছাপা,
২। পোস্টার বা লিফলেট ছাপার কাজে আমদানীকৃত কাগজ ব্যবহার,
৩। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত আয়তনের চেয়ে বড় পোস্টার ছাপা,
৪। ফটক, তোরণ বা খিলান নির্মাণ,
৫। ৪০০ বর্গফুটের চেয়ে বড়ো জায়গা নিয়ে শামিয়ানা টাঙানো,
৬। যে কোনো ধরনের কাপড় দিয়ে ব্যানার তৈরি,
৭। একই নির্বাচনী এলাকায় একযোগে তিনটির বেশি মাইক্রোফোন বা লাউডস্পীকার ব্যবহার বা ভাড়া,
৮। ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহ আগের যে কোনো সময় যে কোনো উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা,
৯। একটি ইউনিয়নে একটির বেশি প্রচারণা ক্যাম্প, একটি মিউনিসিপ্যালিটি বা শহরের একটি ওয়ার্ডে একটির বেশি প্রচারণা ক্যাম্প এবং একটি সংসদীয় এলাকায় একটির বেশি কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন,
১০। যে কোনো ধরনের যানবাহন যথা: ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটরসাইকেল ও স্পীডবোট সহযোগে মিছিল,
১১। যে কোনো উপায়ে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা,
১২। প্রতীক অথবা প্রার্থীর ছবিতে একের বেশি রং ব্যবহার,
১৩। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকারের চেয়ে বড় করে প্রতীক প্রদর্শন,
১৪। কালি বা রং অথবা সে ধরনের কিছু দিয়ে লিখে নির্বাচনী প্রচারণা,
১৫। ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আনা-নেয়ার জন্য গাড়ি বা যে কোনো ধরনের নৌযান ভাড়া করা।

১৯৯৬ সালে ৪৪খ ধারার একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থীকে দেশের যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি পৃথক একাউন্ট খুলতে হবে, যেখান

www.pathagar.com

থেকে তিনি কেবলমাত্র নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যায় করবেন, কোনো ব্যক্তিগত ব্যায় নয়। অর্থাৎ নির্বাচনী ব্যায় বলতে ৪৪খ ধারায় যা নির্দেশিত আছে।

ছ) নির্বাচনী অপরাধসমূহ

১৯৭২ সালের আদেশে বেশ কিছু শাস্তিযোগ্য নির্বাচনী অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যার অনেকগুলোই ১৮৬০-এর বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে বর্ণিত আছে। ভোটদাতা, প্রার্থী অথবা তাঁর প্রতিনিধি এবং পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ যে-কেউ এই অপরাধে অপরাধী হতে পারেন।

১৯৭২ সালের অর্ডারের একটি সংশোধনীএনে ৯১ক এবং ৯১খ ধারায় কয়েকটি নতুন দফা যুক্ত করা হয়। ৯১ক ধারার ৭নং দফা অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম বন্ধের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও তা অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধি তৈরি করবে এবংএই আচরণ বিধি অমান্য করাকে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসাবে গণ্যকরা হবে।

দেশের অন্যান্য আইনে কিছু বিধি এমনভাবে সংযোজিত হয়েছে যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও রীতি, অন্য কথায় "নির্বাচনী অধিকার", জনগণের নাগরিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকার ক্ষুন্ন না করে।

জ) দুর্নীতি (ধারা ৭৩)

দুর্নীতির দায়ে কোনো ব্যক্তির সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সর্বনিম্ন দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে আর্থিক জরিমানাও হতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে যেসব রীতি বা কর্ম দুর্নীতি বলে চিহ্নিত, তার মধ্যে রয়েছে:

- নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত ধারা ৪৪খ-এর বিধিসমূহ লংঘন করা;
- ঘুষ দেয়া, ভান করা এবং অসঙ্গতভাবে প্রভাব বিস্তার করা;
- কোনো প্রার্থীর নির্বাচনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের অথবা তাঁর কোনো আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে ভিত্তিহীন বিবৃতি তৈরি ও প্রকাশ করা অথবা অন্য কোনো প্রার্থীকে প্ররোচিত করা যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁর এই বিবৃতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে এবং তিনি তা বিশ্বাস করেছেন;
- ভোটকেন্দ্রে আসা-যাওয়ার জন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের পরিবহনের কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে যে কোনো ধরনের যানবাহন অথবা নৌযান ভাড়া দেয়া, ধার দেয়া, নিয়োজিত করা, ভাড়া করা, ধার করা অথবা ব্যবহার করা। প্রার্থী নিজে অথবা তাঁর বর্তমান পরিবারের সদস্য/সদস্যাগণ এর আওতায় পড়বেন না।

ঝ) অবৈধ কৌশল (ধারা ৭৪)

অবৈধ কোনো কৌশল অবলম্বনের দায়ে কোনো ব্যক্তির সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সর্বনিম্ন দুই

www.pathagar.com

বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে আর্থিক জরিমানাও হতে পারে। এর মধ্যে পড়ে:

- কোনো প্রার্থীর নির্বাচনে সাহায্য অথবা বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কোনো সরকারি কর্মচারীর সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে প্ররোচিত করা বা তাঁর সাহায্য নেয়া;
- একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেয়া অথবা সেই উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার চাওয়া;
- একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেয়া অথবা সেই উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করা।

ঞ) ঘুষ দেয়া (ধারা ৭৫)

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ও ১৯৭২ সালের আদেশ অনুযায়ী, ঘুষের দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার যে কোনো ধরনের চেষ্টাই অপরাধ। ধারা ১৭৬ এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়দন্ডেরই বিধান আছে।

ট) ভান করা (ধারা ৭৬)

কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো জীবিত অথবা মৃত অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির পরিচয়ে ভোট দিলে অথবা সেই উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার প্রার্থনা করলে সে ভান করার অপরাধে অপরাধী। আবার কেউ নিজের নামে একবার ভোট দিয়ে দ্বিতীয় বার ব্যালট পেপার চাইলে সেও ভান করার অপরাধে অপরাধী। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ১৭১খ-তে এর বিবরণ আছে। ভান করার অপরাধে অপরাধীর জন্য সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়দন্ডেরই বিধান আছে।

ঠ) অসঙ্গত প্রভাব (ধারা ৭৭)

বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ধারা ১৭১ গ-তে অসঙ্গত প্রভাবকে কোনো ব্যক্তি বা দপ্তর কর্তৃক তার নির্বাচনী ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বত:প্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপ অথবা হস্তক্ষেপের চেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি তার পদমর্যাদার প্রভাব অথবা সরকারি সমর্থন ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিকে ভোট দিতে বা ভোটদান থেকে বিরত থাকতে, অথবা প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে অথবা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে প্রলুব্ধ অথবা বাধ্য করে, তাহলে তা নির্বাচনী ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বেআইনী হস্তক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সেক্ষেত্রে অপরাধীকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

ড) ক্যানভাস সম্পর্কিত অপরাধসমূহ (ধারা ৭৯)

কোনো ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ তিন বছরের ও সর্বনিম্ন ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে যদি ভোটকেন্দ্রের চারশ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ভোট গ্রহণের দিন:

- ভোটের জন্য ক্যানভাস করে;
- ভোটদাতাকে বারে বারে অনুরোধ করে;
- কোনো ভোটদাতাকে ভোট না দিতে অথবা বিশেষ কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে প্ররোচিত করে; অথবা

www.pathagar.com

- রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া এবং প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের জন্য ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাইরে নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্যত্র যে কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি, চিহ্ন, ব্যানার অথবা পতাকা প্রদর্শন করে যা ভোটদাতাদেরকে কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করবে।

কোনো ব্যক্তি যদি নির্বাচনী এলাকার ভেতরে আটচল্লিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে, যা ভোটগ্রহণের পূর্ব দিন মধ্যরাতে শেষ হবে, কোনো জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা তাতে অংশগ্রহণ করে অথবা কোনো মিছিলে যোগদান করে, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে সর্বোচ্চ সাত বছরের ও সর্বনিম্ন এক বছরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে।

ঢ) সরকারি কর্মচারী পদমর্যাদার অপব্যবহার (ধারা ৮৬)

যদি কোনো সরকারী কর্মচারি নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তাঁর পদমর্যাদার অপব্যবহার করে, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের ও সর্বনিম্ন এক বছরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে।

ন) নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক (ধারা ৪৯, ৫১, ৬২ ও ৬৩)

১৯৭২ সালের আদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক দায়ের ও মীমাংসা করার প্রণালী নির্দেশিত আছে। কোনো প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী অথবা জয়ী হবার চেষ্টা করার লক্ষ্যে আবেদন না করা পর্যন্ত কোনো নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। আবেদনপত্র অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে, কোনো দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপ অথবা অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপ যা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ। ২০০১ সালের সংশোধনীর আগে এই আবেদনের ফয়সালা হত এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী ট্রাইবুন্যালে। জেলা ও সেশন জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জজ হিসেবে কর্মরত আছেন অথবা অতীতে ছিলেন এবং যিনি রিটার্ণিং অফিসার হিসেবে নিয়োজিত হননি এমন ব্যক্তিকে নির্বাচনী ট্রাইবুন্যালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হত। ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের দুই জজবিশিষ্ট বেঞ্চে আপীল করা যেত।

ট্রাইবুন্যাল জয়ী প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারত যদি নিশ্চিত হত যে:

- জয়ী প্রার্থীর মনোনয়ন অকার্যকর ছিল; অথবা
- মনোনয়নের দিনে জয়ী প্রার্থী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্য ছিলেন না; অথবা জয়ী প্রার্থীর নির্বাচন কোনো দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপের দ্বারা প্ররোচিত অথবা প্রভাবিত হয়েছে; অথবা
- যদি জয়ী প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি জয়ী প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের পরোক্ষ অথবা নীরব সম্মতিক্রমে কোনো দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপ সংঘটিত করেন; অথবা
- জয়ী প্রার্থী ধারা ৪৪খ (৩)-এ উল্লেখকৃত অঙ্কের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেন।

২০০১ সালের নির্বাচনী আইনে সংস্কারের পর এখন থেকে ট্রাইবুন্যালের পরিবর্তে হাইকোর্ট নির্বাচনী বিবাদ মীমাংসা করবে।

www.pathagar.com

স্থানীয় সরকার আইনের চোখে নির্বাচনী অপরাধসমূহ

স্থানীয় সরকার আইন সাধারণভাবে নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে বিবেচিত বেশ কিছু কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীর জন্য যথাক্রমে ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৭ স্থানীয় সরকার আইন। নিচের কার্যকলাপসমূহকে এই আইন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে:

- সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন ছাড়া অবৈধভাবে কোনো রাজপথ, সড়ক অথবা সর্বসাধারণের জায়গা দখল করা;
- কোনো পৌর দিক-নির্দেশনা স্তম্ভ, ল্যাম্প পোষ্ট অথবা বাতির বিঘ্ন অথবা আড়াল সৃষ্টি করা;
- সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত জায়গা ছাড়া অন্য কোনো ইমারত অথবা জায়গায় কোনো প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞপ্তি, প্ল্যাকার্ড অথবা অন্য কোনো কাগজ বা জিনিস বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে লাগানো।

মেট্রোপলিটান পুলিশ আইন অনুযায়ী নির্বাচনী অপরাধসমূহ

মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনে অপরাধমূলক কার্যকলাপের একটি তালিকা আছে যা নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের ওপরে অধিকারের মতো বেশ কিছু সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন করে। এগুলো হলো:

- কোনো সর্বসাধারণের জায়গায় অথবা তার কাছাকাছি গান, ড্রাম বা অন্য কোনো শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র বাজানো যা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা অথবা যাত্রীদের বিঘ্ন, অসুবিধা বা বিরক্তি উৎপাদন করে;
- পুলিশ কমিশনারের অনুমোদিত নয়, এমন পথে অথবা এমন সময়ে সমাবেশ বা মিছিলের আয়োজন করা;
- কোনো রাস্তায় এমনভাবে কর্ড পোল ঝোলানো বা বসানো যা যানবাহন ও আলো বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে;
- সর্বসাধারণের জায়গায় অথবা তাদের চিত্ত বিনোদনের জায়গায় অথবা তার নিকটবর্তী এলাকায় লাউড স্পীকার ব্যবহার করা;
- পুলিশ কমিশনারের লাইসেন্স ছাড়া রাস্তা বা সর্বসাধারণের জায়গায় আলোকসজ্জা করা।

নির্বাচন অফিসার (বিশেষ ধারা) আইন, ১৯৯১

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার জন্য নির্বাচন অফিসার (বিশেষ ধারা) আইন ১৯৯১ নামে একটি বিশেষ আইন কার্যকর করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হচ্ছে:

ধারা ২: দফা (ঘ) "নির্বাচন অফিসার" হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং যিনি ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবেন।

ধারা ৪: (১) নির্বাচন অফিসার হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিই কোনো দায়িত্ব গ্রহণে অথবা

www.pathagar.com

পালনে অস্বীকৃতি জানাবেন না, যদি নির্বাচন কমিশন অথবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসারের পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকে।

(২) নির্বাচন অফিসার হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে বাধা দেবেন না বা আটকে রাখবেন না।

ধারা ৫: (১) যদি কোনো নির্বাচন অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন কমিশনের অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় বা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা নির্বাচন সম্বন্ধীয় আইন অমান্য করে অথবা সেই আইন অনুযায়ী কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার কর্মবিধি অনুযায়ী সেটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো নির্বাচন অফিসার কোনো অপরাধ করলে তার নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ তাকে চাকুরী থেকে পদচ্যুত বা বরখাস্ত করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারে অথবা দুই বছরের জন্য পদোন্নতি অথবা বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখতে পারে।

বিধিতে বলা হয়েছে যে, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো সংঘটিত অপরাধের বিচার অন্য যে কোনো আইন অনুযায়ী চলতে থাকলে বিভাগীয় পর্যায়ের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাতে কোনো বাধা বা প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

(৩) যদি কোনো নির্বাচন অফিসার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো অপরাধ করেন, তাহলে নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্ণিং অফিসার তার কর্মবিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তাকে সর্বোচ্চ দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন এবং এ ধরনের বরখাস্তের নির্দেশ তার নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষ তার কর্মবিধি অনুযায়ী তাকে দিয়েছেন বলে বিবেচিত হবে এবং তা সেই অনুযায়ী কার্যকর হবে।

(৪) যদি নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্ণিং অফিসার কোনো নির্বাচন অফিসার কর্তৃক উপ-ধারা, (১) অনুযায়ী কোনো অপরাধের কারণে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়, তাহলে কর্তৃপক্ষ অনুরোধ প্রাপ্তির দিন থেকে একমাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

ধারা ৬: (১) অনুচ্ছেদ ৪ (১) ও ৪(২) অমান্যকারী যে কোনো ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

(২)ধারা ৫(৩)-এর নির্দেশাবলী অমান্যকারী অথবা ধারা ৫(৪)-এর বিধিসমূহ ভঙ্গকারী যে কোনো ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

কিছু মন্তব্য

মানুষের অন্যায়-অবিচার করার ক্ষমতা গণতন্ত্রকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করে তোলে, আবার, মানুষের ন্যায়বিচার করার ক্ষমতাই গণতন্ত্রকে সম্ভবপর করে তোলে। মূল্যবোধ ও শাসন রীতির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচারের ধারণা বিবর্তিত হয়। গণমুখী ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই

www.pathagar.com

পদ্ধতিকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দিতে হবে যাতে সার্বিক কল্যাণে জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্ভবত শুরু হয় শাসন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি রাখার মাধ্যমে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ সময় সামরিক শাসন জারি থাকার ফলে (যখন সংবিধান হয় নিষ্ক্রিয় নতুবা আংশিকভাবে মূলতবী হয়ে যায়) বাংলাদেশের জনগণ তখন গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা চর্চার সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই অথবা অ-বাংলাদেশীরা সামরিক শাসকদের সাথে কাজ করেছে এবং তারাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রীতি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ হয়েও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করতেই পারে। এসব নেতৃবর্গ, তাদের অনুসারীবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের দাবি ও চাহিদার মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই। এ ধরনের অসঙ্গতি ও পরিবর্তনশীলতা জনমনে অনাস্থার জন্ম দিয়েছে যে, বর্তমান পদ্ধতির ভিত্তিও যথেষ্ট শক্ত নয় আবার তা ফলদায়কও নয়। জনগণের শাসন ব্যবস্থাকে "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য" (of the people, by the people, for the people) রূপান্তরের প্রচেষ্টা ও তার মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শুরু করা উচিত যা একই সাথে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় তাদের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, শুধুমাত্র "ভোটের দিনের" গণতন্ত্র হিসেবে নয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত যে আইন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পরে তা যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা প্রার্থী ও ভোটার উভয়ের ওপরেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দুর্নীতি জনসাধারণকে তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার থেকে শুরু করে ভোটদানের অধিকার এবং ফলাফল ঘোষণার ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তোলে। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী, ভোটার হতে গেলে তাকে অবশ্যই কোনো এলাকার বাসিন্দা হতে হবে যা অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। ফলে বস্তিবাসীদের মতো ভাসমান জনগোষ্ঠী ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় না এবং ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। এতে করে অনগ্রসর ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বিশাল এক জনগোষ্ঠীর ওপরে ব্যাপক অন্যায় করা হয়। বিরোধী দলগুলো এটাকে সরকারি দলের ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দেয় একথা বলে যে, এই ভোটাররা তাদের সমর্থক।

যে দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, সেখানে তাদের কতজনের স্থায়ী আবাস আছে বলে আশা করা যায়? কাজেই, এই পরামর্শ দেয়া যেতে পারে যে, আইনে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না যা ভাসমান জনগোষ্ঠীকে হিসেবের বাইরে রাখে এবং নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠবে যা এধরনের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনবে ও তার উপশম করবে।

ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ধারা ৮(১) অনুযায়ী: "a person shall be deemed to be resident in an electoral area if s/he ordinarily resides in that electoral area." ভোটারদের প্রত্যাশার প্রেক্ষাপটে এই বিধির পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি তার মূল এলাকায় ভোট দিতে চাইতে পারে তার অস্থায়ী ঠিকানার এলাকায় নয়, কারণ তা ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে পারে। কোনো ব্যক্তি তার বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে যা ভোটার রেজিস্ট্রেশন

www.pathagar.com

ফর্মে দেখানো হয়েছে এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের সম্প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে। কারণ পেশাগত ও অর্থনৈতিক কারণে ভোটররা তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করে। অন্তত ভোটের জন্য, কোনো ভোটারের একটি এলাকার অধিবাসী হওয়ার বিষয়টির সাথে অনেক রুচি ও আবেগের প্রশ্ন জড়িত যা ভোটদানের সিদ্ধান্তকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। অতএব, এই পরামর্শ দেয়া যেতে পারে যে, ভোটারদেরকে নির্বাচনী এলাকা হিসেবে আদি নিবাস ও বর্তমান ঠিকানার মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেবার সুযোগ দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, তৈরি ও চূড়ান্ত হয়ে যাবার পরে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ভোটার তালিকা অনুসরণ করা উচিত। ভূয়া ভোট ও ভোটার পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করা নির্বাচন অনুষ্ঠানকারীদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রটিতে বেশির ভাগ নির্বাচনেই ব্যাপক কারচুপি হয় বলে কথিত। প্রায়ই দেখা যায় উপস্থিত ভোটারের সংখ্যার তুলনায় ভোট পড়ে অনেক বেশি। ভোটার নাম্বার ও নামধারী আসল ব্যক্তিকেই ভোটকেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এই বলে যে তার ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে।

বর্তমান আইন আপত্তিকৃত ভোট দান ও গণনা অনুমোদন করে কোনো ধরণের অবধারণা বা উল্লেখ ছাড়াই যে, আদালত যদি ভোটগুলো ভূয়া বলে রায় দেয়, তাহলে তা ভোটের ফলাফলের ওপরে কীভাবে প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে টেণ্ডারড ভোট গণনা করা হয় না সম্ভবত এটা নিশ্চিত করতে যে কোনো ভোটই দুবার দেয়া হয়নি। কিন্তু এতে করে ভূয়া ভোট যেমন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তেমনি প্রকৃত ভোটারও বঞ্চিত হচ্ছে। পরবর্তীজনই হয়তো প্রকৃত ভোটার যে অন্য কোনো প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে কিন্তু তার ভোট গণনা করা হয়নি। এ ধরনের নিয়ম থেকেই ব্যাপক অনিয়ম ও হতাশার জন্ম তাই ভোটগ্রহণের আইন ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিগতভাবে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

আইন অমান্যকারী ও অন্যের অধিকার ক্ষুন্নকারকে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত এবং এসব ঘৃণ্য কৌশলের নায়ক ও তাদের সহযোগীদের নির্দিষ্ট মেয়াদের ভোটাধিকার বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এছাড়াও আপত্তিকৃত ভোট (challenged vote) -এর পরিণতি সম্পর্কে আইনে পরিষ্কারভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই।

প্রত্যেক নির্বাচনেই নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারণ করে দেয় যা প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনে ব্যয় করতে পারবে [ধারা ৪৪খ (৩), ১৯৭২-এর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ]। আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে তার নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হয়, যা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব হিসাব পর্যালোচনা ও যাচাই করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করার বিধির অনুপস্থিতিই সম্ভবত: এই বিধিসমূহকে অর্থহীন করে দিচ্ছে। নির্বাচনী ব্যয়সীমা লংঘনের দায়ে শাস্তির ঘটনার কোনো উদাহরণ নেই বললেই চলে।

আইনগতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব যদিও নির্বাচন কমিশনের ওপরে, তবে "নির্বাচনকাল" বলতে আইনে কিছু নেই। দৃশ্যত নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব শুরু হয় মনোনয়নপত্র জমা দিতে বলার পর থেকে এবং সেই কারণে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী আচরণবিধির ওপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যদি না তাদের প্রতিনিধিরা প্রার্থিতা লাভের জন্য

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচনী ব্যয়ের নামে টাকার খেলা বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আইনের ধারা সংযোজিত হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনের উচিত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মনোনয়ন সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের যে কোনো অন্যায্য কাজ বিচার করার ক্ষমতাও তাদের অবশ্যই থাকতে হবে। দলের মনোনয়ন লাভ ও পুঁজি বিনিয়োগের পেছনে যে ব্যক্তি টাকা খাটায় নির্বাচিত হলে অথবা তার দল ক্ষমতায় গেলে সেই বিনিয়োগের ফসল তিনি ঘরে তুলতে চান।

সচেতনতার অভাবে এবং প্রাসঙ্গিক আইন-কানুনের প্রয়োগহীনতার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী ও সমর্থক বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনী আইন অমান্য করে। এধরনের বেআইনী কার্যকলাপ এমন পরিস্থিতির জন্ম দেয় যাতে আইনগতভাবে স্বীকৃত নাগরিক অধিকারসমূহ ক্ষুন্ন হয়। দেয়ালে লিখন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পোস্টার লাগানো, ব্যানার লাগানো, মিছিল, অনুমতি ছাড়া মাইকের অবিরাম ব্যবহার, ফুটপাথ ও রাস্তা জবর-দখল ইত্যাদি এ ধরনের কার্যকলাপের আওতায় পড়ে।

নির্বাচনী আইন ছাড়াও মেট্রোপলিটান পুলিশ আইন ও পৌর আইন সুনির্দিষ্টভাবে এধরনের কার্যকলাপ নিরুৎসাহিত করে যা রাজনৈতিক দলগুলো ও সমর্থকরা প্রায়ই অগ্রাহ্য করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মালিকের অনুমতি ছাড়া দেয়ালে লিখলে সিটি কর্পোরেশন আইন ও পুলিশ আইনে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিভিন্ন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নিজেরাই সিটি কর্পোরেশন আইন ভঙ্গ করেছে। নির্বাচন কমিশনের বারবার আবেদন সত্ত্বেও প্রার্থীর সমর্থকরা অন্যদের দেয়ালে অনুমতি ছাড়াই লিখেছে।

সংবিধানের (অনুচ্ছেদ ১২৬) সর্বোত্তম ব্যবহার নির্বাচন কমিশন করতে পারেনি যেখানে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে দেশের সমস্ত নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তার কথা বলা হয়েছে। মিছিল, শোভাযাত্রার অথবা জনসভার স্থান নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে কার্যকরী অনুরোধের অভাব আছে। প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া প্রায়শই লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয় এবং মিছিল ও জনসভার জন্য গতিপথ ও স্থান নির্ধারণ করা হয় না।

বর্তমান আইনগত কাঠামো অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন কিন্তু সংসদ সদস্য হিসেবে মাত্র একটি আসনই তিনি রাখতে পারবেন। কেউ একই সাথে একাধিক এলাকা থেকে নির্বাচিত হলে একটা মাত্র আসন সংরক্ষণ করতে পারবেন। অন্যান্য আসনের জন্য আসন শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [সংবিধানের ধারা ১২৩ (৪)]। এক এলাকা থেকে নির্বাচিত হবার নিশ্চয়তা না থাকলে অন্য এলাকাতে যাতে সম্ভাবনা রহিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্যই সম্ভবত এ ধরনের একটি সুযোগ বহাল রাখা হয়েছে।

এটা মোটামুটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অসন্তোষের মূল কারণ হচ্ছে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগের অভাব। বিদ্যমান আইন অনুযায়ীই অনেক দুর্নীতি অনিয়ম দূর করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে, কিন্তু এই ক্ষমতার অপ্রতুল প্রয়োগ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অকার্যকর কর্তৃত্বের ফলে এর অনেক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের তালিকা

নির্বাচনের বিভিন্ন ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় ধারাসমূহ যেসব আইনে আছে:

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

২। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি

৩। স্থানীয় সরকার আইনসমূহ: সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত আইনসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও পৌরসভা আইন, এবং

৪। পুলিশ আইন

শুধুমাত্র নির্বাচন সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আইন

১. গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ('৭২-এর পি. ও. নম্বর ১৫৫)

১.১ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সম্পূরক) আদেশ, ১৯৭৩ (৭৩-এর পি. ও. ৮)

১.২ গণ-প্রতিনিধিত্ব সম্পূরক (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩

১.৩ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮

১.৪ গণ-প্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮

১.৫ গণ-প্রতিনিধিত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮

১.৬ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪

১.৭ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১.৮ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.৯ গণ-প্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.১০ গণ-প্রতিনিধিত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.১১ গণ-প্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.১২ গণ-প্রতিনিধিত্ব (পঞ্চম সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.১৩ গণ-প্রতিনিধিত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬

১.১৪ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৯১

১.১৫ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৯১

১.১৬ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬

১.১৭ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯৬

১.১৮ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০০১

১.১৯ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৭

১.২০ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৯

www.pathagar.com

২. গণ-প্রতিনিধিত্ব (মহিলাদের জন্য আসন) আদেশ ১৯৭৩ ('৭৩- এর পি.ও. নম্বর ১৭)

২.১ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সম্পূরক) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৩
২.২ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
২.৩ গণ-প্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
২.৪ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬
২.৫ গণ-প্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬
২.৬ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৯১
২.৭ গণ-প্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯১

৩ ভোটার তালিকা আদেশ, ১৯৭২ (৭২-এর পি. ও. ১০৪)

৩.১ ভোটার তালিকা (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
৩.২ ভোটার তালিকা (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৪

৪ নির্বাচন কমিশন আদেশ, ১৯৭২ (৭২-এর পি. ও. ১০৪)

৫ নির্বাচন অফিসার (বিশেষ আইন) বিধি, ১৯৯১

৬. বিধি

৬.১ নির্বাচনী কলেজ বিধি ১৯৬৪
৬.১.১ নির্বাচনী কলেজ (সংশোধনী) বিধি ১৯৬৪
৬.২ নির্বাচনী কলেজ (সংশোধনী) বিধি ১৯৬৫
৬.২.১ নির্বাচনী কলেজ (সংশোধনী) বিধি ১৯৬৫
৬.২.২ নির্বাচনী কলেজ (সংশোধনী) আইন ১৯৬৫
৬.২.৩ নির্বাচনী কলেজ (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৫৭

www.pathagar.com

নির্বাচনী বিবাদ মীমাংসা

শিশির মোড়ল

নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে ভোলা-১ আসন থেকে কোনো ব্যক্তি সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। পুরো পাঁচ বছর আসনটি প্রতিনিধিত্বহীন থেকে যায়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ আসনে জয়লাভ করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পরাজিত প্রার্থী মোশাররফ হোসেন শাজাহান ভোলা-১ আসনের নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন।

দুটি আসনে বিজয়ী তোফায়েল আহমেদ ভোলা-১ আসনটি ছেড়ে দিলে নির্বাচন কমিশন ওই আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করে। কিন্তু নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির আগে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার আবেদন মোশাররফ হোসেন শাজাহান। আদালত তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে উপনির্বাচন স্থগিত রাখার আদেশ দেয়।

বিভাগীয় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলাটি খারিজ হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন ওই আসনে উপনির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মোশাররফ হোসেন শাজাহান ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। তিনি উচ্চতর আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয় পর্যন্ত উপনির্বাচন স্থগিত রাখারও আবেদন করেন। আদালত তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে উপনির্বাচন স্থগিত রাখার আদেশ দেয়। উচ্চতর আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়নি। মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভোলা-১ আসনে আর উপনির্বাচন হতে পারেনি। তাই পুরো সপ্তম সংসদের পাঁচ বছর সময়কালে ভোলা-১ আসনের জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদে ছিল না।

সংসদের পুরো মেয়াদকালে কোনো আসন প্রতিনিধিহীন থাকার নজির বাংলাদেশের ইতিহাসে আর নেই। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে মামলা নিষ্পত্তি হতে হতে সংসদের পাঁচ বছরের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যায়।

সপ্তম জাতীয় নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মোট ৬৩টি মামলা দায়ের হয়। মামলার বাদি এবং বিবাদি পক্ষের অবস্থান এরকম (সূত্র: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়):

www.pathagar.com

আবেদনকারী পক্ষ	আসন সংখ্যা	প্রতিপক্ষ(আসন সংখ্যা)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৪০	আওয়ামীলীগ (৩৮), জাতীয় পার্টি (০১) ও জাসদ (০১)
আওয়ামী লীগ	১৮	বিএনপি (১৩), জাতীয় পার্টি (০৪) ও জামায়াতে ইসলামী (০১)
জাতীয় পার্টি	০২	বিএনপি (০১) ও জাতীয় পার্টি (০১)
জামায়াতে ইসলামী	০২	আওয়ামী লীগ (০২)
স্বতন্ত্র	০১	আওয়ামী লীগ (০১)

পঞ্চম জাতীয় সংসদ, ১৯৯১ এর নির্বাচনের পর সমগ্র দেশে মোট ৩১টি নির্বাচনী মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারী পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ নিম্নরূপ:

আবেদনকারী পক্ষ	আসন সংখ্যা	প্রতিপক্ষ(আসন সংখ্যা)
আওয়ামী লীগ	০৮	বিএনপি (০৫), জাতীয় পার্টি (০১), স্বতন্ত্র (০১) ও এনডিপি (০১)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০৯	আওয়ামী লীগ (০৭), ইসলামী ঐক্য জোট (০১) ও জাতীয় পার্টি (০১)
জাতীয় পার্টি	০৩	ন্যাপ (ম)- (০১), বিএনপি (০১) ও নির্বাচন কমিশন (০১)
জাসদ (রব)	০২	আওয়ামী লীগ (০১) ও বিএনপি (০১)
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০২	নির্বাচন কমিশন (০২)
জামায়াতে ইসলামী	০২	বাকশাল (০১) ও আওয়ামী লীগ (০১)
বাকশাল	০১	জামায়াতে ইসলাম (০১)
গণতন্ত্রী পার্টি	০১	জাতীয় পার্টি (০১)
ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	০১	সিপিবি (০১)
ফ্রীডম পার্টি	০১	আওয়ামী লীগ (০১)
স্বতন্ত্র	০১	আওয়ামী লীগ (০১)

সপ্তম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন উপনির্বাচনের পর আরও তিনটি নির্বাচনী মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের দুই জন পরাজিত প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির একজন পরাজিত প্রার্থী এই মামলাগুলো দায়ের করেন।

মোট ৬৩টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী ৪৮টি মামলা খারিজ হয়ে যায়। বাকি ১৮টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন ছিল। ১৮টির মধ্যে ছয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে বিচারাধীন ছিল (Hena; Daily Star January

www.pathagar.com

30, 2001)। সেই অবস্থায় সংসদের মেয়াদকাল শেষ হয়।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ছিল নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার। ১৯৯৬ সালের জুনের সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন দেশের বিভিন্ন জেলায় ৬১টি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। পরবর্তীতে ১২ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ছয়টি বিভাগীয় শহরে আরও ছয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব জেলা জজদের ওপর দেয়া হয়েছিল।

গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৯(১) ধারার বিধান অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারতেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯(৪) ধারার বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে হত।

ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদনের সুযোগ ছিল। দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হত। এই বেঞ্চের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু তারপরও এই বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদনের সুযোগ ছিল।

সংসদ, রাষ্ট্রপতি এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে দায়ের করা কিছু মামলার এক পর্যবেক্ষণে (The Electoral System in Bangladesh: Report of a non-governmental group, International Centre for Ethnic Studies; Colombo) দেখা যায় কমপক্ষে তিন ধরনের পদ্ধতিগতকারণে নির্বাচনী আইনকানুন/ নিয়মনীতি লঙ্ঘন করা হয়। প্রথমত কিছু প্রার্থী কর্তৃক ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ব্যালট বাক্স কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া, জোর করে ভোট দেয়া, নির্বাচনী কর্মকর্তা অপহরণসহ অন্যান্য বেআইনি কর্মকান্ড। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের আইনে প্রার্থী হবার যোগ্য নন এমন অনেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তৃতীয়ত অনিয়মের কারণে যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হয় বা হবে সেগুলোর শুনানি হবে না বা নিষ্পত্তি হবে না—এমন ভেবে অনেক প্রার্থীই আইন অমান্য করেন। এসব কারণে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করাটা অনেকটা প্রতিকী প্রতিবাদের রূপ ধারণ করেছে।

গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর পাঁচ অধ্যায়ে সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আবেদনের পদ্ধতি ও কৌশল (Strategy) সর্ম্পকে বর্ণনা করা ছিল। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হত একজন ব্যক্তি নিয়ে যিনি জেলা জজ বা সেশন জজ ছিলেন। আইন মোতাবেক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ছিল একটি দেওয়ানি আদালতের। আইনে ছিল ট্রাইব্যুনাল কোনো নির্বাচনী আবেদনের শুনানি মুলতুবি রাখবে না এবং "যত দ্রুততার সাথে সম্ভব শুনানি শুরু করবে এবং ৬ মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করতে চেষ্টা চালাবে।" ট্রাইব্যুনাল কোনো মামলা খারিজ করতে পারত, বিজয়ী ঘোষিত কোনো প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারত এবং আবেদনকারীকে বিজয়ী ঘোষণা করতে পারত, অথবা ব্যাপক দুর্নীতি ও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য পুরো নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারত। স্বয়ং আবেদনকারীর মৃত্যু হলে নির্বাচনী মামলা তামাদি হয়ে যেত।

www.pathagar.com

বেশ কিছু কারণে নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লেগে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পাঁচ বছরের বেশি হয়ে যায়। প্রথমত নির্বাচনী আইনে নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া নেই। শুধু উল্লেখ ছিল নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ছয় মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু উচ্চতর আদালতে কোন সময়ের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি হবে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত জেলা জজ বা সেশন জজ ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বে থাকতেন তাঁরা তাদের অন্যান্য কাজের চাপে নির্বাচনী মামলায় যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। তৃতীয় কারণটি সংসদ সদস্যদের কিছু আইনগত সুবিধা। সংসদ অধিবেশন শুরু হবার ১৪ দিন আগে থেকে, অধিবেশন চলাকালে এবং অধিবেশন শেষ হবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত কোনো সংসদ সদস্য আদালতে হাজির না হবার আইনি সুবিধা ভোগ করেন। একটি অধিবেশন শেষ হওয়া এবং নতুন একটি অধিবেশন শুরু হবার মধ্যবর্তী সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করার সুযোগ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের কম থাকে। চতুর্থত মামলার যে কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলা এক ট্রাইব্যুনাল থেকে অন্য ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ছিল—যা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। আইনি লড়াইয়ের সব কটি স্তর পার হতে হতে সংসদের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ "গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০১" স্বাক্ষর করেন ৮ আগষ্ট, ২০০১ তারিখে। এর ফলে নির্বাচনী আইনে যে সংশোধন হয়েছে তাতে ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে মামলা সরাসরি নিষ্পত্তি হবে হাইকোর্ট বিভাগে। এখন দেখার বিষয় ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে হাইকোর্টে কত দ্রুত নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তি ঘটে।

তথ্যসূত্র:

The Electoral System in Bangladesh: Report of a non governmental group; International Centre for Ethnic Studies;Colombo.

নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন; জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১; বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন,ঢাকা।

Strengthening electoral process in Bangladesh: Recomendation; Fair Election Monitoribg Alliance; March, 2000; Dhaka.

Hena, Mohammed Abu; Some reflections on election tribunal, The Daily Star January 30, 2001.

www.pathagar.com

মানুষজন কী ভাবছেন

হোসেন জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি সাধারণ আকাঙ্খা হচ্ছে, দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হোক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিপদে জনমানুষের অংশগ্রহণ বাড়ুক। এই ইচ্ছাপূরণের সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে সংসদ, স্থানীয় সরকার, নাগরিক সংগঠন ইত্যাদি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলো তো রয়েছেই। এ ছাড়া, জনমানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও গণতন্ত্রায়নের পথ সুগম করতে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জনমত জরিপ। সে অর্থে জনমত জরিপকে আমরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখতে পারি। আসলে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছাড়া জনপ্রতিনিধিত্ব-ভিত্তিক গণতন্ত্রের ধারণাটি পূর্ণরূপ পায় না। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র মানেই একটি জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। জনমত জরিপের মাধ্যমে জনমানুষের মতামত একটি শক্তপোক্ত সক্রিয় ভিত্তি পায়।

বাংলাদেশে জনমত জরিপের মূল্যয়ন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত জরিপের বিষয়টি এখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। গণমাধ্যম এখনো জনমত জরিপের ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়। তার একটি কারণ হতে পারে এই যে, মাত্র সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষণ ছিল স্বৈরশাসন। স্বৈরশাসনকে ঘিরে যে সংস্কৃতি বিরাজ করে তাতে জনমানুষ কী ভাবছে বা বলছে তা শোনার অবকাশ নেই। এই মনোভাবটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোসহ সংবাদপত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। তবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাতেই জনমত জরিপের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি যে জনমানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বা মতামতের আদান প্রদান শুরু করতে হবে, আর জনমত জরিপের সূচনা সেই কারণেই।

কিন্তু জনমত জরিপ ছাড়া গণতন্ত্র অচল এমনটা ভাবাও ঠিক না। গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান চাহিদা জনমত জরিপ নয়। এই হাতিয়ারটি ব্যবহার করতে হবে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে। যে অজস্র উপাদানের সমাবেশ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, জনমত জরিপ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠতে পারে। তবে এই একটি মাত্র উপাদানের ওপরে আমরা চূড়ান্ত মূল্য আরোপ করছি না।

আমাদের সমাজে দীর্ঘদিনের একনায়কতন্ত্রের যে সংস্কৃতি রয়েছে তা পাল্টানোই জনমত জরিপের লক্ষ্য। যদিও এই সাংস্কৃতিক অভ্যাস রাতারাতি পাল্টাবে না, তার জন্য সময় লাগবে। ততদিন জনমত

www.pathagar.com

জরিপের সুবিবেচিত ও অর্থবহ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনমত জরিপের ঢালাও ব্যবহার হয় -এই যুক্তি দেখিয়ে আমরা বিনা বিচারে এই পন্থা হরেদরে গ্রহণ করতে পারি না। পাশ্চাত্য সমাজের চাইতে আমরা সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক অন্যরকম। জনমত জরিপ যে উপড়ে এনে প্রতিস্থাপন করার মতো কোনো জড় বিষয় না, এটা বুঝতে হবে। এর ব্যবহারে সুবিবেচনা ও সৃজনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। জনমত জরিপের মূল পন্থাগুলো জানতে হবে। এই হাতিয়ারটি যে যথেচ্ছ অপব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধেও সজাগ থাকতে হবে।

এসব কিছুর পরও হাতিয়ার হিসেবে জনমত জরিপের কার্যকারিতা অনেক। জনমত জরিপকে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র চর্চার পক্ষের জোরালো শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে বা মানুষের মতামতের নামে ইচ্ছেমত রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারি না। অর্থাৎ অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভূয়া জনমত বানানো চলবে না। কোনো কোনো একনায়কের আমলে জনমত জরিপের নামে শাসকের পক্ষে শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের সমর্থন দেখানো হয়েছিলো। জনমত জরিপের এ জাতীয় ব্যবহার কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনমত জরিপ ব্যাপারটি নতুন, তাই সামাজিকভাবে এর গ্রহণযোগ্যতা এখনো ব্যাপক হয়নি। বর্তমান বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণের যে প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে তার ফলে জনমত জরিপের বিষয়টি এখনও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এখনো জনমত জরিপে পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। তবে যাঁরা জনমত জরিপের মত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার নিয়ে কাজ করছেন, এসব প্রাথমিক বাধা দেখে তাঁদের পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। বরং এই বিষয়ে অধ্যাবসায়ের সাথে কাজ করে যেতে হবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত ফল লাভের চেষ্টা করতে হবে। জনমত জরিপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার হচ্ছেন জরিপে মতামতদানকারী সাধারণ জনগণ, তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়া এবং পেশাগত দক্ষতার সাথে প্রাপ্ত মতামত ব্যবহার করা জরিপ পরিচালনাকারী সকলের দায়িত্ব। তাহলেই একসময় জনমত জরিপ জবাবদিহিতার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে উঠবে।

বিভিন্ন প্রেক্ষিতে জনমত জরিপ হতে পারে। পিপিআরসি তিনটি প্রেক্ষাপটে জনমত জরিপ করেছে। এগুলো হচ্ছে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন (১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৭, ২০০১), রাজনৈতিক সঙ্কট (১৯৯৪-৯৬) এবং সরকারি কর্মক্ষেত্রে মূল্যায়নপত্র। সে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে জনমত জরিপ খুবই উপযোগী হাতিয়ার হতে পারে। তবে অতীতের ভুলগুলো থেকেও যে শিক্ষা নিতে হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নির্বাচনের ওপর জনমত জরিপের তিনটি মূল লক্ষ্য

জনমত জরিপের একটি সরল লক্ষ্য হচ্ছে অনুমিত কিছুর সমর্থনে ফলাফল লাভ করা। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জনমানুষের মতামতের সাহায্যে কিছু রাজনৈতিক এজেন্ডা গড়ে তোলা, যেগুলোকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনমানুষের বক্তব্য আর দাবি-দাওয়া-চাহিদা তুলে ধরা ও সকলকে সে সম্বন্ধে জানানোর কাজে মতামত জরিপের খুব শক্ত ভূমিকা থাকা উচিত। রাজনৈতিক এজেন্ডা দাঁড় করানোর ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতাদের একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। সাধারণ মানুষের জীবনেও রাজনৈতিক এজেন্ডার সম্পর্কটি অত্যন্ত মৌলিক, তাই এই এজেন্ডা কী হবে, কীরকম হবে সে বিষয়ে জনমানুষের বক্তব্য বিবেচনায় নিতেই হবে। তৃতীয় লক্ষ্যটি হচ্ছে যেসব অনভিপ্রেত ঘটনাবলী ঘটতে পারে সেগুলো অনুমান করে তা ঠেকানোর চেষ্টা করা। ধরা যাক কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় সহিংসতা হতে পারে বলে জানা গেল। যদি সেরকম বিপদজ্জনক এলাকাগুলোর একটি হুঁশিয়ারি মানচিত্র (alert map) তৈরি রাখা হয় তবে হয়ত সম্ভাব্য সহিংসতা ঠেকানোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। এই হুঁশিয়ারি মানচিত্র হাতে পেলে নির্বাচন কমিশন হয়ত ঐ সব সহিংসতামুখী এলাকার জন্য বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

অনভিপ্রেত ঘটনাবলী অনুমান করা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া জনমত জরিপের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

জনমত জরিপের দুটি দিক

অর্থপূর্ণ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হলে যে কোনো জনমত জরিপের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকতে হবে:

ক) বিশ্বাসযোগ্যতা: জরিপ হবে নিরপেক্ষ (unbiased)।

খ) পেশাগত দক্ষতা ও মনোভাব: এই উপাদানটি ছাড়া বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

যিনি জনমত জরিপ করবেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য ও পেশাগতভাবে দক্ষ না হলে জরিপ থেকে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে না। পেশাগত উৎকর্ষের জন্য জরিপকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

জনমত জরিপ বস্তুত জনমানুষের বক্তব্য শোনা। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করছি। জনমত জরিপ অপব্যবহৃত হয় তখনই যখন মানুষের সত্যিকার মতামত জানতে আগ্রহ কম থাকে। আগে থেকেই একটি ধারণা বা পূর্বানুমান (হাইপথিসিস) করে নিয়ে জরিপকারীরা চান মানুষ শুধু সেটাই অনুমোদন করুক।

পিপিআরসি এবং অন্যান্য সমমনা সংগঠনগুলো এই দিকটির ওপরেই জোর দিচ্ছে কেননা এটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয়ে এসেছে। আমরা মনে করি জনমানুষের কথা শোনার মাধ্যমে আমরা সত্যি সত্যিই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দৃঢ়তর ও উন্নতর করতে সাহায্য করতে পারব। জনমত জরিপের লক্ষ্যই হবে মানুষের বক্তব্য জানার চেষ্টা, মানুষকে দিয়ে কোনো বিশেষ বক্তব্য স্বীকার বা অস্বীকার করানো নয়।

জনমতের মানচিত্রায়ন

বাংলাদেশের পরিস্থিতির আলোকে আমরা বহুলভাবে ব্যবহৃত মতজরিপের বিপরীতে জনমতের মানচিত্রায়নের বিষয়টি বিবেচনা করছি। জনমত জরিপ এবং জনমত মানচিত্রায়নের মধ্যে মূল পার্থক্য

www.pathagar.com

হলো জনমত জরিপে প্রধানত হাঁ/না উত্তর খোজা হয়; কিন্তু জনমত মানচিত্রায়নে হাঁ/না খোঁজা হয় না। রাজনৈতিক সংকটকালে জনমত জরিপের পরিবর্তে মানচিত্রায়নে আমরা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে হাঁ বা না উত্তর খুঁজিনি। আমরা বরং মতামত দেবার ব্যাপারে জনমানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছি যাতে করে তারা নানা বিষয় বিবেচনা করে তাদের প্রকৃত মতামত দিতে পারেন।

জনমত মানচিত্রায়নে একটিমাত্র উত্তর না চেয়ে একাধিক উত্তর বা মতামত চাওয়া হয় যাতে করে যে কেউ উত্তরদাতার মতামত থেকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে তালিকা তৈরী করতে পারেন। বহুল আলোচিত এবং অবিতর্কিত বিষয়ে জনমানুষ একটি মাত্র উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু জটিল ও বৃহত্তর বিষয়ে উত্তরদাতা কেবল একটি উত্তর দেবার ব্যাপারে অনাগ্রহী হতে পারেন। উত্তর দাতার একাধিক উত্তর বিবেচনা করে জরিপকারী বা গবেষক বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জনমানুষের উপলব্ধির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন। জনমত মানচিত্রায়নে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা যদি অধিকসংখ্যক এবং নানামুখী বিষয়ে মতামত না দেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করছেন বা উদ্বিগ্ন। কিন্তু উত্তরে যদি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে জনমত মানচিত্রের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ইস্যু কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায়। যেহেতু জনমত মানচিত্রায়নে উত্তরদাতাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয় সেজন্য উত্তরদাতার কাছ থেকে বিশেষ উত্তর, যেটি একজন খুঁজছেন, তা পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। কাজেই জনমত মানচিত্রায়ন এমন একটি হাতিয়ার যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব উপযোগী।

সুতরাং জনমানুষের মতামত যাচাইয়ের ব্যাপারে আমাদের সামনে দুটো উপায়– জনমত জরিপ এবং জনমত মানচিত্রায়ন। বিতর্কিত নয় এমন এবং সাদামাটা বিষয়ে আমরা মত জরিপ করতে পারি এবং বিতর্কিত ও জটিল বিষয়ে করতে পারি মত মানচিত্রায়ন। মত জরিপ এবং মত মানচিত্রায়নের অবশ্য নানা উপায়ে আছে। গবেষক বা জরিপকারীকেই ঠিক করতে হবে দুটো হাতিয়ারের কোনটি তার উদ্দেশ্য সর্বাধিক হাসিল করবে।

অন্যান্য বিষয়: আমাদের দেশে এমনকি পশ্চিমা দেশের প্রেক্ষাপটেও জনমত জরিপে দু'টো মূল বিষয়ে সমানভাবে মনোযোগ দিতে হয়। এর একটি জরিপটি নিজেই (টেকনিক্যাল বিষয়) এবং অন্যটি যা অধিকতর জটিল, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন। বিষয় নির্ধারণ এবং প্রশ্নমালা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভালো প্রশ্নপত্র তৈরি করার ব্যাপারে গবেষকগণ বিভিন্ন পেশাদার প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সাহায্য নিতে পারেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জরিপ কাজটি হতে হবে পেশাদারী।

সাধারণ কিছু ভুল যা এড়িয়ে চলা উচিত

কোনো জনমত জরিপের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় করা এবং না-করার ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একধরনের মেরুকরণ হয়েছে। আমাদের সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। এ বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে খুব জটিল প্রশ্নপত্র তৈরি করে হাঁ/না উত্তর রাখা খুব একটা কার্যকর হবে না। এতে কেউ হয়ত এক ধরনের উত্তর পাবেন, তবে তার মূল্য হবে খুব কম। সরাসরি এবং সহজবোধ্য প্রশ্ন সেক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি ভিন্ন হতে পারে।

www.pathagar.com

দ্রুত জরিপের ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হয়: অনেক বিষয়ে দ্রুত জরিপ করা যেতে পারে। কিন্তু বড় রকমের ভুল হলে তার ক্ষমা নেই। যদি প্রস্তুতি ভাল থাকে তবে একদিনেই একটি পেশাদারী জরিপ চালানো সম্ভব। দ্রুত জরিপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তা কোনো অবস্থাতেই অপেশাদারী হলে চলবে না।

জনমত জরিপ ব্যবহারের একটি মোটাদাগের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে আরও একটু শক্তিশালী করা। আমাদেরকে মানুষের কথা শুনতে হবে, তাঁদের অবস্থা আমাদের বুঝতে হবে যেন কথা শুনবার প্রক্রিয়াটিকে স্থায়ী করা যায়। যদি আমরা সতর্ক না হই, তা হলে পরোক্ষভাবে আমরা স্বৈরাচারী সংস্কৃতিরই পুনরাবৃত্তি করব। জনমত জরিপ আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে করলাম যার সঙ্গে হয়তো সাধারণ মানুষের কোনো স্বার্থ জড়িত নেই । সুতরাং দেখতে হবে আমাদের যাতে আগ্রহ আছে তাতে মানুষের আগ্রহ রয়েছে কিনা। আমরা স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে না গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুবো। সর্বোপরি আমাদেরকে পেশাদারী হতে হবে জনমত জরিপের ক্ষেত্রে, এবং রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে হতে হবে পক্ষপাতহীন।

নমুনা বাছাই এবং জরিপের প্রস্তুতি

মতজরিপের মাধ্যমে পেশাদারী ফলাফল বের করার ক্ষেত্রে নমুনার বিষয়টি বেশ জটিল। নমুনা বাছাই অবশ্যই জরিপকৃত ভৌগোলিক এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী হতে হবে। আমাদের জানার দরকার রয়েছে যে তার ফলে আমরা পক্ষপাতহীন ফলাফল পাব কিনা। যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী তখনই পাওয়া সম্ভব যখন নমুনা বাছাই সঠিক হয়। নমুনা কত বড় হবে সেটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একজন ২০,০০০ উত্তর দাতার উত্তর সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু নমুনা বাছাই যদি সঠিক না হয় তাহলে বড় ধরনের ভুল হতে বাধ্য এবং তা থেকে সঠিক মতামত নাও পাওয়া যেতে পারে। এখানে পিপিআরসির একটি জরিপকে (১৯৯৪ সালে করা) উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়। ওই জরিপে উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৪৫০ জন। অথচ ঢাকা শহরে তখন জনসংখ্যা ৭/৮ মিলিয়ন। ওই জরিপ থেকে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল তা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য এবং পরবর্তী নানা ঘটনা এই ফলাফলকে সমর্থন করেছে। একটি সেমিনারে ওই ফলাফল তুলে ধরা হয়েছিল এবং সংবাদমাধ্যমগুলো তা ব্যবহার করেছিল।

নমুনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে চলবে না যে দেশের প্রতিটি মানুষ পরিসংখ্যানের বই পড়ে। যা হোক, নমুনা বাছাই এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ:

ক) **জনসংখ্যা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা:** জনসংখ্যা সম্পর্কে যার পূর্ব ধারণা যত বেশি থাকবে নমুনা নির্ধারণ করার জন্য তাকে তত কম সময় ব্যয় করতে হবে। পূর্ব ধারণা এবং তার সঠিক ব্যবহার হলে সময় এবং খরচ দুটোই বাঁচে। যত বেশি সম্ভব আমাদের পূর্ব ধারণাকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু নমুনার আকার-প্রকারের জন্য পরিস্কার খসড়াও তৈরি করতে হবে।

খ) **সাধারণ জ্ঞান:** একজন মানুষের যেসব সাধারণ জ্ঞান থাকে নমুনা বাছাইয়ের এবং প্রশ্নপত্র

www.pathagar.com

তৈরির সময় তা ব্যবহার করতে হবে।

গ) **নমুনায়ন তত্ত্বের ব্যবহার:** নমুনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যেসব তত্ত্ব রয়েছে সেগুলোর ব্যবহার উপকারে আসতে পারে।

ঘ) **স্বল্প খরচের পদ্ধতি এবং দ্রুততা:** অর্থপূর্ণ করতে চাইলে মতামত জরিপের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং তার ফলাফল প্রকাশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে করতেহবে। নির্বাচন বিষয়ে মতামত জরিপের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পদ্ধতি মেনে চলা যায় না। এটি আমাদের করতে হবে কয়েকদিন, এক সপ্তাহে বা এক মাসে। নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এটাই যৌক্তিক সময়সীমা। কোনো কোনো সময় মাত্র এক দিনের একটি জরিপে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। একটি বড় ধরনের গবেষণা এবং নির্বাচনী বিষয়ে মতামত জরিপের সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। এছাড়া যতটুকু সম্ভব আমাদের স্বল্প ব্যয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এটি সাংবাদিকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

সতর্কতা

টেলিফোনের মাধ্যমে জরিপ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। খুবই বাছাই করা কয়েক শ্রেণীর মানুষের কাছে টেলিফোনের মাধ্যমে পৌছানো সম্ভব। তাছাড়া, আমাদের সংস্কৃতিতে টেলিফোনে উত্তর দেয়াটা একটু অনভ্যস্ততান মধ্যে পড়ে বা পর্যাপ্ত তথ্যও তাতে পাওয়া নাও যেতে পারে। জনগণের মতামত নিতে হবে বা তাদের কথা শুনতে হবে এই বিষয়টিই এখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। সুতরাং জনমত জরিপের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ধারাকে অনুসরণ করতে পারি না। সেখানে জনগণ যথেষ্ট সাক্ষর এবং দেশটিতে ২৮০ বছরের বেশি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে। জনগণের কথা শোনা তাদের ঐতিহ্যের অংশ। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ভিন্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে জনমত জরিপ ও মানচিত্রায়ন এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যেন আমরা মানুষের কথা শুনতে পারি। প্রশ্ন হবে সহজ এবং হাঁ/না উত্তর এড়াবার চেষ্টা করতে হবে। যখন কোনো উত্তরদাতাকে হাঁ/না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি হ্যাঁ অথবা না উত্তর দেন শুধু প্রশ্নকর্তাকে বিদায় দেবার জন্য।

বিনিময়

খুবই আগ্রহ উদ্দীপক ও আকর্ষণীয় সংবাদ কাহিনী হতে পারে এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের সংবাদপত্রগুলো এখনো যথেষ্ট সচেতন বা উৎসাহী নয়। আমরা যারা গবেষণা করি তাদেরও সাংবাদিকদের সঙ্গে গবেষণা রিপোর্ট নিয়ে মত বিনিময় করা দরকার। আমরা আমাদের রিপোর্ট সাংবাদিকদের দিতে বা সেমিনারে উপস্থাপন করতে সব সময় আগ্রহী।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনমত জরিপ বা জনমত মানচিত্রায়নের ওপর তথ্য এবং রিপোর্ট সরবরাহ করতে পারে:

www.pathagar.com

১। **পাওয়ার এণ্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)**
বাড়ি ২৬, রোড ৯/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
যোগাযোগ: ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান
ফোন: ৮১১৯২০৭
ই-মেইল-hzillur@bdonline.com

২। **বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি)**
বাড়ি ৩৩, রোড ৪, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
যোগযোগ: নির্বাহী পরিচালক
ফোন: ৮৬১৮৮০৯

৩। **দি সেন্টার ফর সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট (সিএফএসডি)**
বাড়ি ৬২/১, রোড ৮/এ
ধানমণ্ডি আ/এ , ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১১৯১২৬, ৯১১৬০৩৭

৪। **ডেমোক্রেসি ওয়াচ**
৭ সার্কিট হাউজ রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
যোগাযোগ: মিস্ তালেয়া রেহমান
ফোন: ৮৩১১৬৫৭, ৯৩৪৪২২৫-৬
ই-মেইল: dwatch@bdonline.com

৫। **খান ফাউন্ডেশন**
৫, মোমেনবাগ, রাজারবাগ, ঢাকা
ফোন: ৯৩৩০৩২৩ ফ্যাক্স: ৯৩৩১৫৮৯

৬। **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল**
ট্রানাসপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল -বাংলাদেশ
১২১/সি (৪র্থ তলা)
গুলশান এভেনিউ. ঢাকা-১২১২
ফোন: ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: tib@bangla.net

www.pathagar.com

কিছু ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান যারা জনমত জরিপ করে

১। **মিত্র এণ্ড এসোসিয়েটস্**
২/১৭ ইকবাল রোড
মোহম্মদপুর, ঢাকা
ফোন: ৯১১৫৫০৩, ৯১১১৯০০
বি:দ্র: মতামত জরিপ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

২। **ডাইরেক্ট মার্কেটিং লিমিটেড**
৩৫, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২৪০০৯৬, ২৪০০৯৭-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৫

৩। **সোসাল মার্কেটিং কোম্পানি**
৩৩ বনানী, এসএমসি টাওয়ার
ঢাকা-১২১৩
ফোন: ৮৮১১৪৭৫, ৮৮১১৪২৩-২৯
ফ্যাক্স: ৮৮২৭৫৮৩

৪। **এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশন লি:**
৪, নওরতন কলোনি
নিউ বেইলি রোড, ঢাকা
ফোন: ৪০০১২৫, ৪০০১২৬, ৪০৭৩৬৮

৫। **কোয়েস্ট সার্ভে রিসার্চ**
বাড়ি: ৭০, রোড: ১৫/এ(নতুন)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৫৮৩৯, ৮১১৯৩৫৮, ৯১২৭৭৪২
ফ্যাক্স: ৮১২৩৩৯৪
ই-মেইল: quest@bdonline.com

৬। SIRIUS
বাড়ি: ২১, রোড: ১৩/এ
ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা-১২০৯
যোগাযোগ: আমের ওহাব
ফোন: ৮১১৭২৪৪

www.pathagar.com

ঢাকা শহরে নির্বাচন-পূর্ব মতামত জরিপ, জুন ২০০১

ঢাকা শহরের আটটি সংসদীয় এলাকায় ৩-১৫ জুন, ২০০১ তারিখে পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেসন সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ডেমোক্রেসি ওয়াচ যৌথভাবে একটি মতামত জরিপ পরিচালনা করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে করা এই জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% শ্রমিক, ২৭% পেশাজীবি, ২৩% ব্যবসায়ী এবং ২০% অন্যান্য (গৃহিনী, ছাত্র ইত্যাদি)। মোট ১৬০৮ জন প্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরদাতার ৭৫.৪% পুরুষ এবং ২৪.৬% নারী।

পিপিআরসি ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের করা ওই জরিপের দুটি অংশ: নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি ও ভোটারদের প্রত্যাশা এবং ভোটারদের পছন্দ অর্থাৎ রাজনৈতিকদল। জরিপের প্রথমাংশের ফলাফল ৪ জুলাই এক মতবিনিময় সভায় উপস্থাপন করা হয়।

জরিপের প্রথম অংশে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বপায়:

- ভোটার তালিকা
- ভোটদানের ইচ্ছা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত
- কাঙ্খিত প্রার্থীর গুণাবলী

উপরোক্ত বিষয়গুলো জটিল ও বহুমাত্রিক এবং বহু রকমের মতামত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় জরিপটি শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না উত্তর ভিত্তিক করা হয়নি। আবার পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর জন্য সাধারণ মতামতের চেয়ে উত্তরদাতার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতই গুরুত্বপূর্ণ। "আপনি কাকে ভোট দিবেন" এবং "আপনার মতে নির্বাচনে কোন দল বিজয়ী হবে" দুটো ভিন্ন প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সরাসরি উত্তরদাতার নিজস্ব পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শধুমাত্র উত্তরদাতার মতামত নয়, এখানে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন আলোচনা ও ঘটনা উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব কাজ করতে পারে এবং তা সঠিক নাও হতে পারে।

জরিপের ফলাফল

ক) ভোটার তালিকা

ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণত দুই ধরণের উদ্বেগের কথা শোনা যায়। প্রথমত ভোটার তালিকায় নাম না ওঠা, দ্বিতীয়ত ভৌতিক ভোটার। ভৌতিক ভোটার নিয়ে কাজ করা একটু দুরূহ।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায় ২১% উত্তরদাতা তালিকায় নিজের নাম আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তাদের মধ্যে ১.৬% নিজের নাম তালিকায় পাননি। ৩৫% মনে করেন ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে যদিও তারা ভোটার তালিকা দেখেননি।

www.pathagar.com

খ) ভোটদানের ইচ্ছা ও সময়মত নির্বাচন নিয়ে মতামত

উত্তরদাতাদের ৭০% জানিয়েছেন তারা আগামী নির্বাচনে ভোট দেবেন। ২৫.৬% উত্তরদাতা শর্তসাপেক্ষে (যেমন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে) ভোট দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

যথাসময়ে নির্বচন হবে কিনা তা নিয়ে তিন ধরনের উত্তর পাওয়া গেছে জরিপের ফলাফলে। ৭৪% উত্তরদাতা মনে করেন যথাসময়ে নির্বাচন হবে। ২৩% উত্তরদাতার মনে সন্দেহ রয়েছে এবং ২% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে না।

গ) নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি: আইন-শৃঙ্খলা

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন। ১৪% মনে করেন পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ৫% উত্তরদাতার মতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। ২০% উত্তরদাতার এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট মতামত নেই।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত দেবার সময় ৪৭% উত্তরদাতা লুটতরাজ, পুলিশি হয়রানি, চুরি এবং চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

ঘ) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত

আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে গেলে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে উত্তরদাতারা মনে করেন – এই বিষয়টিকে জরিপে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের বিষয় পছন্দ ছিল বহু মাত্রিক। পছন্দের ক্রমানুসারে উত্তরগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হল।

প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে (৮৫%), প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে হবে (৬৭.৭%) এবং নির্বাচনী নিরাপত্তার জন্য যথাযথভাবে সেনা মোতায়েন করতে হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দলগুলো যেন দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রসীদের মনোনয়ন না দেয় (৫৬.৯%), নির্বাচনী নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ (৪৫.১%) এবং ভোটার তালিকার ত্রুটি দূর করা (৪৪.৪%)।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কঠোর পর্যবেক্ষণ (৩২.৪%), রেডিও-টেলিভিশনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা (২৫%), বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি (২২%) এবং জন নিরাপত্তা আইন বাতিল (১৭%)।

ঙ) জনতার চোখে একজন আদর্শ প্রার্থী কে?

পছন্দের ক্রমানুসারে উত্তদাতারা এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছেন। সর্বাধিক (৮২%) উত্তর হচ্ছে একজন প্রার্থীকে হতে হবে সৎ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন এমন প্রার্থী পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকে রয়েছেন (৬৪%) এবং তারপরে (৬৩%) রয়েছে প্রার্থীকে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে হবে।

এসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ইঙ্গিত দেয়। সাংবাদিককে এসব তথ্য ভালোভাবে যাচাই করার পাশাপাশি যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করতে হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া

আলিমুল হক ও আব্দুর রাজ্জাক খান

স্বাধীনতার পর প্রায় তিন দশক এদেশের মানুষ 'ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া' বলতে বুঝেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে (মাঝখানে বেশ কয়েকবছর বাংলাদেশ বেতার 'রেডিও বাংলাদেশ' নামে পরিচিত ছিল)। দুটো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং আছে। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন ও একটি বেসরকারি রেডিও জনগণের দুয়ারে পৌঁছেছে; ইথারে ভেসে আসছে বাংলাদেশভিত্তিক দুটো বাংলা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালাও। শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই আরো এক বা একাধিক বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার

জে জি ব্লামলার ও ডেনিশ ম্যাককুয়েল বলেছেন, "যার বাড়িতে টেলিভিশন ও রেডিও দুটোই আছে সে নির্বাচন সংক্রান্ত খবরাখবর ও অনুষ্ঠানমালার জন্য প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করে টেলিভিশনের ওপর।" আসলে শুধু নির্বাচনের সময়ে নয়, টেলিভিশন সব সময়ই রেডিওর তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়। টেলিভিশন নিয়ে কথাও তাই রেডিওর তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার– দুটো মিডিয়াই প্রায় সবসময় বস্তুনিষ্ঠ গণমাধ্যম হিসেবে নয় সরকারের প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে অনেকে তুলনা করেন আলাদিনের অনুগত দৈত্যের সঙ্গে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় তখন এ মাধ্যম দুটো সে সরকারের অনুগত সেবক হিসেবে কাজ করেছে, সে সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হোক বা না-হোক। এ 'সেবক' শুধু সংশ্লিষ্ট সরকার প্রধান ও মন্ত্রী-মিনিষ্টারদের কথা বলে, তাদের ছবি দেখায়। বিরোধীদল বা বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীরা এর কাছে 'অচ্ছুত'।

এরশাদ সরকারের পতনের পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা গিয়েছিল। "রেডিও এবং টেলিভিশনকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করিতে হইবে যাহাতে এই দুইটি গণমাধ্যম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব কয়টি দল যাহাতে রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারের অবাধ সুযোগ পাইতে পারে তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে।" এরশাদের

www.pathagar.com

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত তিন রাজনৈতিক জোটকর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৯৯০ সালের নভেম্বরের যৌথ ঘোষণায় একথা বলা হয়েছিল। ওই ঘোষণা স্বাক্ষরিত হবার পর দশ বছর গত হয়েছে, যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষরদানকারী বিএনপি পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেছে এবং আরেক স্বাক্ষরদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরের পাঁচ বছর দেশ চালিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন নিয়ে গঠিত জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ আজও 'স্বাধীন' হয়নি, হয়নি 'নিরপেক্ষ'।

অবশেষে 'স্বায়ত্তশাসন'

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল। যার অর্থ এই মাধ্যম দুটো সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সাবেক সচিব এম আসাফউদ্দৌলাকে চেয়ারম্যান করে বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ১৯৯৭ সালে সরকারের নিকট কিছু সুপারিশমালা পেশ করে। কমিশনের সুপারিশের মূল কথা ছিল: বেতার ও টিভি তথ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না; বেতার-টিভি পরিচালনা করবে একটি জাতীয় সম্প্রচার কমিশন যার চেয়ারম্যান ও পাঁচজন সদস্যকে নিয়োগ দেবেন প্রেসিডেন্ট; চেয়ারম্যানের পদটি হবে সাংবিধানিক; সম্প্রচার কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয় নয় বরং তথ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক 'সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র কাছে জবাবদিহি করবে, ইত্যাদি।

তিন বছর কমিশনের রিপোর্ট রাষ্ট্রীয় গোপন দলিল হিসাবে রাখার পর গত ৭মে, ২০০১ তারিখে 'বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' ও 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' নামে দুটো খসড়া বিল মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং ১২ জুলাই সংসদের শেষ অধিবেশনে এই আইন দুটো পাস হয়।

এই নতুন আইন অনুযায়ী সরকার এখন বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন নামে দুটো আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য থাকবেন যাদের নিয়োগ করবে সরকার; সরকার যে কোনো সময় তাদের বরখাস্ত করতে পারবে; এবং সরকার অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী 'স্বায়ত্তশাসিত' বেতার ও টেলিভিশন সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করবে।

'বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' ও 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। বেতার টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক সচিব এম আসাফউদ্দৌলা ৩ জুলাই বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতির বিপরীত নয়, স্বায়ত্তশাসন কমিশনের দেয়া সুপারিশমালারও বিপরীত। তিনি আরও বলেন, কমিশন বেতার ও টিভিকে একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল। তাই একে কোনো মন্ত্রণালয়ের অধিনে দেয়া যাবে না। বেতার টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকার মনোনয়ন দিলে তা কখনোই নির্দলীয় হবে না বরং অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব পড়বে। কমিশন এমন একটি স্বায়ত্তশাসিত বেতার-টিভির সুপারিশ করেছিল যেখানে সংবাদের গুরুত্ব অনুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রচার করা হবে। কিন্তু নতুন আইনে তা সম্ভব নয়। যার কারণে

www.pathagar.com

আসাফউদ্দৌলার মতো অনেকেই এই স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও ও স্যাটেলাইট চ্যানেল

একুশে টেলিভিশন এদেশের প্রথম (২০০১ সালের জুলাই পর্যন্ত একমাত্র) বেসরকারি টেলিভিশন। এর সম্প্রচার শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল। বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও অভিযোগ রয়েছে যে আওয়ামী লীগের উপরমহলের মর্জি অনুসারেই এটি চলে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনা কোনো রকম রাখ ঢাক না করেই বলেছেন, "একুশে টেলিভিশনের সব কিছু আমিই করে দিয়েছি। এর নামটিও রেখেছি আমি" (যায়যায়দিন, ২৬/১১/২০০০)। তবে একুশে টেলিভিশন বিরোধীদলের খবরাখবর কিছুটা হলেও প্রচার করে এবং উপযুক্ত প্রতিযোগী না থাকায় ইতিমধ্যে এ বেসরকারি টেলিভিশন যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও 'রেডিও মেট্রোওয়েভ' *মেট্রো নিউজ বিট* শিরোনামে শুধু আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রচার করছে। প্রতিদিন সকাল ১০টায় অবশ্য 'তথ্য বিচিত্রা' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রধান প্রধান খবরগুলোর শিরোনাম জানিয়ে দেয়া হয়। এটি জাতীয় সংবাদ প্রচার শুরু করবে বলেও শোনা যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ২৬শে মার্চ সম্প্রচার শুরু করেছিল রেডিও মেট্রোওয়েভ। বর্তমানে প্রতিদিন নয় ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে এটি। আজকের দিন, গ্লোবাল রিদম, রকওয়েভ, আড্ডার টেবিল, আমি ঢাকা বলছি – মেট্রোওয়েভের কয়েকটি অনুষ্ঠানের নাম।

'চ্যানেল আই' ও 'এটিএন বাংলা' বাংলাদেশভিত্তিক দুটো স্যাটেলাইট বাংলা টিভি চ্যানেলের কোনোটিকেই নিয়মিত সংবাদ পরিবেশনের অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে প্রতিদিন বাংলাদেশ টেলিভিশন বা একুশে টেলিভিশনের মতো নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন না করতে পারলেও চ্যানেল দুটো বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সংবাদধর্মী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার করে। এটিএন বাংলার 'প্রেক্ষাপট' 'ঘটনা প্রবাহ' ও চ্যানেল আই-এর 'সরেজমিন' নামক অনুষ্ঠানগুলোর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও নির্বাচন

নির্বাচনের সময় জনগণকে নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য জানানোর দায়িত্ব ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নিতে পারে। বস্তুত তাই নেয়া উচিত (এ ক্ষেত্রে *চ্যানেল আই* ও *এটিএন বাংলার* সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে)। রেডিও ও টেলিভিশনের উচিত নির্বাচনের পূর্বে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর ঘন ঘন অনুষ্ঠান প্রচার করা, যেমন: ভোটারের অধিকার, ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া, ভোটের গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রয়োগ ইত্যাদি। এ ছাড়া ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং নিয়মিতভাবে প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশনও কিছু কিছু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে পারে।

সাধারণভাবে নির্বাচনের পূর্বে আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার সুযোগ দেয়া হয় (*একুশে টেলিভিশন* এবং রেডিও *মেট্রোওয়েভও* হয়তবা সামনে সে সুযোগ দেবে)। গত নির্বাচনে

www.pathagar.com

আমরা এ ধরনের নজির দেখেছি। তবে সে ক্ষেত্রে রেডিও-টেলিভিশন আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে দলগুলোর নির্বাচনী ওয়াদাসমূহের বিশ্লেষণমূলক কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারত বা পারে। ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ঘোষণার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং টেলিভিশনের খবরে জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের খবরাখবর নিরপেক্ষভাবে প্রচার করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময়ও রেডিও টেলিভিশনের অনুরূপ ভূমিকা ছিল। আগামী নির্বাচনের সময়েও গণমাধ্যমের এ ধরনের ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিক ও প্রযোজকদের এ ব্যাপারে কিছু পূর্ব প্রস্তুতি ও পূর্ব-পরিকল্পনা থাকা উচিত যাতে নির্বাচনে একটি ন্যায্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় । কারণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হলে সমতা বিধানের এই কৃষ্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। বেসরকারি চ্যানেলগুলোর কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এইসব চ্যানেলগুলো নিয়মিত সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক সংবাদ পরিবেশন করে ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নির্বাচনের সময় ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যেমন: প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি বিতর্ক অনুষ্ঠান, জনগণের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা, সংলাপ ও মত বিনিময় অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এমন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থাও নেয়া যেতে পারে সেখানে জনগণের মুখোমুখি হবার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতা বা প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হবে; নেতা বা প্রতিনিধিরা সে অনুষ্ঠানে তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার, কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রশ্নের জবাব দেবেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান নির্বাচনী ওয়াদা ও অন্যান্য মন্তব্য করার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের আরো বেশি স্বচ্ছ ও বাস্তববাদী হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের হালচিত্র ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়াতে তুলে ধরা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা ও অন্যান্য কর্মীদের অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্পর্শে থেকে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করে যেতে হবে। এ ছাড়া নিজেদের উদ্যোগে নিজেদেরই নির্বাচনী সংবাদ স্টুডিওতে পাঠানোর জন্য ইলেক্‌ট্রনিক গণমাধ্যমগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও আহবান জানাতে পারে।

রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণাকালে একটি রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন স্থানের ভোটারদের কাছে একই সময়ে একই বার্তা নিয়ে হাজির হতে পারে। ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়ার এ সুবিধাকে পুঁজি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রেডিও টেলিভিশনের 'সম্প্রচার সময়' রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিক্রিও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগ্রহী দলগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের নির্বাচনী-বার্তা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

ভোট গণনা শুরু হলে ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সবসময় প্রশ্ন দেখা দিলেও নির্বাচনের ফলাফল দ্রুত পাবার জন্য জনগণকে ওই মাধ্যম দুটোর ওপর বরাবরই নির্ভর করতে দেখা গেছে। আগামী নির্বাচনের সময় এ

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বেসরকারি রেডিও-টেলিভিশন দুটোর ওপর জনগণের নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি হবার কথা। জনগণের এই নির্ভরশীলতার কথা মাথায় রেখে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর উচিত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ঘন্টায় ঘন্টায় বিশেষ বুলেটিন প্রচার করা। পাশাপাশি রেডিও-টেলিভিশনের উচিত নির্বাচনী সন্ত্রাস, অনিয়ম ও যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা; উচিত সকল প্রার্থীই যাতে যথাযথ ট্রিটমেন্ট পান তা নিশ্চিত করা। নির্বাচনী বুলেটিনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে বিজয়ী, নিকটতম প্রার্থী বা অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত প্রার্থীর পরিচিতি বুলেটিনে তুলে ধরা যেতে পারে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বুলেটিনে পর্যাপ্ত দৃশ্যচিত্রও থাকা উচিত। ভোট গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাক্ষাৎকার সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত (বা তথাকথিত স্বায়ত্বশাসিত) রেডিও-টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের সরকারি নীতির বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ অত্যন্ত কম, বেসরকারি রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিকদের ওপরও আছে নানামুখী চাপ। কিন্তু যেসব সাংবাদিক এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন তারা চেষ্টা করলে তা করতে পারেন। তারা নিজেদেরকে সেন্সরকারীর ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখতে পারেন এবং নির্বাচনী খবরাখবরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসারে নির্বাচনের বিভিন্ন খবরাখবরের ট্রিটমেন্ট সংবাদমূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত - এ নীতিতে অটল থাকাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

মিডিয়া মনিটরিং

ওয়াশিংটন ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনষ্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (এনডিআই) এর ভাষ্য হচ্ছে:

"Media monitoring should begin with an analysis of government action, or its failures, to ensure the media's right to gather and impart information this analysis should focus upon the media's ability to criticize activities or inaction of the government and governing party, to investigate corruption and the operate independently of political pressures.... The analysis should also consider truly significant developments affecting press freedom in the country's recent history. This is necessary where such developments are likely to be reflected in the media's approach to election campaign reporting."

মনিটরিং-এর সময় নিম্নোক্ত নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলো চিহ্নিত এবং রেকর্ড করার ওপর NDI জোর দিয়েছে: আইনানুগ বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ সরকারি সেন্সরশিপ ও হস্তক্ষেপ; পরোক্ষ সেন্সরশিপ; নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাদের বৈধ ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সংবাদ মাধ্যমকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণ; রাজনৈতিক চরমপন্থী বা রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণ থেকে সাংবাদিকদের রক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতা; ঐ ধরনের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণের ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে সরকারের ব্যর্থতা; এবং সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব সেন্সরশিপ।

রেডিও-টেলিভিশন মনিটরিং

NDI এর মত হচ্ছে, সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং বিভিন্ন সম্প্রচার সময়ে প্রচারিত প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানের সময় পর্যালোচনা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মনিটর থাকা উচিত। মনিটর-পক্ষপাতি (monitor bias) চিহ্নিত করে তা দূর করতে প্রতিটি প্রোগ্রাম একাধিক ব্যক্তিকর্তৃক মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন। মনিটরিং-এর জন্য অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রোগ্রামসমূহ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: নির্বাচনী-বার্তা প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের সরাসরি যে সুযোগ দেয়া হয় (বিনা পয়সায় অথবা পয়সার বিনিময়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে); সংবাদ পরিবেশনা; প্যানেল আলোচনা, প্রার্থী সাক্ষাৎকার ও বিতর্কের মত বিশেষ তথ্যভিত্তিক প্রোগাম; সরকার বা কোনো নির্দলীয় নাগরিক বা সংস্থাকর্তৃক তৈরি ও প্রচারিত ভোটার শিক্ষাকার্যক্রম। বিনোদনমূলক বা অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানও পর্যালোচনার জন্য হাতে নেয়া যেতে পারে। কারণ অনেক সময় চতুরতার সাথে নির্বাচনী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সব অনুষ্ঠান ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কোনো প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধিকে উপস্থাপন করে বা নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক প্রতীক, শ্লোগান বা গান-বাজনা ব্যবহার করে বিনোদনমূলক বা সাধারণ অনুষ্ঠানকেও নির্বাচনী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাংলাদেশে অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনোদনমূলক বা অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ব্যক্তিত্বকে গালাগালি করা বা তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা থেকে শুরু করে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টাও করা হতে পারে।

প্রোগ্রাম মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান কি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে? সকল প্রার্থী কি সেখানে সমান সুযোগ ভোগ করছেন?
- মান এবং সম্প্রচার সময়ের অংশ কি তারা সমানভাবে (অথবা তাদের মর্যাদা অনুপাতে) পাচ্ছেন? নিজেদের বক্তব্য অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় কি তাদের দেয়া হচ্ছে?
- বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে সময় বরাদ্দ করার নীতি কি যথাযথ ও নিরপেক্ষ?
- সম্প্রচার সময়ের মূল্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থী কি বিশেষ কোনো সুবিধা ভোগ করছেন?
- বিভিন্ন দল বা প্রার্থীর সংবাদপ্রচারের মধ্যে কোনো ভারসাম্যহীনতা আছে কি? (উল্লেখ্য,প্রতিটি দল বা প্রতিজন প্রার্থীর জন্য ব্যয়িত সম্প্রচার সময়ের প্রতিটি সেকেন্ডের হিসেব রাখার প্রয়োজন হতে পারে)।
- কোনো কোনো প্রার্থীকে কি সরাসরি সম্প্রচারিত দৃশ্যচিত্র বা বিশেষ ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা দেয়া হচ্ছে যা থেকে অন্যান্যরা বঞ্চিত?
- সংবাদ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কি কোনো কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে যা কোনো নির্দিষ্ট দল বা প্রার্থীর জন্য উপকারি বা ক্ষতিকর (এ ধরনের কূট কৌশলের মধ্যে আছে ক্যামেরার কলা-কৌশল, সম্পাদনা কৌশলের ব্যবহার, কোনো প্রার্থী বা দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল বা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অপ্রমাণিত

www.pathagar.com

তথ্যাবলী প্রচার ইত্যাদি)? উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো অনির্ভরযোগ্য মতামত জরিপের ফলাফল প্রচার করা হচ্ছে কি যে জরিপের ফলাফল প্রচার কোনো দল বা প্রার্থীর জন্য সুবিধাজনক বা ক্ষতিকর?

- সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা সংবাদ হবার যোগ্য সরকারি কার্যক্রম এবং ঐ কর্মকর্তাদের দ্বারাই নির্বাচনী প্রচারভিযানের কার্যক্রম-এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে কি মিডিয়া রিপোর্টিং ব্যর্থ হয়েছে?
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা উপস্থাপক কি সাক্ষাৎকার, বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠানে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী বা দলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন?
- ভোটারদের শিক্ষিত করার জন্য পর্যাপ্ত ও সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানমালা আছে কি? একজন সাধারণ মানের ভোটার কি এ সব অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হতে পারবে?
- এক বা একাধিক অনুষ্ঠানে কি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের চেষ্টা করা হয়েছে?

১৯৯১ সালের নির্বাচন: রেডিও টেলিভিশন মনিটরিং

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের সময় রেডিও বাংলাদেশ (তৎকালীন) ও বাংলাদেশ টেলিভিশনকে মনিটর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

সমন্বয় পরিষদের গবেষণা অনুসারে, ইলেনথট্রনিক মিডিয়া তখন নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দলকেই নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে সে সময় টেলিভিশন বিএনপি'র বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার খবরাখবর প্রচারের সুষম ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় ছিল অতিরিক্ত সতর্ক। টেলিভিশনের ঐ প্রচেষ্টা জনগণকে কমবেশি বিরক্ত করেছিল।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে শুধু ১৮টি দলের প্রতিনিধিরা টেলিভিশনের মাধ্যম ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার সুযোগ পান। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের টেলিভিশনের মাধ্যমে বক্তৃতা করার সুযোগ প্রদানে কর্তৃপক্ষ সংগত কারণেই অপারগ ছিল। তবে এটা সত্য যে কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের জাতীয় পার্টিকে টেলিভিশনে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ থেকে অনাকাঙ্খিতভাবে বঞ্চিত করেছিল। পরবর্তী কালে নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

অনুষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তখন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট স্বাধীন ছিল। ফলে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচারের জন্য বরাদ্দকৃত সম্প্রচার সময়ে নাটক, প্রামাণ্যচিত্রের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানমালাও সংযোজিত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায়নি।

১৯৯১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে পহেলা মার্চ পর্যন্ত টেলিভিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ ও অনুষ্ঠানাদির জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের হিসেব দেখানো হয়েছে ১নং সারণীতে। উক্ত সময়কালটা গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে টেলিভিশনে বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়া শুরু হয়।

www.pathagar.com

সারণী নং- ১: ১৯৯১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে পহেলা মার্চ পর্যন্ত টেলিভিশনের মোট সম্প্রচার সময়ের হিসাব:

	কাল-পরিমাণ			
	ঘন্টা	মিনিট	সেকেন্ড	সর্বমোট সম্প্রচার সময়ের %
মোট সম্প্রচার সময়	১৮২	১১	০৮	১০০%
নির্বাচন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	১৯	৪৯	৩৩	১০.৮৮
নির্বাচন ফলাফল ঘোষণার কাজে ব্যয়িত সময়	১৪	০১	৪০	০৭.৭০%
প্রতিদিনের সাধারণ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	১১৯	৫৮	৫৪	৬৫.৮৬%
সংবাদের জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	২৮	২১	০১	১৫.৫৬%

সারণী নং- ২: নির্বাচনসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সময়

	কাল-পরিমাণ			
অনুষ্ঠানমালা	ঘন্টা	মিনিট	সেকেন্ড	সর্বমোট সম্প্রচার সময়ের%
রাজনৈতিক দলের নেতা, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ বাবদ ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০৯	৫৫	৪৫	৫০.০৮%
নির্বাচনের ওপর নির্মিত প্রমাণ্য চিত্রের জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০২	৫৭	৩০	১৪.৯২%
নির্বাচনের ওপর নির্মিত নাটকের জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০১	২১	০০	০৬.৮১%
নির্বাচনী নিয়ম-কানুন, ভোটিং শ্লোগান এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ঘোষণার জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০১	৩৭	৫৩	০৮.২৩%
নির্বাচনের ওপর নির্মিত বিজ্ঞাপন, শ্লোগান ও tell-off সম্প্রচারে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০২	১২	১০	১১.১১%
নির্বাচনের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয়িত সর্বমোট সময়	০১	৪৫	১৫	০৮.৮৫%

১নং ও ২ নং সারণী ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। এখানে যে তথ্যাদি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৫ মিনিট করে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ৫মিনিট বেশি সময় নিয়েছিলেন। অন্যান্য দলের নেতারা বক্তৃতার জন্য বেঁধে-দেয়া সময়সীমার মধ্যে বক্তব্য শেষ করেন।

www.pathagar.com

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মুজাফফর) এর নেতা বক্তৃতা শেষ করেন সর্বনিম্ন ১৫ মিনিটে।

আলোচ্য নির্দিষ্ট সময়ে (৯ই ফেব্রুয়ারী হতে পহেলা মার্চ পর্যন্ত) নির্বাচনের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের অংশ বাবদ যে সময় (১৯ ঘন্টা ৪৯ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড) ব্যয়িত হয়েছে তা ছিল ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সর্বমোট সম্প্রচার ঘন্টা অর্থাৎ সম্প্রচার সময়ের শতকরা ১০.৮৮ ভাগ। এ ক্ষেত্রে সংবাদপাঠের সময় ও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় বিবেচনা করা হয়নি। কারণ ওগুলো ছিল টেলিভিশনের গতানুগতিক অনুষ্ঠান।

এছাড়া টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ সংবাদ-বুলেটিন ও বিশেষ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জন্য কিছুটা সময় ছেড়ে দিয়েছিল। তবে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা নির্মিত একটি ভোটার শিক্ষাচিত্র সম্প্রচার না করে বাংলাদেশ টেলিভিশন বাতিল করে দেয়।

মোটকথা, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে) বাংলাদেশ টেলিভিশন বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ স্বাধীন ছিল এবং সে সব অনুষ্ঠান অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন: রেডিও-টেলিভিশন মনিটরিং

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় ফেমা (ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স) রেডিও ও টেলিভিশন মনিটর করে। ফেমা-র পর্যবেক্ষণ অনুসারে:

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর গণমাধ্যমের ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সেন্সরশিপ দেখা যায়নি; (২) রেডিও ও টেলিভিশনে সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার প্রচারের সুযোগ দেয়া হয় (জাতীয় পার্টীর নেতা এরশাদকে অবশ্য রেডিও টিভিতে ভাষণ দিতে দেয়া হয়নি); (৩) নির্বাচন সম্পর্কিত শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করে টেলিভিশন প্রশংসা কুড়ায়; (৪) রেডিও বাংলাদেশ (বাংলাদেশ বেতার) ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করলেও অনেকক্ষেত্রে অনেকগুরুত্বপূর্ণ খবর একেবারেই প্রচার করতে ব্যর্থ হয়।

ফেমা ১৯৯৬ সালের ২২শে মে থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত রেডিও বাংলাদেশের রাত ৯টার বাংলা সংবাদ মনিটর করে। মনিটরিং-এর ফলাফল ৩ নং সারণীতে তুলে ধরা হল:

সারণী নং-৩: রেডিও বাংলাদেশের সংবাদে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের হিসাব (সেকেন্ডে):

সপ্তাহ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	জামাতে ইসলামী	অন্যান্য
প্রথম সপ্তাহ	১২৩.৯৬	১৫৯.৮৭	৬৫.৭২	১০৭.৭২	১১৪.১৩
দ্বিতীয় সপ্তাহ	১৭৬.৮৯	১৭৮.২৬	৫৯.৪১	১১৪.৪৯	১৮৫.৩১
তৃতীয় সপ্তাহ	১১৭.৭১	১৪৫.০৮	৮০.০৬	১১৭.২১	২৬১.৯৫
মোট	৪১৮.৫৬	৪৮৩.২১	২০৫.১৯	৩৩৯.৪২	৫৬১.৩৯

www.pathagar.com

ফেমা ১৯৯৬ সালের ২রা জুন থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত প্রচারিত টেলিভিশনের রাত ৮টার বাংলা সংবাদ মনিটর করে। মনিটরিং-এর ফলাফল ৪নং সারণীতে তুলে ধরা হল:

সারণী নং ৪: বিটিভির মূল বাংলা খবরে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের হিসাব (সেকেন্ডে)

ক. সংবাদ (ছবি ছাড়া ও ছবিসহ)

	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	জামাতে ইসলামী	অন্যান্য
দ্বিতীয় সপ্তাহ (৪দিন)	২৬৮.৫৪	২৩১.২২	১৫৭.৯৭	১৩৮.১৯	৬২৪.০৯
তৃতীয় সপ্তাহ (৫ দিন)	২০১.৪২	২৩২.৮২	১৯৬.৮২	১১৭.২৪	৪৭৫.০২
মোট	৪৬৯.৯৬	৪৬৪.০৪	৩৫৪.৭৯	৩১৫.৪৩	১০৯৯.১১

খ. সংবাদ (শুধু ছবিসহ)

	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	জামাতে ইসলামী	অন্যান্য
দ্বিতীয় সপ্তাহ (৩দিন)	৪১.২১	১২৪.৬৫	৩৩	০	২১.৬
তৃতীয় সপ্তাহ (৫ দিন)	৩৮.৭২	৮২.০৭	০	০	১০০.৫৩
মোট	৭৯.৯৩	২০৬.৭২	৩৩	০	১২২.১৩

ফেমার মনিটরিং থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঐ নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য রাত ৮টার বাংলা সংবাদে যে মোট সময় বরাদ্দ করে তার শতকরা ১৭.৪, ১৭,২, ১৩.১, ১১.৭ ও ৪০.৭ ভাগ পেয়েছে যথাক্রমে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত ও অন্যান্য দল।

অন্যদিকে ফেমার মনিটরিং সময়কালে রেডিও বাংলাদেশ রাত ৯টার বাংলা সংবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য সর্বমোট যতটুকু সময় রেখেছিল তার শতকরা ২০.৮, ২৪.১, ১০.২, ১৬.৯ ও ২৮.০ ভাগ পেয়েছে যথাক্রমে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত ও অন্যান্য দল।

শেষ কথা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়টুকু রেডিও বাংলাদেশ (বাংলাদেশ বেতার) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর খবরাখবর প্রচারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের চেষ্টা করে। বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দুটো বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারদ্বয়ের আমলে রাজনৈতিক দলগুলোকে যে ফেয়ার ট্রিটমেন্ট দিয়েছে তার কৃতিত্ব ঐ সরকার দুটোর ওপরই বর্তায়। সেক্ষেত্রে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বেতার-টেলিভিশনের পক্ষপাতহীনতা নিশ্চিত করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সচেষ্ট হবেন বলে সবার প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

যদিও বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনকে 'বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন,২০০১' ও 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' এর মাধ্যমে বিতর্কিত স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।

References

Bangladesh: Parliamentary Election 1996 Observation Report, CCHRB.

Blumler, Jay G. and Mcquail, Denis. Television in Politics: its uses and influence.

Fair Election Monitoring Alliance (FEMA), Bangladesh Parliamentary Election, June 12, 1996.

Head, Sydney W. World Broadcasting Systems: A Comparativ Analysis.

Jai jai din, December 26, 2000

Mcrloe, Patrick. 1994. Monitoring Media Fairness in Election Campaigns: An Introduction to Basic Issues. National Democratic Institute for International Affairs. Washington, USA.

Timm, R.W. and Gain, Philip. CCHRB, 1991. Election Observation Report, Election to the 5th parliament, 1992.

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

ফিলিপ গাইন ও শিশির মোড়ল

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশে এখন আর নতুন কোনো ধারণা নয়। শুরুতে আশির দশকের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। সার্ক গ্রুপও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ দেখায়। ইউরোপ, জাপান এবং কানাডার বিভিন্ন দলকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি দৃশ্যপটে দেখা যেতে থাকে। দেশের বাইরের বা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি বাংলাদেশের কিছু কিছু পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে।

বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় ১৯৮৬ সালে। বিচারপতি কে এম সোবহানের আহবানে "পিপল্‌স কমিশন ফর ফ্রি ইলেক্‌শনস" এরশাদ সরকারের আমলে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সূচনা হয়। এ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে তিনজন ছিলেন বিদেশী। এরা হলেন লর্ড এন্নালস (বৃটেনের হাউজ অব লর্ডস-এর লেবার পার্টির এমপি), ব্রাণ্ড ব্রাভো (হাউজ অব কমনস-এর কনসারভেটিভ পার্টির এমপি) এবং বিবিসি সংবাদাতা ডেভিড লে (সোবহান ১৯৯১: ২০)। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পর ওই ক্ষুদ্র দলটি সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের রিপোর্ট পেশ করে বলে, নির্বাচনে ভোটারদেরকে প্রচণ্ড ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। পরিকল্পিত কারচুপি এবং অস্ত্রের ব্যবহারের কারণে জনগণ তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি।

১৯৮৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা মানবাধিকারকর্মী, উন্নয়নকর্মী এবং সাংবাদিকদের একটি দল নিয়ে ঢাকার নিকটবর্তী নরসিংদীতে একটি সংসদীয় উপনির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। জাতীয় পার্টির এক সাংসদের মৃত্যুতে এ আসনটি শূন্য হয়েছিল।

সংগঠিতভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রথম হয় ১৯৯০ সালে এরশাদ আমলের শেষ দিকে উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এ সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রধান দলটি তৈরি করে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ)। দশটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৮০০ পর্যবেক্ষক সমন্বয় পরিষদের হয়ে ৬৭টি কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে "সত্যিকার নির্বাচন" এবং "অবাধ ও মুক্ত ভোটদান

www.pathagar.com

পদ্ধতির" যে আহবান জানানো হয়েছে (২১ ধারার ৩ উপধারা) তার বাস্তবায়ন বাংলাদেশে কতটুকু হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্যই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ জড়িত থাকায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় (টিম এবং গাইন, ১৯৯০)।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ওই একই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল। এগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনষ্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (এনডিআই), শ্রীলংকা ভিত্তিক সার্কভুক্ত দেশগুলোর একটি প্রতিনিধিদল এবং বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের একটি দল অন্যতম।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হবার পর দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি সমন্বয়ক সংস্থা ছিল বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) এবং বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন (বামনা)। বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন উন্নয়ন এনজিওগুলোর সমন্বয়ক সংস্থা এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্র দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে, যেমন: বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা এবং গণতান্ত্রিক উদ্যোগ। স্থানীয় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে এবং গণমাধ্যমে তাদের কাজকর্মের খবর ছাপা হয়।

বেশ কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। এর মধ্যে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনষ্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (এনডিআই), কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল, ব্রিটিশ এবং জাপানী দল অন্যতম। এছাড়া বিদেশী দূতাবাসগুলোর কয়েকটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেয়। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা ছিল সব মিলে শ'খানেক। মূল পর্যবেক্ষণকারীদলগুলো এবং এনডিআই তাদের পর্যবেক্ষকদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীর মতো বড় রাজনৈতিক দলসহ কোনো বামপন্থী দল অংশগ্রহণ করেনি। তারা এই নির্বাচন শুধু বর্জনই করেনি বরং নির্বাচন প্রতিহত করারও চেষ্টা চালায়।

বিএনপি ব্যপক সংখ্যাগরীষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হয় এবং দাবি করে যে বিপুল সংখ্যায় মানুষ ওই নির্বাচনে ভোটদান করে। দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষক দল যারা সীমিত মাত্রায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেয় তারা বলে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ), ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও প্রকাশ করে।

এনডিআই এবং যুক্তরাজ্যের ইলেকটোরাল রিফর্ম সোসাইটি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে (FEMA,1996)। "অবাধ ও সুষ্ঠু" বলতে যা বোঝায় তা ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে প্রযোয্য নয় বলে পর্যবেক্ষকরা অভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চারমাস পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে দেশী-বিদেশী বহু পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আবির্ভূত হয় ফেমা। ফেমার দাবি অনুযায়ী ১৭৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০,০০০ জন সেচ্ছাসেবী দেশের প্রায় সবগুলো কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ৬৪টি জেলায় ১৫০টি আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। সমন্বয় পরিষদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কাউন্সিলের মোট ৪০৫০ জন সদস্য পর্যবেক্ষণে অংশ নেন।

জানিপপ, অধিকার, বাংলাদেশ হিউম্যান রাইট্স কমিশনসহ মোট ২৯টি দেশী প্রতিষ্ঠান বা জোট পৃথকভাবে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

সপ্তম সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য বিদেশী দলগুলোর মধ্যে ছিল এনডিআই, কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদল, জাপানী পর্যবেক্ষকদল, কানাডীয় পর্যবেক্ষকদল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এদের সংখ্যা আড়াইশ'র বেশি ছিল।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের বৈধতা

কিছুদিন আগ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বা সরকার স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ১৯৯০ সালে উপজেলা নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সরকারি অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পরিষদের একটি দল দেখা করলে মন্ত্রী বলেন তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামাল দেয়া। অনুমতির জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যেতে বলেন মন্ত্রী মহোদয়।

"নো অবজেকশন সার্টিফিকেট" (এনওসি)- এর জন্য বামাসপ যে আবেদন করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তার উত্তর দেন। তাতে উপজেলা পরিষদ (চেয়ারম্যান নির্বাচন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-র ২৮ নম্বর ধারার (রুল) উল্লেখ করে বলা হয় ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ভোটার, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্ট ছাড়া আর কে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে তা নির্ধারণ করবেন প্রিসাইডিং অফিসার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পর্যবেক্ষকদের এই ধারার সুযোগ গ্রহণ করে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নেবার পরামর্শ দেন। কমিশনের অনুমতি না পেয়ে বেশ কিছু এনজিও কর্মী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে বিরত থাকেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ, যিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবীতে কারাগারে যান, ২৫,০০০ বিদেশী পর্যবেক্ষককে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন স্থানীয় পর্যবেক্ষক দলগুলো অনুমতি চাইল তখন তাঁর সরকার খুব একটা সহযোগিতা করেনি।

www.pathagar.com

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলাকালে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সরকারি আতিথেয়তা এবং সহযোগিতা পেয়েছেন। সহকারী বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সব ধরনের সহযোগিতার নির্দেশ দেয় (টিম এবং গাইন, ১৯৯১: ২০)। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র দেয়া হয় এবং তাদের গাড়ীতে স্টিকার লাগানো হয়। অন্যদিকে হাজার হাজার স্থানীয় পর্যবেক্ষকদেরকে সরকারি অনুমতি ছাড়াই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সরকারের মতে নির্বাচনী আইনে পর্যবেক্ষণের কোনো বিধান নেই।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরেও পর্যবেক্ষকদল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সরকারি স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে থাকে এবং ১৯৯৪ সালে একত্রে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করে। নির্বাচন কমিশন এই জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি এবং পরিচয়পত্র দেবার প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেও শেষাবধি তা দেয়নি। বিএনপির এক নেতার অভিযোগ ছিল স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়কগণ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি যুক্ত। এ অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি এবং পরিচয়পত্র দেয়া থেকে বিরত থাকে।

যাহোক, নির্বাচন কমিশন বিদেশী মিশন এবং কিছু ছোট ছোট সংগঠনকে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দিয়ে পরিচিতি মূলক ২২টি কার্ড দিয়েছিল। বামাসপ, বামনা এবং ছোট ছোট কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ৪৫০ জন পর্যবেক্ষককে কোনো কার্ড দেয়া হয়নি। তাদের বলা হয়েছিল অফিসিয়াল অনুমতি ছাড়াই তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কিছু সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক, যাদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিচয়পত্র দেয়া হয়, অভিযোগ আছে তারা সরকারি দলের সমর্থক ছিলেন।

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদকে ৫টি কার্ড দিতে চায় কিন্তু সমন্বয় পরিষদ তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমন্বয় পরিষদ ৪,০০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যেকোনো সময় তারা হাজার হাজার পর্যবেক্ষক মাঠে নামাতে পারে। এমন প্রতিষ্ঠানকে মাত্র পাঁচটি কার্ড দেয়া ছিল অযৌক্তিক।

১৯৯১ সালে বামাসপ একটি স্বাধীন মতামত জরিপ পরিচালনা করে। এই মত জরিপের ফলাফল অনুসারে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের দ্বারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অধিকতর কার্যকর ও ফলদায়ক। উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই মত ছিল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আইনগত স্বীকৃতি থাকা দরকার। অনেক দেশেই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের আইনগত স্বীকৃতি আছে। যেমন, ফিলিপাইনের নামফ্রেল (টিম এবং গাইন ১৯৯১: ২০)।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষণ কাজটি বেশ কঠিন ছিল। প্রধান বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জন করেছিল। যে গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটে বাংলাদেশ পড়েছিল সেক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বামাসপ, ফেমা বা অন্যান্য যারা এই হস্যকর নির্বাচনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল তারা নির্বাচনের মাত্র দিনকয়েক আগে পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারের অনুমতি পায়।

অবস্থার ব্যপক পরিবর্তন ঘটে সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময়। নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলগুলো স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

নির্বাচন কমিশন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৯টি দেশী পর্যবেক্ষকদলকে পৃথকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়। এদের মধ্যে ফেমা, বামাসপ বা এডাবের মতো নেটওয়ার্কও ছিল।

নির্বাচন কমিশন শুধু অনুমতিই দেয়নি কমিশন তখন পর্যবেক্ষকদের জন্য একটি নীতিমালাও ঘোষণা করে। ওই নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল:

১। পর্যবেক্ষকদের বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে;

২। পর্যবেক্ষকদের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হতে হবে। এ বিষয়ে তাদেরকে নির্বাচন কমিশনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে;

৩। পর্যবেক্ষক তাঁর নিজের এলাকায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন না;

৪। পর্যবেক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয়ভাবে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন অর্জন করতে হবে;

৫। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে হবে;

৬। পর্যবেক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবেন না;

৭। ভোটকেন্দ্রে চলমান নির্বাচনী কাজে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না;

৮। পর্যবেক্ষক কোনোক্রমেই কোনো ভোটকেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করতে পারবেন না;

৯। পর্যবেক্ষণ শেষে যত দ্রুত সম্ভব পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অবগতির জন্য প্রেরণ করতে হবে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাপক সংখ্যায় দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োজিত থাকবে বলে স্পষ্টত ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু অতীতের মতো এবার সব রাজনৈতিক দল তাদেরকে স্বাগত জানায়নি। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক দলের বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। ৩০ জুলাই, ২০০১ তারিখে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মিটিং হয়। ওই মিটিং-এ তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করে যেন স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের বুথে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া না হয়। অন্য আরেক সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তারা স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের বুথে প্রবেশ প্রতিহত করবে। বিএনপি স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের ব্যাপারে অতটা কঠোর না হলেও তারা অভিযোগ করেছে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক দলের আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

যাহোক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্থানীয় পর্যবেক্ষকরা গত দুটো সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুতরাং এবার তাদের বুথে প্রবেশ করার অনুমতি না দেবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে "গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০০১" এর মাধ্যমে নির্বাচনী আইনে যে সংস্কার করা হয়েছে তাতে পর্যবেক্ষকদের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা এখন থেকে নির্বাচন কমিশনের দেয়া ছবি-সম্বলিত পরিচয়পত্র নিয়ে কেন্দ্রের ভিতরে থাকার এবং ভোট গণনা দেখার আইনগত অধিকার লাভ করলেন।

www.pathagar.com

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কিছু সাধারণ কাজ

১। নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু করতে নির্বাচন কমিশন কী উদ্যোগ নেয় তা দেখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পর্যবেক্ষণে রাখা।

২। ভোটার তালিকা তৈরি পদ্ধতিতে এবং ভোটার তালিকায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা প্রকৃত ভোটারদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।

৩। নির্বাচনী আইন এবং সেসবের ফাঁক-ফোকর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং নির্বাচনী আইন কাঠামোর উন্নয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ দেয়া।

৪। উকিল, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, পেশাজীবী, শ্রমিক এবং আরো নানা স্তরের মানুষ নির্বাচনী আইন, প্রচারণা, ভোটদান পদ্ধতি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্ভাবনা– এসব নিয়ে কী ভাবেন তা মতামত জরিপ, গবেষণা এবং ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সন্নিবদ্ধ করা।

৫। নির্বাচনের আগে ও পরে প্রার্থীদের এবং নির্বাচনের দিন ভোটারদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা।

৬। প্রচারণা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়, দুর্নীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা।

৭। প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল আচরণ বিধি মেনে চলে কিনা তা দেখা।

৮। নির্বাচন কেমন হল তার ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করা।

২০০১ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কের দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিপুল সংখ্যায় দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়েজিত থাকবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাতে পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা ২০০,০০০ এর কাছাকাছি হবে।

এর সঙ্গে থাকবে প্রায় ২০০ বিদেশী পর্যবেক্ষক। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (বা ইউএনডিপি)।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডিসেম্বর ১৯, ২০০০ তারিখে ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মিটিং-এ বলেন দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা যেন স্বাধীনভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন উদার থাকবে। তিনি রাষ্ট্রদূতদের আরও বলেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

স্থানীয় প্রধান প্রধান নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী দল

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ)

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) প্রায় দুইশত মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অন্যতম প্রধান নেটওয়ার্ক এই সমন্বয় পরিষদ। ১৯৯০ সালের উপজেলা এবং ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সম্ভবত

www.pathagar.com

সমন্বয় পরিষদই সবচেয়ে দৃশ্যমান ও কার্যকর পর্যবেক্ষকদল হিসাবে পরিচিতি পায়। ১৯৯৬ সালের অসুষ্ঠু ও সুষ্ঠু দুটো নির্বাচনই সমন্বয় পরিষদ পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু অন্যান্য বড় পর্যবেক্ষণ উদ্যোগের কারণে সমন্বয় পরিষদকে অনেকটা ম্লান মনে হয়। যাহোক, সমন্বয় পরিষদ পর্যবেক্ষণ করা প্রতিটি নির্বাচনেরই রিপোর্ট প্রকাশ করে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য সমন্বয় পরিষদ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ৫০ টি জেলার ৭৫টি সংসদীয় আসনের প্রতিটি কেন্দ্রে সমন্বয় পরিষদের কমপক্ষে একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবে বলে পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সমগ্র দেশটিকে ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলপ্রসূ পর্যবেক্ষণের জন্য এর সদস্য সংগঠনের কর্মীদের বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হবে।

সমন্বয় পরিষদ নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পর পরিস্থিতি মূল্যায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। নির্বাচনের পরপরই সমন্বয় পরিষদ একটি তাৎক্ষণিক রিপোর্ট প্রকাশ করবে এবং মাস দুয়েকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

যোগাযোগ

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ)
১/৪ ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: ৯১২৫২৭০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৫২৬৯
ই-মেইল: cchrb@bangla.net

ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা)

মানবিক সাহায্য সংস্থার গবেষণা শাখা স্টাডি এন্ড রিসার্চ গ্রুপ (এসআরজি) ১৯৯৫ সালের ২৪ জুলাই তারিখে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেমার সূচনা করে। এনজিও, পেশাজীবী সংগঠন, ক্লাব এবং ব্যক্তি ফেমার সদস্য। মানবিক সাহায্য সংস্থার গবেষণা শাখা হিসাবে এসআরজি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন প্রক্রিয়া, সংসদ ও বিচার ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার কাজে সহায়তা প্রদান করা।

মানবিক সাহায্য সংস্থা এবং এসআরজি'র মাধ্যমে ফেমা গঠিত হলেও বর্তমানে এটি দেশের প্রধান প্রধান এনজিও, নাগরিক গোষ্ঠী, পেশাজীবী সংগঠন, বিভিন্ন ক্লাব ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি বড় নেটওয়ার্ক। ফেমার প্রধান কাজ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। নির্বাচনী আইন সংস্কার এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও ফেমার কিছু কার্যক্রম আছে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ফেমা প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কমপক্ষে দুইজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। প্রায় দুমাস ধরে নির্বাচন পূর্ববর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিও ফেমার রয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী অবস্থাও ফেমা পর্যবেক্ষণ করবে। এসব কাজ করার জন্য ফেমা জাতীয় পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবে। ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার জন্যও ফেমার কর্মসূচি রয়েছে।

www.pathagar.com

ফেমা ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, পরবর্তীতে সবগুলো উপনির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে এবং পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করে।

ফেমার শুরুর দিকে ওয়াশিংটন ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়ন ফেমাকে বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেবে।

যোগাযোগ

ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা)
বাড়ি: ৯ রোড: ১৭ বনানী, ব্লক-সি, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ৮৮১৬৪৪১-২ ফ্যাক্স: ৮৮১৬৪৪১
ই-মেইল: fema@bol-online.com

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ)

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ) বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কাজ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা।

একজন সচেতন ভোটার ভোট দেবার পাশাপাশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং এর মধ্য দিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন, এরকম একটি উদ্দেশ্য নিয়ে জানিপপ কাজ শুরু করে।

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে জানিপপের ৪০০জন প্রতিনিধি ১২৪টি আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন উপনির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য জানিপপ প্রতি আসনে ৭ জন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ছয়টি বিভাগীয় শহর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনে আরও ৯০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে। জানিপপ পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। জানিপপের সূত্র জানিয়েছেন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্য জানিপপ নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন সময় লবিং করে।

যোগাযোগ

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ)
৭৪,ল্যাবরেটরী রোড (৩য় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৮১২৬১৭২, ০১৭৫৩১৬৫২

www.pathagar.com

নাগরিক উদ্যোগ

একটি স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নাগরিক উদ্যোগ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি আইনের অধীনে ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রেশন নেয়। নাগরিক উদ্যোগ মূলত মহিলাদের অধিকার আদায় এবং রাজনৈতিক ও আইনগত শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য কাজ করছে।

১৯৯৬ সালের সংসদীয় নির্বাচন ও ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জনগণকে বিশেষ করে নারীদের নাগরিক শিক্ষা ও ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নাগরিক উদ্যোগ ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়। টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার ৮টি থানায় তারা এই ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে। এ ছাড়া তারা ১৯৯৬ সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশন পর্যবেক্ষণ ও বস্তিবাসীদের ভোটার তালিকাভুক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপারিশ করে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক উদ্যোগ তাদের ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দেশের ১০টি ইউনিয়ন তারা চিহ্নিত করেছে যেখানে মহিলারা দীর্ঘদিন ভোট দেন না। এগুলো হচ্ছে, পটুয়াখালী জেলার পাঙ্গাশিয়া, ইটবাড়িয়া, জৈলকাঠি ও মাদারবুনিয়া ইউনিয়ন, ঝালকাঠি জেলার সদর ইউনিয়ন, নোয়াখালী জেলার দূর্গাপুর, ফেনি জেলার মহামায়া, মাদারিপুর জেলার কালিকাপুর ও জাউদি এবং ঝিনাইদহ জেলার সুরাট ইউনিয়ন। এসব ইউনিয়নে নাগরিক উদ্যোগ নাটক, ফ্লিপচার্ট এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। এসব এলাকায় গ্রামীণ ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় 'নির্বাচনী গণতন্ত্র ও গ্রামীণ নারী' এবং 'মেয়েদের ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব' এই দুটি বিষয়ে গবেষণার কাজও নাগরিক উদ্যোগ শুরু করেছে।

যোগাযোগ

নাগরিক উদ্যোগ
বাড়ি: ১৯/১ (৩য় তলা), সড়ক: ১৫ (নতুন) ২৮ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা -১২১৫
ফোন:৮১১৫৮৬৮
E-mail: zhossain@dhaka.agni.com

ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

গণমাধ্যম সর্ম্পকিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমএমসি তাদের নিজস্ব কর্মএলাকায় ৭০টি উপকূলীয় আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সাতশ প্রতিনিধি নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। নিজস্ব কর্মএলাকা– নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী, বরগুণা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, ভোলা– ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা আছে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়ে এমএমসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এমএমসির পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে (রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র) ভোটার অধিকার ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচার চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৬ এর সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৯৭ এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

যোগাযোগ

ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

১/২০, হুমায়ুন রোড, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন- ৯১২৫০৭৭, ৮১২৩৪৪৬, ফ্যাক্স- ৮৮০-২-৯১২১৬২৭

ই-মেইল- massline@bangla.net

অধিকার

অধিকার বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেটওয়ার্ক হিসাবে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা তদন্ত করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনমত ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সংগঠন গড়ে ওঠে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন হলেও অধিকার মনে করে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর এসব বিষয়ই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে অনেকাংশে নিশ্চিত করে। অধিকার ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনসহ কয়েকটি উপনির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকার ২০টি আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করেছে।

যোগাযোগ

অধিকার

৩/৬ সেগুন বাগিচা , ঢাকা- ১০০০

ফোন- ৮৮-০২-৯৫৬০১৭৩,

ফ্যাক্স- ৮৮-০২-৯৫৬৭২৮০

ই-মেইল- odhikar@bangla.net; odhikar@yahoo.com

ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (ভোট)

চব্বিশটি এনজিও নিয়ে গঠিত ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (ভোট) অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। জাতীয় প্রেসক্লাবে ২৪ জুলাই, ২০০১ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ভোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভোট সারা দেশের ১৬০ টি সংসদীয় এলাকায় ১৪,০০০ টি ভোটকেন্দ্রে ৫০,০০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। ভোট দাবি করেছে পর্যবেক্ষকদের অর্ধেক হবেন নারী।

ভোট তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ভোটের কার্যাবলী সমন্বয়ের মূল দায়িত্বে থাকবে।

www.pathagar.com

যোগাযোগ
বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
বাড়ী ২৫৫, সড়ক ১৯ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন-৮১১১৩২৩, ফ্যাক্স-৯১২০৬৩৩
ই.মেইল-bnps@bangla.net

ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইএমডব্লিউজি)

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এশিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশীয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষক দল, পর্যবেক্ষক নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি হয়েছে। ৩০ টির মতো প্রতিষ্ঠান এই ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত যার মধ্যে বামাসপ বা ফেমার মতো বৃহদাকার নেটওয়ার্কও রয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ সকল দেশীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য অভিন্ন নির্দেশিকা ও প্রশ্নপত্র করার উদ্যোগ নেয়। একই ধরনের নির্দেশিকা ও প্রশ্নপত্রের অতিরিক্ত বিষয় নিজের প্রয়োজনে যুক্ত করার অধিকার সদস্যদের রয়েছে।

সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি করা এবং ভালোভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কীভাবে করা যায় এই উদ্দেশ্য নিয়ে এশিয়া ফাউন্ডেশন ১৪ মার্চ ও ১২ জুলাই ,২০০১ তারিখে দুটো কর্মশালার আয়োজন করে। মূলত প্রথম কর্মশালা থেকেই ওয়ার্কিং গ্রুপের উৎপত্তি হয়। একই কেন্দ্রে একই সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ এড়ানো, দেশের সবগুলো কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা, পর্যবেক্ষণকে মানসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করতে থাকে ।

ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হবার পর থেকে সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক মতবিনিময় করেছে। এই গ্রুপের পক্ষ থেকে নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৩০ এপ্রিল, ২০০১ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আট দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে।

যোগাযোগ
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন
বাড়ী নং-৩/বি, সড়ক নং-৫০
গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা-১২১২
ফোন-৮৮২৬৯৪১-৪, ৮৮২৪৫০৪

আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৯৯৬ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ২৯ সদস্যের একটি দল বাংলাদেশে

www.pathagar.com

এসেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য, বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিক। ১২ দলে বিভক্ত হয়ে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গাড়ি সংগ্রহ, অনুবাদক বা অন্যান্য সহায়তা তারা পেয়েছিলেন স্থানীয় এনজিও সেন্টার ফর এনালাইসিস এন্ড চয়েস-এর কাছ থেকে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬০ জনের মতো একটি পর্যবেক্ষকদল নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। পর্যবেক্ষকদলে একজন সমন্বয়কারী থাকবেন যিনি সবসময় দলের মুখপত্রের দায়িত্ব পালন করবেন। পর্যবেক্ষকদলে নির্বাচন ও নির্বাচনী আইন বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ থাকবে বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সূত্র জানিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুরো কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে Need Assesment Mission এর রিপোর্টের ভিত্তিতে। ওই মিশন ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সফর করে। নির্বাচন কমিশন, প্রধান রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার আলোকে ইইউ এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে।

ইইউ সূত্র জানায় নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা বা ক্ষমতা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব তারা দিয়েছিল সময়ের স্বল্পতার কারণে নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণে তারা ফেমাকে সহায়তা দেবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুই ধাপে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৪ সদস্যের একটি পর্যবেক্ষকদল নির্বাচনের ৬ সপ্তাহ আগে বাংলাদেশে আসবে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দু'সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে। এটি দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষকদল। বাকি সদস্যরা আসবেন নির্বাচনের দিন কয়েক আগে এবং নির্বাচনের কয়েকদিন পর চলে যাবেন। এটি স্বল্পমেয়াদী পর্যবেক্ষকদল। ৬টি বিভাগেই ইইউ-এর পর্যবেক্ষকরা থাকবেন। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় কমপক্ষে একটি দল থাকবে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবেচনায় স্পর্শকাতর বা সন্ত্রাসকবলিত কয়েকটি আসনে পর্যবেক্ষক থাকবেন।

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি এই পর্যবেক্ষকদলের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিটিং-এর ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদলের সাথে যোগাযোগ রাখলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজস্ব ঘরানায় পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করবে এবং নির্বাচনের পরের দিন এদের পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলনের সম্ভাবনা রয়েছে।

যোগাযোগ
ইউরোপীয় ইউনিয়ন
বাড়ি: ৭ রোড: ৮৪ গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২৪৭৩০, ৮৮১১৪৬৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩১১৮

www.pathagar.com

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (এনডিআই)

মার্কিন সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৩ সালে এনডিআই প্রতিষ্ঠিত হয়, উদ্দেশ্য "যেসব দেশে গণতন্ত্র নতুন এবং যেসব অগণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন চলছে সেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা" (এনডিআই, ১৯৯৫)।

ওয়াশিংটন ডিসিতে এনডিআই'র প্রধান কার্যালয়। তাছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশে এর শাখা অফিস রয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এনডিআই সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় এসবের আয়োজন ছাড়াও প্রযুক্তিগত সাহায্যও দেয়।

১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দল পাঠানেরা মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে এনডিআই-এর সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদল নিয়োগের পাশাপাশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল এনডিআই। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর এনডিআই তার রিপোর্টে নানা উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি ভোটার তালিকা, নির্বাচনী ব্যয়, সমান্তরাল ভোট গণনা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ করেছিল। তখন থেকে এনডিআই নানা কাজের সূত্র ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ফেমা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এনডিআই সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তখন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় এনডিআই অনেকটা অদৃশ্য ছিল।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এনডিআই রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচিও তাদের রয়েছে। নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখার জন্য এনডি আই "প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের" সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদল বাংলাদেশে পাঠাবে। ইউএনডিপির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও এনডিআই স্বতন্ত্রভাবে তার রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

যোগাযোগ
এনডিআই বাংলাদেশ
সড়ক ৩৫, বাড়ী ১-এ, এপার্টমেন্ট এইচ-৪, গুলশান, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন-৯৮৮৩৯৯৮, ফ্যাক্স-৮৮১০৮৪৪
ই.মেইল-ndidhaka@global-bd.net
www.http://www.ndi.org

কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ১২ সদস্যের একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে পাঠায়। এটা ছিল বাংলাদেশে কমনওয়েলথ-এর দ্বিতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। কমনওয়েলথ দলের নেতৃত্ব দেন তান শ্রী মোহম্মদ

www.pathagar.com

ঘাজালি শফি, মালয়শিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলের আন্তর্ভুক্ত ছিলেন বৃটেন, শ্রীলংকা, বাহামা দীপপুঞ্জ, সেন্ট লুসিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, বত্সোয়ানা, সিঙ্গাপুর এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিবর্গ। এসব প্রতিনিধির সকলেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা বা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ছিল।

কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারীদল দুটো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল: প্রথমত নির্বাচনী আইন অনুসারে নির্বাচন হলো কিনা তা দেখা; দ্বিতীয়ত নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হলো কিনা তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাচাই করা (কমনওয়েলথ রিপোর্ট, ১৯৯৭)।

কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, সরকারি কর্মচারী, সাধারণ মানুষজনের সাথে কথা বলে এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মতামত দেয় যে নির্বাচন ছিল "বিশ্বাসযোগ্য" এবং "ব্যালট পেপারের গোপনীয়তা নিশ্চিত ছিল।"

কমনওয়েলথ ১৯৯১ সালে প্রথম বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর নির্বাচনের দুটো বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট এরা প্রকাশ করে। ২০০১ এর জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি তারা ২০০১ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে কিনা।

যোগাযোগ

Commonwealth Secretariat
Marlborough House
Pall Mall, London SW1Y 5HX,UK

সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিজ (আইসিইএস) গ্রুপ

কলোম্ব ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিজ (আইসিইএস) ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আইসিএস-এর চার সদস্যের একটি দল বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতির উপর রাজনৈতিক মতামত যাচাই করার জন্য বাংলাদেশে আসে। ১৯৯০ সালের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় ১১ থেকে ১৭ মার্চ এই দলটি বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতির ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করে। ১৯৯০ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৪ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে।

১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিইএস প্রায় ৩০ সদস্যের একটি দল বাংলাদেশে পাঠায়। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিইএস-এর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা তা জুলাই, ২০০১পর্যন্ত জানা যায়নি।

www.pathagar.com

যোগাযোগ
International Centre for Ethnic Studies (ICES)
8, Kynsey Terrace
Colombo 8, Sri Lanka
Tel: 698049, 685085, 694664
Fax: 549875, 595602, 598315

নির্বাচনী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নির্বাচন বা গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন এবং বই বা মনোগ্রাফ আকারে তা প্রকাশ করেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা একজন গবেষক যে তথ্য সংগ্রহ করেন বা সংরক্ষণে রাখেন তা সাংবাদিকদের কাজে লাগে। আবার অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভোটার শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গেও জড়িত। তারাও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। এতদসংক্রান্ত কিছু প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেসন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা-আলোচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৪ সালে পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেসন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) স্থাপিত হয়। পিপিআরসি প্রতিষ্ঠার পিছনে যারা রয়েছেন তারা ১৯৮৮ সালে নির্বাচনী সন্ত্রাসের ওপর একটি গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শুরু থেকে পিপিআরসি নির্বাচন ও গণতন্ত্র ইস্যুতে নানা ধরনের গবেষণা বা রিপোর্ট প্রকাশনা অব্যহত রেখেছে।

পিপিআরসির এ বিষয়ে প্রধান কাজের মধ্যে রাজনৈতিক জনমত জরিপ (১৯৯১,১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে) এবং প্রার্থী প্রোফাইল তৈরি অন্যতম। ২০০১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে পিপিআরসি কতকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে (ক) জনমত জরিপ– প্রথম জনমত জরিপের ফলাফল ২০০১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ করে। জাতীয় পর্যায়ে ভোটারদের মতামত জরিপের পরিকল্পনা আছে; (খ) প্রার্থীর প্রোফাইল তৈরি; (গ) ভোটার তালিকা ও অস্ত্র নিয়ে সেমিনার আয়োজন; (ঘ) ২০০১ সালের নির্বাচন নিয়ে ওয়েবসাইট স্থাপন(www.electionwatch.com); (ঙ) ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্তির কাজে সাহায্য করা– কয়েকটি জায়গায় ভোটার তালিকার ত্রুটি নিয়ে যে অভিযোগ আছে তা অনুসন্ধান করেছে এবং তালিকা সঠিক করতে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করেছে; (চ) নিউজ লেটার প্রকাশনা– নির্বাচনের সময় নির্বাচন বিষয়ক নিউজ লেটার প্রকাশ করবে।

যোগাযোগ
পিপিআরসি অফিস
বাড়ী ২৬, সড়ক ৯এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা
ফোন-৮১১৯২০৭

www.pathagar.com

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এর প্রতিষ্ঠা ১৯৯৩ সালে। অলাভজনক এই প্রতিষ্ঠানটির গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে কাজ করার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নির্বাচন, পরিবেশ, উন্নয়ন, বহুপাক্ষিক ব্যাংক, মানবাধিকার এসব বিষয় নিয়ে সেড বেশ কয়েকটি গবেষণা কাজ করেছে। এসব বিষয়ে দৃঢ় তথ্য ভিত্তি তৈরি করা সেডের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় নির্বাচনের ওপর সেডের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজ রয়েছে এবং ১৯৯৫ সালে "তথ্যপঞ্জি–নির্বাচনী রিপোর্টিং" (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশ করে। হাল নাগাদ তথ্য দিয়ে সেড গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন রিপোর্টিং-এ দক্ষ সাংবাদিক, একাডেমিক এবং গবেষকরা এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে জড়িত ছিলেন। তাঁদের লেখা সংকলিত করেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যপঞ্জিটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রত্যেকের কাজে লাগবে।

সেডের ডকুমেন্টেসন লাইব্রেরীতে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের ওপর যেসব বই, রিপোর্ট এবং তথ্য সংগৃহীত আছে তা যে কেউ ব্যবহার করতে পারেন। নির্বাচন রিপোর্টিং-এর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া বা এসব বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা সেডের কর্মসূচির অংশ।

যোগাযোগ

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৪/৪/১(বি)(৪র্থ তলা), ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন-৯১২১৩৮৫ ফ্যাক্স-৯১২৫৭৬৪
E-mail: sehd@citechco.net

ডেমোক্রেসি ওয়াচ

ডেমোক্রেসি ওয়াচ ঢাকা ভিত্তিক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দকে গণতন্ত্র সচেতন, নীতিবান ও এ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান "সুশাসন" প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। চার মাসব্যাপী এই কোর্সে রয়েছে "সুশাসন, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক নীতিমালা, মানবাধিকার এবং সংসদের কার্য বিবরণ" এর ওপরে সুস্পষ্ট ধারণা।

ডেমোক্রেসি ওয়াচ ২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটার শিক্ষা, গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ, জনমত জরিপ এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে (১) দেশব্যপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানবাধিকার, সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনের নেতিবাচক প্রভাব এবং নারীর ভোটের গুরুত্ব নিয়ে তিনটি স্লোগান তৈরি ; (২) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম পর্যবেক্ষণ (একুশে টিভি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, রেডিও মেট্রোওয়েভ) এবং ২০০১ সালের জুলাইয়ের শেষ থেকে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ; (৩) পিপিআরসির সঙ্গে

www.pathagar.com

জনমত জরিপে অংশগ্রহণ এবং দেশব্যপী জনমত যাচাই করে তা নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশ; (৪) আসন্ন নির্বাচনে ১০,০০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা ।

যোগাযোগ
ডেমোক্রেসি ওয়াচ
৭ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০
ফোন-৯৩৪৪২২৫-৬
ই.মেইল-dwatch@bdonline.com

খান ফাউন্ডেশন

দেশের গণতন্ত্রের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৮ সালে খান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই লক্ষ্যে পৌছার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে সারা দেশের ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত এই ফাউন্ডেশন প্রায় ২০,০০০ জন মহিলা সদস্য এবং ২,০০০ জন সাধারণ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

এদের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা যেন ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের বাইরেও গ্রামীণ সভাগুলোতে নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এরকম প্রায় ১০,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী দিয়ে খান ফাউন্ডেশন আগামী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে।

যোগাযোগ
খান ফাউন্ডেশন (কেএফ)
৫, মোমেনবাগ, রাজারবাগ, ঢাকা
ফোন-৯৩৩০৩২৩, ফ্যাক্স-৯৩৩১৫৮৯
ই.মেইল-khanfoundation@bd.drik.net

এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব)

এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সবচেয়ে বড় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে এডাব নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করছে। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এডাব ভোটার সচেতনতা শিক্ষা কর্মসূচি এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এডাব এসকল কর্মসূচি আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

www.pathagar.com

২০০১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে এডবের প্রধান কর্মসূচি ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ। এই কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এডাব প্রশিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করেছে। এই মডিউলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করে তাদের সমন্বয়ে একটি 'কোর-ট্রেনার টীম' গঠন করা হয়েছে। এই কোর-ট্রেনার টীম সারাদেশে এডাব-এর ১৭টি অনুসংগঠনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষক বাহিনী গড়ে তুলবে। ১৯৯৬ সালের ভোটার সচেতনতা শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় এডাব ১৫ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে এক কোটি ভোটারকে সচেতন করেছিল বলে দাবি করে। এবার দুই কোটি ভোটারকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে বলে এডাব জানিয়েছে। এডাবের সদস্য সংগঠন ছাড়াও নাগরিক সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।

এডাবের প্রশিক্ষণ উপকরণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্টিকার, প্রচার পুস্তিকা, সদ্য সাক্ষরদের জন্য পুস্তিকা, নানা প্রকার পোস্টার, নির্বাচনের গানের ক্যাসেট, টেলিভিশনে প্রচারের জন্য ভিডিও ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ উপকরণের মূল বক্তব্য গণতন্ত্র কী ও কেন; গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে সম্পর্ক; ভোট কী এবং ভোট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী; স্থানীয় সরকারের স্তরসমূহ; ভোটের আগে, ভোটের দিন ও ভোটের পরে ভোটারদের করণীয় ইত্যাদি।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের এডাব প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রস্তুতি নিয়েছে।

যোগাযোগ
এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব)
১/৩, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১২২৮৪৫-৭, ৯১১৬১৮৪, ৯১২৬৪১৫
ফ্যাক্স: ৮১১৩০৯৫, ই-মেইল: adab@bdonline.com

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি)

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ একটি অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ এসব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা পরিষদের মূল কাজ। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর নীতি নির্ধারণী বিতর্কের জন্য পরিষদ এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিষদের গবেষণা ও মতামত জরিপের আর একটি বিষয় নির্বাচন। তারা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে যে মতামত জরিপ চালিয়েছে তা সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের কাজে লেগেছে। কার্যকর নীতি প্রণয়নে এই প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও গবেষণালব্ধ উপাত্ত সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

এর একটি প্রকাশনা শাখা রয়েছে যেখান থেকে নিয়মিতভাবে বই, গবেষণা রিপোর্ট এবং জার্নাল বের করা হয়। সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা অন্য যেকোনো আগ্রহী ব্যক্তি

www.pathagar.com

উন্নয়ন পরিষদের কাছ থেকে মূল্যবান সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

যোগযোগ:
বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি)
বাড়ি-৩৩ রোড-৪ ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা-১২০৫
পোঃ বক্স-৫০০৭ (নিউ মার্কেট)
ফোনঃ ৮৬১৮৮০৯ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৬১৭০২১
ই-মেইল: bup@citechco.net

ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে এক সমাবেশের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন গঠিত হয়। দেশের প্রধান কয়েকটি এনজিও এই সমাবেশের আয়োজন করেছিল। প্রধানত এনজিও কর্মী ও তাদের সুবিধাভোগীরা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ওই সমাবেশে যোগ দেন। ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য: (১) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং (২) মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করা।

প্রতিটি থানা, জেলা ও মেট্রোপলিটান শহরে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের কমিটি রয়েছে। প্রতিটি কমিটির সভাপতি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাধারণ সম্পাদক এনজিও প্রতিনিধি। প্রতিটি পর্যায়ের কমিটিতে এনজিও ও তাদের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য স্পষ্ট।

৩৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি রয়েছে মূলত এই আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করার জন্য। এই আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ, "আসন্ন নির্বাচনে অপশক্তিকে প্রতিহত করা।"

প্রশিকা মিরপুর কেন্দ্রীয় অফিসে অবস্থিত আন্দোলনের মূল কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, ঋণখেলাপি, কালোটাকার মালিক, যুদ্ধাপরাধী, উন্নয়ন ও নারী বিরোধী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী এদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবে এই আন্দোলন।

ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের প্রথম জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২১ এপ্রিল, ২০০১ তারিখে। সম্মেলন শেষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয় তারা যেন সৎ এবং জনদরদী ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেয়।

যোগাযোগ
ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন
১/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬, জিপিও বক্স-৩১৪৯
ফোন-৮০১৩৩৯৮, ৮০১৫৮১২, ৮০১৬০১৫, ৮০১৫৯৪৫-৬, ফ্যাক্স-৮০১৫৮১১
ই.মেইল-proshika@bdonline.com

www.pathagar.com

Reference

1. Commonwealth Observer Group. Parliamentary Elections in Bangladesh. Commonwealth Secretatriat: London. 1991.
2. Fair Election Monitoring Allience (FEMA), Bangladesh Parliamentary Elections June 12, 1996. July 1996.
3. International Centre for Ethnic Studies. The Electoral system in Bangladesh. Colombo, 1990.
4. NDI. Press release on Institute and its involvment in Bangladesh. 1995.
5. Subhan.K. M (Editor). A Report on Elections to the Fifth National Parliament, 27 February, 1991. The Bangladesh Mukta Nirbachon Andolon. July 1991.
6. Timm, R. W. and Gain, Philip. Upzila Election 1990 Observation. 1990.
9. Timm, R. W. and Gain, Philip. Election Observation Report. 1991.

www.pathagar.com

নতুন বাস্তবতায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যা আছে তা লিপিবদ্ধ করাই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা যা গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পৃথিবীর যেসব দেশে গণতন্ত্র আছে সেসব দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের খুব একটা দরকার হয় না বা সেসব দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ গুরুত্বহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটেন বা ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেখানে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে, গণতন্ত্রের প্রতি কোনো বিশেষ হুমকি নেই, সেসব দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। ধরেই নেয়া হয় গণতন্ত্রের অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতো নির্বাচন প্রক্রিয়াও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে থাকবে।

বাংলাদেশ, ফিলিপাইন বা এশিয়ার অন্যান্য দেশ, আফ্রিকার দেশসমূহ এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি বা পারছে না। এসব দেশে গণতন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। গণতন্ত্রের প্রতি অনেক ধরনের হুমকি এখানে বিরাজমান। এসব দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়াও সুষ্ঠু না-হবার সম্ভাবনা থাকে। নির্বাচন তথা গণতন্ত্রের প্রতি এই যে হুমকি তা দূর করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দরকার হয়ে পড়ে।

এরকম একটা প্রেক্ষাপটেই আশির দশকে আমাদের দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শুরু হয়; ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পায়। আশির দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, নানা হুমকি ছিল। সেসব হুমকি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচাল করার জন্য প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। সুতরাং নির্বাচন প্রক্রিয়ার হুমকির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এবং হুমকিমুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হতে থাকে।

আশির দশকে দেখা গেছে নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়েছে মূলত ভোট দেবার দিনটিতে। ভোটকেন্দ্রে বোমাবাজি, জালভোট দেয়া, ভোটদিতে না দেয়া, ব্যালটবক্স ছিনতাই, ভুল গণনা, মিডিয়া ক্যু–এর সবই ঘটেছে ভোটের দিন অথবা তার অব্যবহিত পরেই। সুতরাং বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শুরু হয় ভোটের দিন কেন্দ্রকে ঘিরে। পর্যবেক্ষকরা দেখার চেষ্টা করতেন ঠিক ভোটের দিন কী ঘটছে। কোনো একটি ভোট কেন্দ্রে বা বুথে সঠিকভাবে নির্বাচন হলো কিনা তা দেখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ছিল দিন কেন্দ্রীক বা ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ওই ধরনটি আজ আর কার্যকরী নয়, বলা যায় সেকেলে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধান নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী দলগুলো সেই পুরাতন ধরনটিই যেন আকড়ে আছে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণদলগুলো দিন নির্ভর বা বুথ নির্ভর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে খুব বেশি সরে আসতে পারেনি।

আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে।

www.pathagar.com

আশির দশকে যেভাবে নির্বাচনে অনিয়ম হতো আজ আর তা হবে না। ব্যাপকহারে জালভোট দেয়া, ব্যালট বক্স ছিনতাই এসব ঘটনা আগের মতো করে আর ঘটবে না। এখন অনিয়মের ধরনটি পাল্টে গেছে। এখন অনিয়ম শুধুমাত্র একটি দিনে বা ভোটকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নেই। অনিয়মগুলো নির্বাচনের দিনের বহু আগে থেকে ঘটবে এবং নির্বাচনের পরেও কিছু কিছু বিষয় অব্যাহত থাকবে। সুতরাং নির্বাচন যারা পর্যবেক্ষণ করবেন তাদেরকে এই নতুন প্রেক্ষাপট মাথায় রাখতে হবে।

দু'টো উদাহরণ দেয়া যাক। ভোটার তালিকা এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল দুটোই নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ। এই ভোটার তালিকা কতটুকু যথাযথ বা নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি কীভাবে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

অন্য আর একটি বিষয় হলো, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শুধু টেকনিক্যাল একটি বিষয় নয়। কতটি কেন্দ্রে কতজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলাম, সারা দিনে কোথায় কী কী অনিয়ম হলো, তার একটি ফিরিস্তি তৈরি করলাম এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করলাম। নির্বাচন যারা বানচাল করতে চায় তারা তা করল, পর্যবেক্ষকরাও একটা রিপোর্ট তৈরি করল। বিষয়টি যেন এরকম না হয়। সেজন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণের একটি নৈতিক দিকও থাকা দরকার। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের এই নৈতিক ভিত্তিটা তৈরি হয় সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থেকে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ জনগণের পক্ষে একধরনের শক্তি। অনেকে ক্ষমতার দাপটে এবং পেশীশক্তি প্রয়োগ করে নির্বাচন বানচাল করতে চায়। তার বিপরীতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ জনগণের পক্ষেই মূলত নৈতিক শক্তি হিসাবে কাজ করে। সুতরাং জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

জনগণের কাছে তখনই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে যখন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ফলাফল জনগণের চোখে দৃশ্যমান হবে। জনগণ শুধুমাত্র একটি রিপোর্ট দেখতে চায় না। জনগণ দেখতে চায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ফলে তাদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে, গণতন্ত্র উন্নততর হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ তথ্যের নিজস্ব একটি ক্ষমতা রয়েছে। তথ্যের সঠিক ব্যবহার তাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা লক্ষ করি তথ্যকে সব সময় সঠিকভাবে ব্যবহার না করে একধরনের ব্যাল্যান্স করে ব্যবহার করা হয়। এই যে সত্য না বলা, সঠিক তথ্য ব্যবহার না করা, রাজনৈতিকদল বা শক্তিগুলোর মন জুগিয়ে ব্যাল্যান্স তথ্য ব্যবহার করা এগুলো করে যাচ্ছে নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

এসব সীমাবদ্ধতা বিদেশী পর্যবেক্ষকদলগুলোর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা তাদের রিপোর্টে বলেন নির্বাচন "বাই এন্ড লার্জ" সঠিক হয়েছে। এই "বাই এন্ড লার্জ"-এর মধ্যে শুতংকরের ফাঁকি থাকে, যা থাকা স্বাভাবিক। তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে মিনিমাম স্টান্ডার্ডটা কী!

এইসব উদ্বেগ সমাজে বিরাজমান। সমাজের অনেকের মাথাতেই বিষয়গুলো রয়েছে। অনেকেই এখন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ করতে চাইছেন। তারা বলতে চান তোমরা আরও একটু কার্যকর হও, আরও একটু আপ-টু-ডেট হও, শুধুমাত্র একটি রিপোর্ট তৈরি না করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াও, নৈতিক শক্তি অর্জন করো।

www.pathagar.com

গ
বিভাগ

www.pathagar.com

সংযোজনী-ক

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে ২ক পরিচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

অনুচ্ছেদ ৫৮খ

(১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি

অনুচ্ছেদ ৫৮গ

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান

www.pathagar.com

উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচরকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবরসপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি-

(ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন;

(গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

www.pathagar.com

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী

অনুচ্ছেদ ৫৮ঘ

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরতা

অনুচ্ছেদ ৫৮ঙ

এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।

www.pathagar.com

সংযোজনী-খ

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬
রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি

নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের আলোচনা এবং তৎপূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় চূড়ান্ত আচরণবিধি ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে ঘোষণা করা হয়। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভাব্য প্রর্থীদেরকে এই আচরণবিধির সকল বিধান মেনে চলার জন্য নির্বাচন কমিশন আহ্বান জানায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণ ও সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আচরণ বিধিটি নিম্নে বর্ণিত হলো:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আচরণ বিধিমালায়,-

(ক) "নির্বাচন পূর্ব সময়" বলিতে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে;

(খ) "প্রার্থী" বলিতে কোনো নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(গ) "রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র সূচক কোনো নামে কার্য করেন এবং কোনো রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্গ হইতে পৃথক কোনো অধিসঙ্গ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন।

৩। কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইদ্যাদি নিষিদ্ধ

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা যাইবে। তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান

www.pathagar.com

বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাইবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাইবে না।

৪। ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহার

সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল দল ও প্রার্থীকে সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে। তবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। নির্বাচনী প্রচারণা

(১) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকিবে। কোনো প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার বেশ পূর্বেই তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কোনো সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো জনসভা করা যাইবে না।

(৫) কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৬) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তাহাদের পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন।

(৭) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিলের উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না।

(৮) কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়ম্বর হইতে হইবে। নির্বাচন ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না।

(৯) সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

www.pathagar.com

(১০) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোনো অবস্থাতেই ২২"x১৮" -এর অধিক হইতে পারিবে না।

(১১) কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একই সাথে তিনটি মাইকের বেশি ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২ ঘটিকা হইতে রাত ৮ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(১২) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করা যাইবে না।

(১৩) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন হইতে সকলকে বিরত থাকিতে হইবে।

(১৪) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিদার্থে ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চালানো এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাইবে না। কোনো সরকারি কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(১৫) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস কিংবা অন্য কোনো যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না।

(১৬) শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভোটগ্রহণ এবং কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা করিতে হইবে।

(১৭) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোনো ধরনের তিক্ত,উস্কানীমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

(১৮) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী খরচের ব্যয়সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

৬। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা

অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাইবে না।

৭। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

www.pathagar.com

৮। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম

এই বিধিমালার যে কোনো নিধানের লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশনের বরাবরে আর্জি পেশ করিতে পারিবেন। নির্বাচন কমিশনের বরাবরে পেশকৃত আর্জি কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটি The Representation of the People Order, 1972(P.O. No. 155 of 1972) -এর Artcle 91A-এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহাম্মদ ফয়জুর রাজ্জাক

সচিব।

www.pathagar.com

সংযোজনী-গ

সপ্তম সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা
(বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাপ্ত ভোটসহ)

১৯৭৬ সালের ১ নং অধ্যাদেশের ৬(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে সপ্তম সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকাসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। নির্বাচনী এলাকাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫-এর ৩০শে মে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রকাশ করে।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০০১ পঞ্চগড়-১	ক. তেতুলিয়া থানা খ. পঞ্চগড় সদর থানা গ. আটোয়ারী থানা জেলা পঞ্চগড়।	ব্যারিস্টার মোঃ জমিরউদ্দীন সরকার (বিএনপি) মোঃ নুরুল ইসলাম (আ.লীগ)	৫৭,৪৩৩ ৪৮,০১২
০০২ পঞ্চগড়-২	ক. বোদা থানা খ. দেবীগঞ্জ থানা জেলা পঞ্চগড়।	মোঃ মোজাহার হোসেন (বিএনপি) এড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম (আ.লীগ)	৪৮,৫৩৪ ৪৬,৮১৫
০০৩ ঠাকুরগাঁও-১	ক. ঠাকুরগাঁও সদর থানা জেলা ঠাকুরগাঁও।	মোঃ খাদেমুল ইসলাম (আ.লীগ) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি)	৬২,৭০৯ ৫৮,৩৫৯
০০৪ ঠাকুরগাঁও-২	ক. বালিয়াডাংগি থানা খ. রাণিশংকৈল থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১) ধর্মগড় ২) কাশীপুর গ. হরিপুর থানা জেলা ঠাকুরগাঁও।	মোঃ দবিরুল ইসলাম (আ.লীগ) মোঃ আসাদুজ্জামান বাবু (জাপা)	৪৮,৩৪৪ ২৮,৭৫৭
০০৫ ঠাকুরগাঁও-৩	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত রানীশংকইল থানা: ১) ধর্মগড় ২) কাশীপুর গ. পীরগঞ্জ থানা জেলা ঠাকুরগাঁও।	মোঃ এমদাদুল হক (আ.লীগ) মোঃ ইকরামুল হক (জাপা)	৫৫,৯৫৩ ৫২,৩৪২

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০০৬ দিনাজপুর-১	ক. বীরগঞ্জ থানা	মোঃ আব্দুর রউফ চৌধুরী (আ. লীগ)	৬০,৬৮১
	খ. কাহারোল থানা	সৈয়দ আহমেদ রেজা হোসেন (বিএনপি)	৩২,৪৩৭
	জেলা দিনাজপুর।		
০০৭ দিনাজপুর-২	ক. বোচাগঞ্জ থানা	শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় (আ. লীগ)	৫৫,৫৫১
	খ. বিরল থানা	এ এফ এম রিয়াজুল হক চৌধুরী (জাপা)	৪৭,৬১১
	জেলা দিনাজপুর।		
০০৮ দিনাজপুর-৩	দিনাজপুর সদর থানা	খুরশীদ জাহান হক (বিএনপি)	৫১,৮০২
	জেলা দিনাজপুর।	মোঃ আব্দুর রহিম এড. (আ. লীগ)	৪৯,৮৫৭
০০৯ দিনাজপুর-৪	ক. খানসামা থানা	মোঃ মিজানুর রহমান মানু (আ. লীগ)	৫৯,৭৪৬
	খ. চিরির বন্দর থানা	মোঃ আব্দুল হালিম এড. (বিএনপি)	৪৪,৩৯৪
	জেলা দিনাজপুর।		
০১০ দিনাজপুর-৫	ক. পার্বতীপুর থানা	মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান (আ. লীগ)	৭১,৩৬৩
	খ. ফুলবাড়ী থানা	মোঃ আব্দুল ওহাব সরকার (জাপা)	৪৯,১৫৩
	জেলা দিনাজপুর।		
০১১ দিনাজপুর-৬	ক. নবাবগঞ্জ থানা	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (আ. লীগ)	৭৫,২৬৮
	খ. বিরামপুর থানা	মোঃ আতিউর রহমান (বিএনপি)	৬২,৪৯৫
	গ. হাকিমপুর থানা		
	ঘ. ঘোড়াঘাট থানা		
	জেলা দিনাজপুর।		
০১২ নীলফামারী-১	ক. ডোমার থানা	এড. এন কে আলম চৌধুরী (জাপা)	৬০,৪৪৪
	খ. ডিমলা থানা	মোঃ আব্দুর রউফ (আ.লীগ)	৪৭,৮৩৩
	জেলা নীলফামারী।		
০১৩ নীলফামারী-২	নীলফামারী সদর থানা	আহ্সান আহমদ (জাপা)	৪৪,৯৯৯
	জেলা নীলফামারী।	জয়নাল আবেদীন (আ. লীগ)	৪৪,৫৬০
০১৪ নীলফামারী-৩	ক. জলঢাকা থানা	মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী	
	খ. কিশোরগঞ্জ থানার	(জামায়াতে ইসলামী)	৩৭,৫৪৬
	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ:	রশিদুল আলম চৌধুরী (জাপা)	৩৫,০৩০
	১) রণচণ্ডি,		
	২) বড়ভিটা		
	৩) পুটিমারী,		
	জেলা নীলফামারী।		

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০১৫ নীলফামারী-৪	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কিশোরগঞ্জ থানা: ১) রণচণ্ডি ২) বড়ভিটা ৩) পুটিমারী খ. সৈয়দপুর থানা জেলা নীলফামারী।	ডঃ মোঃ আসাদুর রহমান (জাপা) মোঃ মোখলেসুর রহমান (আ. লীগ)	৫৭,২৬৫ ৪১,০৫৩
০১৬ লালমনিরহাট -১	ক. পাটগ্রাম থানা খ. হাতিবান্ধা থানা জেলা লালমনিরহাট।	মোঃ জয়নুল আবেদীন সরকার (জাপা) মোঃ মোতাহার হোসেন (আ. লীগ)	৫৮,৪৭৮ ৫৩,১৮৯
০১৭ লালমনিরহাট-২	ক. কালিগঞ্জ থানা খ. আদিতমারী থানা জেলা লালমনিরহাট।	মুজিবর রহমান (জাপা) নুরুজ্জামান আহমেদ (আ. লীগ)	৫৭,৮০৪ ৪৯,৬৮৩
০১৮ লালমনিরহাট-৩	লালমনিরহাট সদর থানা জেলা লালমনিরহাট।	গোলাম মোঃ কাদের (জাপা) আসাদুল হাবিব (দুলু) (বিএনপি)	৩৯,৭৫৫ ৩৬,৮৮১
০১৯ রংপুর-১	ক. গংগাচড়া থানা খ. রংপুর সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহঃ ১) হরিদেবপুর ২) উত্তম ৩) পরশুরাম জেলা রংপুর।	শরফুদ্দীন আহমেদ (জাপা) মেজর মোঃ মেজবাহউদ্দিন আহমেদ (আ. লীগ)	৬১,৩৭৩ ২৮,৩৭৩
০২০ রংপুর-২	ক. তারাগঞ্জ থানা খ. বদরগঞ্জ থানা জেলা রংপুর। বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোঃ আনিসুল হক চৌধুরী (আ.লীগ) এরশাদের জায়গায় আসেন।	হুসেইন মোঃ এরশাদ (জাপা) মোঃ আনিসুল হক চৌধুরী (আ.লীগ)	৬৬,৯২৯ ৫৫,৮০০
০২১ রংপুর-৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ ব্যতীত রংপুর সদর থানা: ১) হরিদেবপুর ২) উত্তম ৩) পত্তরাম জেলা রংপুর।	হুসেইন মোঃ এরশাদ (জাপা) মোঃ সিদ্দিক হোসেন (আ. লীগ)	১,০৫,৫৯০ ২৮,৩০৫

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০২২ রংপুর-৪	ক. পীরগাছা থানা খ. কাউনিয়া থানা জেলা রংপুর।	আলহাজ্জ মোঃ করিমউদ্দিন ভরসা (জাপা) আলহাজ্জ মহসিন আলী বেঙ্গল (আ.লীগ)	৮৪,৩৭৭ ৪০,০৭৬
০২৩ রংপুর-৫	মিঠাপুকুর থানা জেলা রংপুর।	হুসেইন মোঃ এরশাদ (জাপা) মোঃ এইচএন আশিকুর রহমান (আ.লীগ)	৮৭,৩৮৭ ৫০,৮৩৯
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোঃ এইচএন আশিকুর রহমান (আ.লীগ) এরশাদের জায়গায় আসেন।		
০২৪ রংপুর-৬	পীরগঞ্জ থানা, জেলা রংপুর।	হুসেইন মোঃ এরশাদ (জাপা) মোঃ মতিয়ার রহমান চৌধুরী (আ.লীগ)	৬০,৬৬৫ ৩৭,৬৬১
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে নুর মোহাম্মদ মন্ডল (জাপা) এরশাদের জায়গায় আসেন।		
০২৫ কুড়িগ্রাম-১	ক. ভুরুংগামারী থানা খ. নাগেশ্বরী থানা জেলা কুড়িগ্রাম।	একেএম মোস্তাফিজুর রহমান (জাপা) মোঃ মোজাম্মেল হক প্রধান (আ. লীগ)	৬৪,০৬৪ ৪২,১২৫
০২৬ কুড়িগ্রাম-২	ক. ফুলবাড়ী থানা খ. কুড়িগ্রাম সদর থানা গ. রাজারহাট থানা জেলা কুড়িগ্রাম।	আলহাজ্জ মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী (জাপা) মোঃ জাফর আলী (আ.লীগ)	৮২,১৫৮ ৭২,৯৬২
০২৭ কুড়িগ্রাম-৩	উলিপুর থানা জেলা কুড়িগ্রাম।	হুসেইন মোঃ এরশাদ (জাপা) মোঃ আমজাদ হোসেন তালুকদার (আ. লীগ)	৬৭,২৬২ ২০,৪০৮
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোজাম্মেল হোসেন (জাপা) এরশাদের জায়গায় আসেন।		
০২৮ কুড়িগ্রাম-৪	ক. চিলমারী থানা খ. রৌমারী থানা গ. রাজিবপুর থানা জেলা কুড়িগ্রাম।	মোঃ গোলাম হোসেন (জাপা) মোঃ শওকত আলী (বীর বিক্রম) (আ. লীগ)	৪২,৭৯০ ২১,৫১৪
০২৯ গাইবান্ধা-১	সুন্দরগঞ্জ থানা জেলা গাইবান্ধা।	মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরকার (জাপা) মওলানা আব্দুল আজিজ (জামায়াতে ইসলামি)	৫৭,৩১৮ ৩৮,১৪৫
০৩০ গাইবান্ধা-২	গাইবান্ধা সদর থানা জেলা গাইবান্ধা।	আব্দুর রশিদ সরকার (জাপা) মোঃ লুৎফর রহমান (আ.লীগ)	৬৯,৩৭০ ৩৯,৮৬০
০৩১ গাইবান্ধা-৩	ক. সাদুল্যাপুর থানা খ. পলাশবাড়ী থানা জেলা গাইবান্ধা।	ডঃ টিআইএম ফজলে রাব্বী চৌধুরী (জাপা) মোঃ নজরুল ইসলাম (আ.লীগ)	৮৫,০২৭ ৪৭,৯৩৭
০৩২ গাইবান্ধা-৪	গোবিন্দগঞ্জ থানা জেলা গাইবান্ধা।	লুৎফর রহমান চৌধুরী (জাপা) মোঃ তোজাম্মেল হোসেন প্রধান (আ. লীগ)	৬৭,৪১৯ ৪৮,৯১৯

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৩৩ গাইবান্ধা-৫	ক. ফুলছড়ি থানা খ. সাঘাটা থানা জেলা গাইবান্ধা।	এড. ফজলে রাব্বী (জাপা) মোঃ হাবিবুর রহমান (আ. লীগ)	৬৯,০৯৪ ৪০,৪৭৮
০৩৪ জয়পুরহাট-১	ক. পাঁচবিবি থানা খ. জয়পুরহাট সদর থানা জেলা জয়পুরহাট।	আবদুল আলিম (বিএনপি) মোঃ আব্বাস আলী মন্ডল (আ. লীগ)	৯০,৭১৩ ৬০,৭৬৮
০৩৫ জয়পুরহাট-২	ক. আক্কেলপুর থানা খ. ক্ষেতলাল থানা গ. কালাই থানা জেলা জয়পুরহাট।	আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান (বিএনপি) মীর জালালুর রহমান (আ.লীগ)	৭৬,৮৫৭ ৩৯,২৬৭
০৩৬ বগুড়া-১	ক. সারিয়াকান্দি থানা খ. সোনাতলা থানা জেলা বগুড়া।	ডাঃ হাবিবুর রহমান (বিএনপি) মোঃ আব্দুল মান্নান (আ.লীগ)	৯২,৫৪৩ ৩৫,৮৮৯
০৩৭ বগুড়া-২	শিবগঞ্জ থানা জেলা বগুড়া।	একেএম হাফিজুর রহমান (বিএনপি) মওলানা শাদাতুজ্জামান (জামায়াতে ইসলামী)	৭৪,৩৪৫ ২৪,৫৯৩
০৩৮ বগুড়া-৩	ক. দুপচাঁচিয়া থানা খ. আদমদীঘি থানা জেলা বগুড়া।	হাজী আব্দুল মজিদ (বিএনপি) মোঃ সোলায়মান আলী (আ.লীগ)	৬৫,১৪০ ৩৫,৯২৩
০৩৯ বগুড়া-৪	ক. কহালু থানা খ. নন্দীগ্রাম থানা জেলা বগুড়া।	ডাঃ জিয়াউল হক মোল্লা (বিএনপি) মোঃ শহিদুল আলম দুদু (আ.লীগ)	৬৪,১৪১ ৩৮,৩৯৫
০৪০ বগুড়া-৫	ক. শেরপুর থানা খ. ধুনট থানা জেলা বগুড়া।	গোলাম মোঃ সিরাজ (বিএনপি) ফেরদৌস জামান মুকুল (আ.লীগ)	১,১৪,৮৪৩ ৮৮,০৫৯
০৪১ বগুড়া-৬	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত বগুড়া সদর থানা: ১) আমরুল ২) চুপিনগর ৩) খোট্টাপাড়া	বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি) গোলাম রব্বানী (জামায়াতে ইসলামী)	১,৩৬,৬৬৯ ৪৬,৯১৭

বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোঃ জহিরুল ইসলাম (বিএনপি) বেগম খালেদা জিয়ার জায়গায় আসেন।

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৪২ বগুড়া-৭	ক. বগুড়া সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) আমরুল ২) চুপিনগর ৩) খোট্রাপাড়া খ. গাবতলী থানা জেলা বগুড়া।	বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি) মোঃ ওয়ালিউল হক (আ. লীগ)	১,০৭,৪১৭ ২৫,২৭
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু (বিএনপি) বেগম খালেদা জিয়ার জায়গায় আসেন।		
০৪৩ নওয়াবগঞ্জ-১	শিবগঞ্জ থানা জেলা নওয়াবগঞ্জ।	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিয়া (বিএনপি) নজরুল ইসলাম (জামায়াতে ইসলামী)	৯৩,১১৯ ৭৪,১৪৪
০৪৪ নওয়াবগঞ্জ-২	ক. ভোলাহাট থানা খ. গোমস্তাপুর থানা গ. নাচোল থানা জেলা নওয়াবগঞ্জ।	সৈয়দ মনজুর হোসেন (বিএনপি) মোঃ আব্দুল খালেক বিশ্বাস (আ.লীগ)	৭৭,৬৭৩ ৫৭,৩৫৮
০৪৫ নওয়াবগঞ্জ-৩	ক. নওয়াবগঞ্জ সদর থানা জেলা নওয়াবগঞ্জ।	মোঃ হারুনুর রশিদ (বিএনপি) অধ্যাপক মোঃ লতিফুর রহমান (জা. ইস)	৭৭,৯২৯ ৪৭,০৪৮
০৪৬ নওগাঁ-১	ক. পোরশা থানা খ. সাপাহার থানা গ. নিয়ামতপুর থানা জেলা নওগাঁ।	ডাঃ মোঃ সালেক চৌধুরী (বিএনপি) শ্রী সাধন মজুমদার (আ.লীগ)	৭০,০৪১ ৫৯,৯৭৫
০৪৭ নওগাঁ-২	ক. পত্নীতলা থানা খ. ধামুইরহাট থানা জেলা নওগাঁ।	মোঃ শামসুজ্জোহা খান (জোহা) (বিএনপি) মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার (আ. লীগ)	৬২,৫৯০ ৫৫,১৯৯
০৪৮ নওগাঁ-৩	ক. বলদগাছি থানা খ. মহাদেবপুর থানা জেলা নওগাঁ।	মোঃ আকতার হামিদ সিদ্দিকী (বিএনপি) দেওয়ান আমজাদ হোসেন তারা (আ.লীগ)	১,০৫,২২৫ ৮০,৫৩৬
০৪৯ নওগাঁ-৪	মান্দা থানা জেলা নওগাঁ।	শামসুল আলম প্রামানিক (বিএনপি) মোঃ ইমাজউদ্দীন প্রামানিক (আ.লীগ)	৬৯,৯১৯ ৫২,৫৯৬
০৫০ নওগাঁ-৫	নওগাঁ সদর থানা জেলা নওগাঁ।	আলহাজ্জ শামসুদ্দীন আহমেদ (বিএনপি) মোঃ আব্দুল জলিল (আ.লীগ)	৮৪,৪৮১ ৬৬,৪২৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৫১ নওগাঁ-৬	ক. রাণীনগর থানা খ. আত্রাই থানা জেলা নওগাঁ।	আলমগীর কবির (বিএনপি) মোঃ ওহিদুর রহমান (আ.লীগ)	৭৭,৩০৪ ৫৬,০৫৩
০৫২ রাজশাহী-১	ক. গোদাগাড়ী থানা খ. তানোর থানা জেলা রাজশাহী।	ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক (বিএনপি) মোঃ আলালউদ্দীন (আ.লীগ)	৮৩,৯৯৪ ৫৫,০০৩
০৫৩ রাজশাহী-২	ক. পবা থানা খ. বোয়ালিয়া থানা গ. রাজপাড়া থানা ঘ. মতিহার থানা ঙ. শাহ মখদুম থানা জেলা : রাজশাহী	মোঃ কবির হোসেন (বিএনপি) এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন (আ.লীগ)	১,০৮,৪৭১ ৭৫,৮০৩
০৫৪ রাজশাহী-৩	ক. মোহনপুর থানা খ. বাগমারা থানা জেলা রাজশাহী।	মোঃ আবু হেনা (বিএনপি) এড. মোঃ ইব্রাহীম হোসেন (আ.লীগ)	৬৭,৮৬৩ ৫৪,১২১
০৫৫ রাজশাহী-৪	ক. দূর্গাপুর থানা খ. পুঠিয়া থানা জেলা রাজশাহী।	এড. মোঃ নাদিম মোস্তফা (বিএনপি) তাজুল ইসলাম মোঃ ফারুক (আ.লীগ)	৫০,৮২৭ ৪৫,২৯৩
০৫৬ রাজশাহী-৫	ক. চারঘাট থানা খ. বাঘা থানা জেলা রাজশাহী।	ডাঃ মোঃ আলাউদ্দীন (বিএনপি) ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আনিসুর রহমান (আ.লীগ)	৬৫,৫৯৪ ৫৮,৬১৪
০৫৭ নাটোর-১	ক. লালপুর থানা খ. বাগাতিপাড়া থানা জেলা নাটোর	মোঃ ফজলুর রহমান (পটল) (বিএনপি) মোঃ মমতাজ উদ্দীন (আ.লীগ)	৭৮,৮৯৭ ৬২,১৮৪
০৫৮ নাটোর-২	নাটোর সদর থানা জেলা নাটোর	এড. মোঃ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (বিএনপি) মোঃ আহাদ আলী সরকার (আ.লীগ)	৫৮,৫০০ ৫০,৪৫৫
০৫৯ নাটোর-৩	সিংড়া থানা জেলা নাটোর	আলহাজ্জ অধ্যাপক কাজী গোলাম মোরশেদ (বিএনপি) মোঃ শাহজাহান আলী (আ.লীগ)	৪৩,১৬২ ৪১,৭১৮
০৬০ নাটোর-৪	ক. গুরুদাসপুর থানা খ. বড়াইগ্রাম থানা জেলা নাটোর।	অধ্যাপক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (আ.লীগ) মোঃ মোজাম্মেল হক (বিএনপি)	৬৭,০১৩ ৬১,৩৭৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৬১ সিরাজগঞ্জ-১	কাজিপুর থানা জেলা সিরাজগঞ্জ। বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোঃ সেলিম (আ.লীগ) মোঃ নাসিমের জায়গায় আসেন।	মোঃ নাসিম (আ.লীগ) আব্দুল মজিদ মিনু (বিএনপি)	৬২,৩৮৩ ২৩,৯২৭
০৬২ সিরাজগঞ্জ-২	সিরাজগঞ্জ সদর থানা জেলা সিরাজগঞ্জ।	মোঃ নাসিম (আ.লীগ) একে শামসুল আলামিন (বিএনপি)	৬৮,৫৯৮ ৫২,৭০৯
০৬৩ সিরাজগঞ্জ-৩	ক. রায়গঞ্জ থানা খ. তাড়াশ থানা জেলা সিরাজগঞ্জ।	মোঃ আব্দুল মান্নান তালুকদার (বিএনপি) মোঃ ইসহাক হোসেন তালুকদার (আ.লীগ)	৭৪,১৯২ ৭০,৯৭৫
০৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪	উল্লাপাড়া থানা জেলা সিরাজগঞ্জ।	আব্দুল লতিফ মির্জা (আ.লীগ) এওয়াই মোঃ কামাল (বিএনপি)	৮০,৪৭৭ ৩৮,৬২৬
০৬৫ সিরাজগঞ্জ-৫	ক. বেলকুচি থানা খ. কামারখন্দ থানা জেলা সিরাজগঞ্জ।	মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস (আ.লীগ) মোঃ শহীদুল্লাহ খান (বিএনপি)	৫১,৬৮১ ৪৮,৩৬০
০৬৬ সিরাজগঞ্জ-৬	ক. শাহাজাদপুর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) খুকনী ২) জালালপুর ৩) কৈজুরী ৪) সোনাতলী খ. চৌহালী থানা জেলা সিরাজগঞ্জ।	মোঃ শাহজাহান (আ.লীগ) লেফ.কর্ণেল (অব:) একেএম মাহবুবুল ইসলাম (বিএনপি)	২৯,৫৯২ ২৬,৮৫৫
০৬৭ সিরাজগঞ্জ-৭	নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ ব্যতীত শাহজাদপুর থানা: ১) খুকনী ২) জালালপুর ৩) কৈজুরী ৪) সোনাতলী জেলা সিরাজগঞ্জ।	হাসিবুর রহমান স্বপন (বিএনপি) ডা: মাজহারুল ইসলাম (আ.লীগ)	৫৪,০২৩ ৫৩,০৭২
০৬৮ পাবনা-১	ক. সাঁথিয়া থানা খ. বেড়া থানার নিম্নলিখিত এলাকা সমূহ: ১) বেড়া পৌরস ২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন ৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (আ.লীগ) মেজর (অব:) মনজুর কাদের (বিএনপি)	৭৩,৩৩৫ ৫৮,৬৫২

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	জেলা পাবনা।		
০৬৯ পাবনা-২	ক. নিম্নলিখিত এলাকা সমূহ ব্যতীত বেড়া থানা: ১) বেড়া পৌরসভা ২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন ৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন খ. সুজানগর থানা জেলা পাবনা	আহমেদ তফিজ উদ্দিন (আ.লীগ) একেএম সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি)	৬৭,২৫০ ৬৫,৭৪৫
০৭০ পাবনা-৩	ক. চাটমোহর থানা খ. ভাংগুরা থানা গ. ফরিদপুর থানা জেলা পাবনা।	মোঃ ওয়াজিউদ্দিন খান (আ.লীগ) কেএম আনোয়ারুল ইসলাম (বিএনপি)	৮৫,৬৪৪ ৭১,৪৩৫
০৭১ পাবনা-৪	ক. আটঘরিয়া থানা খ. ঈশ্বরদী থানা জেলা পাবনা।	শামসুর রহমান শরীফ (আ.লীগ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম সরদার (বিএনপি)	৬৬,৪২৪ ৫৫,৯৪৪
০৭২ পাবনা-৫	পাবনা সদর থানা জেলা পাবনা।	মোঃ রফিকুল ইসলাম বকুল (বিএনপি) একে খন্দকার (আ.লীগ)	৭৮,১৬৫ ৬৯,১১৯
০৭৩ মেহেরপুর-১	মেহেরপুর সদর থানা জেলা মেহেরপুর।	আহমেদ আলী (বিএনপি) সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন (আ.লীগ)	৬০,৬২১ ৫১,৩৬৬
০৭৪ মেহেরপুর-২	গাংনী থানা, জেলা মেহেরপুর।	মোঃ মকবুল হোসেন (স্বতন্ত্র) মোঃ আব্দুল গণি (বিএনপি)	৬০,৬২১ ৩৩,৮৬১
০৭৫ কুষ্টিয়া-১	দৌলতপুর থানা জেলা কুষ্টিয়া।	মোঃ আহসানুল হক মোল্লা (বিএনপি) আফাজউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	৬৪,৬৯২ ৪৭,০৫৩
০৭৬ কুষ্টিয়া-২	ক. ভেড়ামারা থানা খ. মিরপুর থানা জেলা কুষ্টিয়া	অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম (বিএনপি) মোঃ আহসান হাবিব লিংকন (জাপা)	৬৪,৩৮৯ ৪০,১০৬
০৭৭ কুষ্টিয়া-৩	কুষ্টিয়া সদর থানা জেলা কুষ্টিয়া।	আলহাজ্ব কেএম আব্দুল খালেক চন্টু (বিএনপি) আনোয়ার আলী (আ.লীগ)	৭৭,২৬০ ৫৫,৮৮৯
০৭৮ কুষ্টিয়া-৪	ক. কুমারখালী থানা খ. খোকসা থানা জেলা কুষ্টিয়া।	সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (বিএনপি) মোঃ আবুল হোসেন তরুণ (আ.লীগ)	৫৫,৮৭১ ৫৫,৫১০
০৭৯ চুয়াডাংগা-১	ক. আলমডাংগা থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ	শামসুজ্জামান দুদু (বিএনপি) মোঃ সোলায়মান হক (আ.লীগ)	৮৯,৭৮৬ ৭৭,৪৮৯

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	ব্যতীত চুয়াডাংগা সদর থানা: ১) তিতুদহ ২) বেগমপুর জেলা চুয়াডাংগা।		
০৮০ চুয়াডাংগা-২	ক. দামুরহুদা থানা খ. জীবননগর থানা গ. চুয়াডাংগা সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) তিতুদহ ২) বেগমপুর জেলা চুয়াডাংগা	মোঃ মোজাম্মেল হক (বিএনপি) মির্জা সুলতান রাজা (আ.লীগ)	৬৪,৭৫৫ ৬৩,৭৩২
০৮১ ঝিনাইদহ-১	শৈলকূপা থানা জেলা ঝিনাইদহ।	আলহাজ্জ মোঃ আব্দুল ওয়াহাব (বিএনপি) অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান (আ.লীগ)	৭৫,১০৫ ৬৮,৫১৪
০৮২ ঝিনাইদহ-২	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ ব্যতীত ঝিনাইদহ সদর থানা: ১) নলডাংগা ২) ঘোড়াশাল ৩) ফুরসন্দি ৪) মহারাজপুর খ. হরিণাকুণ্ড থানা জেলা ঝিনাইদহ।	মোঃ মশিউর রহমান (বিএনপি) নূর-এ-আলম সিদ্দিকী (আ.লীগ)	৮৩,৯৬৭ ৬৯,৩৫৩
০৮৩ ঝিনাইদহ-৩	ক. কোট চাঁদপুর থানা খ. মহেশপুর থানা জেলা ঝিনাইদহ।	মোঃ শহীদুল ইসলাম (বিএনপি) এস এম মোজাম্মেল হক (জামায়াতে ইসলামী)	৬৫,৭২৫ ৫৬,৪৫৮
০৮৪ ঝিনাইদহ-৪	ক. ঝিনাইদহ সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) নলডাংগা ২) ঘোড়াশাল ৩) ফুরসন্দি ৪) মহারাজপুর খ. কালীগঞ্জ থানা জেলা ঝিনাইদহ।	শহিদুজ্জামান বেল্টু (বিএনপি) মোঃ আব্দুল মান্নান (আ.লীগ)	৬০,৬৯৬ ৪৯,৬০৫
০৮৫ যশোহর-১	শার্শা থানা জেলা যশোহর।	মোঃ তবিবুর রহমান সরদার (আ.লীগ) মোঃ আলী কাদের (বিএনপি)	৪৬,১১৪ ৪০,৬৩৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৮৬ যশোহর-২	ক. চৌগাছা থানা খ. ঝিকরগাছা থানা জেলা যশোহর।	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (আ.লীগ) মোঃ ইসহাক (বিএনপি)	৮৬,৭৫২ ৫৮,৪০৫
০৮৭ যশোহর-৩	বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোহর সদর থানা জেলা যশোহর।	আলী রেজা রাজু (আ.লীগ) তরিকুল ইসলাম (বিএনপি)	৭৫,৭৬৯ ৬৫,৬৩৪
০৮৮ যশোহর-৪	ক. যশোহর সদর থানার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন খ. অভয়নগর থানা গ. বাঘের পাড়া থানা জেলা যশোহর।	শাহ হাদিউজ্জামান (আ.লীগ) এম.এম আমিনুদ্দীন (জাপা)	৬৯,১৯৪ ৪৪,২৬৩
০৮৯ যশোহর-৫	মনিরামপুর থানা জেলা যশোহর।	খান টিপু সুলতান (আ.লীগ) এড. শহীদ মোঃ ইকবাল হোসেন (বিএনপি)	৬৪,৫৮৬ ৪৫,২৩৪
০৯০ যশোহর-৬	কেশবপুর থানা জেলা যশোহর।	এএসএইচকে সাদেক (আ.লীগ) মওলানা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি)	৩৫,২৯৩ ৩০,৬০৯
০৯১ মাগুরা-১	ক. শ্রীপুর থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ ব্যতীত মাগুরা সদর থানা: ১) শক্রজিৎপুর ২) গোপাল গ্রাম ৩) কুচিয়ামোড়া ৪) বেরইল পলিতা জেলা মাগুরা।	এম এস আকবর (আ.লীগ) মোঃ ইকবাল আখতার খান (জাপা)	৭৩,৫৪৩ ৪৯,৫৯৪
০৯২ মাগুরা-২	ক. মাগুরা সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) শক্রজিৎপুর ২) গোপাল গ্রাম ৩) কুচিয়ামোড়া ৪) বেরইল পলিতা খ. মোহাম্মদপুর থানা গ. শালিখা থানা জেলা মাগুরা।	শ্রী বীরেন শিকদার (আ.লীগ) কাজী সলিমুল হক (বিএনপি)	৬৪,২১৮ ৫৫,২০৪
০৯৩ নড়াইল-১	ক. কালিয়া থানা খ. নিম্নলিখিত এলাকা সমূহ ব্যতীত নড়াইল সদর থানা:	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা (আ.লীগ) বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)	৫১,১৬৭ ২৬,৯৪৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	১) নড়াইল পৌর এলাকা ২) বাঁশগ্রাম ইউনিয়ন ৩) তুলারামপুর ইউনিয়ন ৪) মাইজপাড়া ইউনিয়ন ৫) আউরিয়া ইউনিয়ন ৬) চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন ৭) শাহবাদ ইউনিয়ন ৮) হবখালি ইউনিয়ন ৯) মুলিয়া ইউনিয়ন জেলা নড়াইল।		
০৯৪ নড়াইল-২	ক. নড়াইল সদর থানার নিম্নলিখিত এলাকা সমূহ: ১) নড়াইল পৌর এলাকা ২) বাঁশগ্রাম ইউনিয়ন ৩) তুলারামপুর ইউনিয়ন ৪) মাইজপাড়া ইউনিয়ন ৫) আউরিয়া ইউনিয়ন ৬) চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন ৭) শাহবাদ ইউনিয়ন ৮) হবখালি ইউনিয়ন ৯) মুলিয়া ইউনিয়ন খ. লোহাগড়া থানা জেলা নড়াইল।	শরীফ খসরুজ্জামান (আ.লীগ) এ কাদের শিকদার (বিএনপি)	৬৩,৯১৩ ৪২,৭১৮
০৯৫ বাগেরহাট-১	ক. ফকিরহাট থানা খ. মোল্লারহাট থানা গ. চিতলমারী থানা জেলা বাগেরহাট।	শেখ হাসিনা (আ.লীগ) শেখ মুজিবর রহমান (বিএনপি)	৭৭,৩৪২ ৪৭,২৯৯
	বি:দ্র: উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হেলাল উদ্দিন (আ.লীগ) শেখ হাসিনার জায়গায় আসেন।		
০৯৬ বাগেরহাট-২	ক. বাগেরহাট সদর থানা খ. কচুয়া থানা জেলা বাগেরহাট।	মীর সাখাওয়াত আলী দারু (আ.লীগ) এএসএম মুস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)	৫৭,৩৭৭ ৫১,৪৪৮
০৯৭ বাগেরহাট-৩	ক. রামপাল থানা খ. মংলা থানা জেলা বাগেরহাট।	তালুকদার আব্দুল খালেক (আ.লীগ) মওলানা গাজী আবু বক্কর (জামায়াতে ইসলামী)	৫২,৪৪৫ ৩৪,৩২১
০৯৮ বাগেরহাট-৪	ক. মোড়েলগঞ্জ থানা খ. শরণখোলা থানা জেলা বাগেরহাট।	ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন (আ.লীগ) এড. আলতাফ হোসেন (বিএনপি)	৫৫,২২৭ ২৯,৪২৯

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
০৯৯ খুলনা-১	ক. বাটিয়াঘাটা থানা	শেখ হাসিনা (আ. লীগ)	৬২,২৪৭
	খ. দাকোপ থানা	অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস (সিপিবি)	১৮,৩৯৮
	জেলা খুলনা।		
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে পঞ্চানন বিশ্বাস (স্ব) শেখ হাসিনার জায়গায় আসেন।		
১০০ খুলনা-২	ক. খুলনা মেট্রোপলিটান থানা	শেখ রাজ্জাক আলী (বিএনপি)	৫৬,৩০৬
	খ. সোনাডাংগা মেট্রোপলিটান থানা	মঞ্জুরুল ইমাম (আ.লীগ)	৫৪,৭৭৮
	জেলা খুলনা।		
১০১ খুলনা-৩	ক. খালিশপুর মেট্রোপলিটান থানা	কাজী সেকান্দার আলী (আ.লীগ)	৩৯,৩৩২
	খ. দৌলতপুর মেট্রোপলিটান থানা	মোঃ আশরাফ হোসেন (বিএনপি)	৩৭,৭৮০
	গ. খানজাহান আলী মেট্রোপলিটান থানা (আটরা, গিলাতলা ইউনিয়ন ব্যতীত)		
	জেলা খুলনা।		
১০২ খুলনা-৪	ক. রূপসা থানা	মোস্তফা রশিদী সুজা (আ.লীগ)	৫৯,৫৬৬
	খ. দিঘলিয়া থানা	মোঃ নুরুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৭,২২১
	গ. তেরখাদা থানা		
	জেলা খুলনা।		
১০৩ খুলনা-৫	ক. ফুলতলা থানা (আটরা, গিলাতলা ইউনিয়নসহ)	সালাহউদ্দিন ইউসুফ (আ.লীগ)	৭০,১৮৪
		অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম (বিএনপি)	৪৫,৫৮৪
	খ. ডুমুরিয়া থানা		
	জেলা খুলনা।		
১০৪ খুলনা-৬	ক. পাইকগাছা থানা এবং	শেখ মোঃ নুরুল হক (আ.লীগ)	৬৬,০৩৩
	খ. বয়রা থানা	শাহ্ মোঃ রুহুল কুদ্দুস (জামায়াতে ইসলামী)	৪৯,০২৩
	জেলা খুলনা।		
১০৫ সাতক্ষীরা-১	ক. কলারোয়া থানা এবং	সৈয়দ কামাল বখ্ত সাকি (আ.লীগ)	৭৬,৭১৮
	খ. তালা থানা	শেখ আনসার আলী (জামায়াতে ইসলামী)	৫১,০৫৪
	জেলা সাতক্ষীরা।		
১০৬ সাতক্ষীরা-২	সাতক্ষীরা সদর থানা	কাজী শামসুর রহমান (জা. ইস.)	৫৪,০৯৬
	জেলা সাতক্ষীরা।	সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ (জাপা)	৫৩,৭৮৭
১০৭ সাতক্ষীরা-৩	আশাশুনি থানা	ডাঃ এসএম মোখলেসুর রহমান (আ.লীগ)	৩৯,৭২২
	জেলা সাতক্ষীরা।	এড. সালাহউদ্দিন (জাপা)	৩২,০৮৭
১০৮ সাতক্ষীরা-৪	ক. দেবহাটা থানা	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (জাপা)	৪৬,৭৩০
	খ. কালিগঞ্জ থানা	মনসুর আহমেদ(আ.লীগ)	৪৪,২৭২
	জেলা সাতক্ষীরা।		

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১০৯ সাতক্ষীরা-৫	শ্যামনগর থানা জেলা সাতক্ষীরা	একে ফজলুল হক (আ.লীগ) মোঃ গাজী নজরুল ইসলাম (জা. ইস.)	৪০,৭২৫ ৩১,১৭২
১১০ বরগুনা-১	ক. বেতাগী থানা খ. বরগুনা সদর থানা জেলা বরগুনা।	এড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (আ.লীগ) আলহাজ্জ মওলানা আব্দুর রশিদ (ইস.ঐ.জো)	৫৪,৯৫৩ ২৮,৪৭৯
১১১ বরগুনা-২	ক. বামনা থানা খ. পাথরঘাটা থানা জেলা বরগুনা।	গোলাম সারোয়ার (হিরু)(ইস.ঐ.জো) নুরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)	২১,৮৪৮ ২০,৫০৫
১১২ বরগুনা-৩	আমতলী থানা জেলা বরগুনা।	মোঃ মজিবর রহমান তালুকদার (আ.লীগ) মোঃ মতিয়ার রহমান তালুকদার (জা পা)	৩০,৭১৪ ১৮,৯৪৪
১১৩ পটুয়াখালী-১	ক. মির্জাগঞ্জ থানা খ. পটুয়াখালী সদর থানা জেলা পটুয়াখালী।	এড. শাহজাহান মিয়া (আ.লীগ) মোঃ কেরামত আলী (বিএনপি)	৬৩,৯৫১ ৫২,৩৫৯
১১৪ পটুয়াখালী-২	বাউফল থানা জেলা পটুয়াখালী	এএসএম ফিরোজ (আ.লীগ) মোঃ শহীদুল আলম তালুকদার (বিএনপি)	৪৫,৯৩৭ ৪৫,৯১৩
১১৫ পটুয়াখালী-৩	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ ব্যতীত গলাচিপা থানা: ১) বড় বাইশদিয়া ২) চালতাবুনিয়া ৩) ছোট বাইশদিয়া ৪) রাংগাবালি ৫) চর মোন্তাজ খ. দশমিনা থানা জেলা পটুয়াখালী।	আখম জাহাঙ্গীর হোসেন (আ.লীগ) আলহাজ্জ মোঃ শাহজাহান খান (বিএনপি)	৫০,৬৩৯ ৩১,২৮১
১১৬ পটুয়াখালী-৪	ক. গলাচিপা থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: ১) বড় বাইশদিয়া ২) চলতাবুনিয়া ৩) ছোট বাইদিয়া ৪) রাংগাবালি ৫) চর মোন্তাজ খ. কলাপাড়া থানা জেলা পটুয়াখালী	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (আ.লীগ) মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)	৩১,০৯২ ২৩,৩৪৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১১৭ ভোলা-১	ভোলা সদর থানা জেলা ভোলা।	তোফায়েল আহমেদ (আ.লীগ) মোশাররফ হোসেন শাহজাহান (বিএনপি)	৫০,০৯৯ ৪৭,৭৫৯
১১৮ ভোলা-২	ক. দৌলতখান থানা খ. বোরহানউদ্দিন থানা জেলা ভোলা।	তোফায়েল আহমেদ (আ.লীগ) মোঃ হাফিজ ইব্রাহীম (আলাউদ্দীন) (বিএনপি)	৪৮,৯২৪ ৪০,৬৪৩
১১৯ ভোলা-৩	ক. তজুমুদ্দিন থানা খ. লালমোহন থানা জেলা ভোলা।	হাফিজউদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) অধ্যক্ষ একেএম নুরুল ইসলাম (আ.লীগ)	৭০,৮৪৩ ৪৪,০০৭
১২০ ভোলা-৪	ক. মনপুরা থানা খ. চরফ্যাশন থানা জেলা ভোলা।	মোঃ নাজিমুদ্দিন আলম (বিএনপি) মোঃ জাফরউল্লাহ চৌধুরী (আ.লীগ)	৬৪,৩২৮ ৪৩,২১৩
১২১ বরিশাল-১	ক. গৌরনদী থানা খ. আগৈলঝরা থানা জেলা বরিশাল।	আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ (আ.লীগ) কাজী গোলাম মাহবুব (বিএনপি)	৫২,৪১৮ ৫০,১২৫
১২২ বরিশাল-২	ক. বাবুগঞ্জ থানা খ. উজিরপুর থানা জেলা বরিশাল।	গোলাম ফারুক অভি (জাপা) সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন আলাল (বিএনপি)	৩৩,৫৫৬ ৩১,৮৪৪
১২৩ বরিশাল-৩	ক. হিজলা থানা খ. মুলাদী থানা জেলা বরিশাল।	মোশাররফ হোসেন মংগু (বিএনপি) অধ্যাপক আব্দুল বারি (আ.লীগ)	৪৮,০৪১ ৩০,৬৬৫
১২৪ বরিশাল-৪	মেহেদীগঞ্জ থানা জেলা বরিশাল।	শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসাইন (বিএনপি) মহিউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	৫০,৮৩০ ২২,৫৫৬
১২৫ বরিশাল-৫	বরিশাল সদর থানা জেলা বরিশাল।	ডাঃ এহতেশামুল হক নাসিম বিশ্বাস (বিএনপি) মাহবুবউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	৭০,৮০৪ ৪২,৯২২
১২৬ বরিশাল-৬	বাকেরগঞ্জ জেলা বরিশাল।	আলহাজ্জ সৈয়দ মাসুদ রেজা (আ.লীগ) অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রশিদ খান (বিএনপি)	৪১,৮৬৪ ৩৪,০৩৮
১২৭ ঝালকাঠি-১	ক. রাজাপুর থানা খ. কাঠালিয়া থানা জেলা ঝালকাঠি।	আনোয়ার হোসেন (জাপা) মোঃ শাহজাহান ওমর (বিএনপি)	২৭,৮১২ ২৬,০১৭
১২৮ ঝালকাঠি-২	ক. ঝালকাঠি সদর থানা খ. নলছিটি থানা জেলা ঝালকাঠি।	জুলফিকার আলী ভুট্টো (জাপা) গাজী আজিজ ফেরদৌস (বিএনপি)	৪৭,০৫০ ৩৮,৫২৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১২৯ পিরোজপুর-১	ক. নাজিরপুর থানা	মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (জা. ইস.)	৫৫,৭১৭
	খ. পিরোজপুর সদর থানা জেলা পিরোজপুর	সুধাংশু শেখর হালদার (আ.লীগ)	৫৫,৪৩৭
১৩০ পিরোজপুর-২	ক. কাউখালী থানা	আনোয়ার হোসেন (জাপা)	৩৩,৫১৯
	খ. ভাণ্ডারিয়া থানা জেলা পিরোজপুর।	আলতাফ হোসেন (আ.লীগ)	১৩,৮১১
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তাসমিমা হোসেন (জাপা) আনোয়ার হোসেনের জায়গায় আসেন।		
১৩১ পিরোজপুর-৩	মঠবাড়ীয়া থানা জেলা পিরোজপুর।	ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফারাজী (জাপা)	২৯,৮৩৭
		মহিউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	২৪,২৬৩
১৩২ বরিশালের সহিত পিরোজপুর	ক. বানারীপাড়া থানা বরিশাল	একে ফয়জুল হক (আ.লীগ)	৫৭,২৫৭
	খ. নেছারাবাদ(স্বরূপকাঠি) থানা জেলা পিরোজপুর।	সৈয়দ শহীদুল হক জামাল (বিএনপি)	৫০,৯৮৩
১৩৩ টাংগাইল-১	মধুপুর থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার (আ.লীগ)	৭৭,৭৩৮
		মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদার (বিএনপি)	৬৫,৮৩৪
১৩৪ টাংগাইল-২	ক. গোপালপুর থানা	খন্দকার আসাদুজ্জামান (আ.লীগ)	৭৭,০৮৬
	খ. ভূয়াপুর থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু (বিএনপি)	৬৮,৪০৬
১৩৫ টাংগাইল-৩	ঘাটাইল থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ লুৎফর রহমান খান আজাদ (বিএনপি)	৭৩,৮১৫
		শামসুর রহমান খান শাহজাহান (আ.লীগ)	৬৩,৫৩৮
১৩৬ টাংগাইল-৪	কালিহাতী থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী (আ. লীগ)	৭৫,৫৮১
		শাহজাহান সিরাজ (বিএনপি)	৬৩,৭২০
১৩৭ টাংগাইল-৫	ক. টাংগাইল সদর থানা	আব্দুল মান্নান (আ.লীগ)	৯৫,৯০৩
	খ. দেলদুয়ার থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ আবুল কাশেম (জাপা)	৬৯,৪৩০
১৩৮ টাংগাইল-৬	নাগরপুর থানা জেলা টাংগাইল।	গৌতম চক্রবর্তী (বিএনপি)	৩৪,২৭৯
		খন্দকার আব্দুল বাতেন (আ.লীগ)	৩২,৩২৯
১৩৯ টাংগাইল-৭	মির্জাপুর থানা জেলা টাংগাইল।	আবুল কালাম আজাদ (বিএনপি)	৫৯,৮৪৮
		একাব্বর হোসেন (আ.লীগ)	৫৪,৩০৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৪০ টাংগাইল-৮	ক. বাসাইল থানা খ. সুখিপুর থানা জেলা টাংগাইল।	মোঃ কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম (আ.লীগ) মোঃ কামরুজ্জামান খান (বিএনপি)	১,০০৩০৩ ৩৫,৩৪৩
১৪১ জামালপুর-১	ক. বক্সীগঞ্জ থানা খ. দেওয়ানগঞ্জ থানা	আবুল কালাম আজাদ (আ.লীগ) এমএ সাত্তার (জাপা)	৪৬,৭২২ ২৯,৩৪১
১৪২ জামালপুর-২	ইসলামপুর থানা জেলা জামালপুর।	হাজী মোঃ রাশেদ মোশাররফ (আ.লীগ) মোঃ সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)	৪১,৮১৬ ৩৬,৩৪৪
১৪৩ জামালপুর-৩	ক. মেলান্দহ থানা খ. মাদারগঞ্জ থানা জেলা জামালপুর।	মির্জা আযম (আ.লীগ) মোঃ এ হাই বাচ্চু মিয়া (বিএনপি)	৮০,০৫৬ ৪৪,৬৬৬
১৪৪ জামালপুর-৪	সরিষা বাড়ী থানা জেলা জামালপুর।	মওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম (আ.লীগ) মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদার (বিএনপি)	৬৩,৩৭৯ ৫৫,৬৬৯
১৪৫ জামালপুর-৫	জামারপুর সদর থানা জেলা জামালপুর।	মোঃ রেজাউল করিম হিরা (আ.লীগ) সিরাজুল হক (বিএনপি)	১,৩০,৮০৬ ৭৭,৮৬৫
১৪৬ শেরপুর-১	শেরপুর সদর থানা জেলা শেরপুর।	মোঃ আতিউর রহমান আতিক (আ.লীগ) রওশন এরশাদ (জাপা)	৫১,৭৮৭ ৩৫,৮৫১
১৪৭ শেরপুর-২	ক. নকলা থানা খ. নালিতাবাড়ী থানা জেলা শেরপুর।	বেগম মতিয়া চৌধুরী (আ.লীগ) আলহাজ্জ জাহেদ আলী চৌধুরী (বিএনপি)	৬৩,৫৭৪ ৪৫,৬৫৯
১৪৮ শেরপুর-৩	ক. শ্রীবর্দী থানা খ. ঝিনাইগাতি থানা জেলা শেরপুর।	এমএ বারী (আ.লীগ) মোঃ মাহমুদুল হক (বিএনপি)	৪২,৯৯৪ ৩৬,০৮৬
১৪৯ ময়মনসিংহ-১	হালুয়াঘাট থানা জেলা ময়মনসিংহ।	আলফাজ এইচ খান (বিএনপি) প্রমোদ মানকিন (আ.লীগ)	৪২,৩৪৯ ৩০,৪১০
১৫০ ময়মনসিংহ-২	ফুলপুর থানা জেলা ময়মনসিংহ।	মোঃ শামসুল হক (আ.লীগ) মোঃ আশরাফউদ্দিন সরকার (বিএনপি)	৫০,৪৯৭ ৪৩,০৩৭
১৫১ ময়মনসিংহ-৩	গৌরীপুর থানা জেলা ময়মনসিংহ।	এএফএম নজমুল হুদা (বিএনপি) মজিবর রহমান ফকির (আ.লীগ)	৩৪,৪৯৩ ২৯,০৭৩
১৫২ ময়মনসিংহ-৪	ময়মনসিংহ সদর থানা জেলা ময়মনসিংহ।	রওশন এরশাদ (জাপা) আমির আহমেদ চৌধুরী রতন (আ.লীগ)	৭২,১৩০ ৬১,৮৩১

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৫৩ ময়মনসিংহ-৫	মুক্তাগাছা থানা জেলা ময়মনসিংহ।	একেএম মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) শামসুল হুদা চৌধুরী (আ.লীগ)	৪৮,৩৩০ ৪৫,৭০৬
১৫৪ ময়মনসিংহ-৬	ফুলবাড়ীয়া থানা জেলা ময়মনসিংহ।	মোঃ মোসলেমউদ্দিন এড.(আ.লীগ) শামসুদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৪৭,৮২৭ ৩২,১৩৮
১৫৫ ময়মনসিংহ-৭	ত্রিশাল থানা জেলা ময়মনসিংহ।	রুহুল আমিন মাদানি (আ.লীগ) আব্দুল হান্নান (জাপা)	৪৬,৭৭২ ২৯,৪৫৬
১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	ঈশ্বরগঞ্জ থানা জেলা ময়মনসিংহ।	মোঃ আব্দুছ ছাত্তার (আ.লীগ) রওশন এরশাদ (জাপা)	৩৪,০২৯ ৩২,৯০৮
১৫৭ ময়মনসিংহ-৯	নান্দাইল থানা জেলা ময়মনসিংহ।	মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম (আ.লীগ) মোঃ জহুরুল ইসলাম খান (জাপা)	৪১,১৮২ ২৯,৫২২
১৫৮ ময়মনসিংহ-১০	গফরগাঁও থানা জেলা ময়মনসিংহ।	আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ (আ.লীগ) মোঃ ফজলুর রহমান সুলতান (বিএনপি)	৭০,৬৬৫ ৪৫,৪৬৪
১৫৯ ময়মনসিংহ-১১	ভালুকা থানা জেলা ময়মনসিংহ।	মোহাম্মদ আমানুল্লাহ (আ.লীগ) আলহাজ আমানুল্লাহ চৌধুরী (বিএনপি)	৫৭,১৩১ ২৬,২০৯
১৬০ ময়মনসিংহের সহিত নেত্রকোণা	ক. ধোবাউড়া থানা জেলা ময়মনসিংহ। খ. পূর্বধলা থানা জেলা নেত্রকোণা।	আলহাজ্জ ডাঃ মোহাম্মদ আলী (বিএনপি) ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল (আ.লীগ)	৫৬,৯২৪ ৫২,০২৮
১৬১ নেত্রকোণা-১	ক. দুর্গাপুর থানা এবং খ. কলমাকান্দা থানা জেলা নেত্রকোণা।	মোঃ জালাল উদ্দিন তালুকদার (আ.লীগ) মোঃ আব্দুল করিম এড. (বিএনপি)	৫৯,৫৭৪ ৫৫,০২৭
১৬২ নেত্রকোণা-২	ক. নেত্রকোণা সদর থানা খ. বারহাট্টা থানা জেলা নেত্রকোণা।	ফজলুর রহমান খান (আ.লীগ) হাজী মোঃ আবু আব্বাস (বিএনপি)	৭৫,৫৯৫ ৫২,২৫৩
১৬৩ নেত্রকোণা-৩	ক. আটপাড়া থানা খ. কেন্দুয়া থানা জেলা নেত্রকোণা।	মোঃ নুরুল আমিন তালুকদার (বিএনপি) মোঃ জুবেদ আলী (আ.লীগ)	৭০,৯৪৩ ৬২,৮১০
১৬৪ নেত্রকোণা-৪	ক. মোহনগঞ্জ থানা খ. মদন থানা গ. খালিয়াজুরী থানা জেলা নেত্রকোণা।	আব্দুল মমিন (আ.লীগ) মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)	৭০,৬৩০ ৫৪,৭৯৫

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১	ক. হোসেনপুর থানা খ. পাকুন্দিয়া থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	একেএম শামসুল হক (আ.লীগ) মোঃ ইদ্রিস আলী ভূঁইয়া (বিএনপি)	৫৮,২৩৩ ৩৮,২১৬
১৬৬ কিশোরগঞ্জ-২	কটিয়াদী থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	মেজর (অব:) মোঃ আখতারুজ্জামান (বিএনপি) এমএ আফজাল (আ.লীগ)	৪১,১২১ ২১,৫৫০
১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৩	কিশোরগঞ্জ সদর থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (আ.লীগ) মোঃ মাসুদ হেলালী (বিএনপি)	৫১,৯১১ ৩৯,৫৯১
১৬৮ কিশোরগঞ্জ-৪	ক. তাড়াইল থানা খ. করিমগঞ্জ থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	ডাঃ মিজানুল হক (আ.লীগ) মোঃ মজিবুল হক চুন্নু (জাপা)	৫২,২২০ ৫০,৩৯৩
১৬৯ কিশোরগঞ্জ-৫	ক. ইটনা থানা খ. মিঠামইন থানা গ. অষ্টগ্রাম থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	এড. মোঃ আব্দুল হামিদ (আ.লীগ) মোঃ ফজলুর রহমান (স্বতন্ত্র)	৫৪,০৭৩ ৫২,০২৪
১৭০ কিশোরগঞ্জ-৬	ক. নিকলী থানা খ. বাজিতপুর থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	মোঃ মজিবর রহমান (মনজু মিয়া)(বিএনপি) মোঃ আলাউল হক (আ.লীগ)	৪৭,১৭৬ ৪৪,২৬১
১৭১ কিশোরগঞ্জ-৭	ক. কুলিয়ারচর থানা এবং খ. ভৈরব বাজার থানা জেলা কিশোরগঞ্জ।	মোঃ জিল্লুর রহমান (আ.লীগ) মোঃ গিয়াসউদ্দিন (বিএনপি)	৮৪,৭৮২ ৬৭,৮০৫
১৭২ মানিকগঞ্জ-১	ক. দৌলতপুর থানা খ. ঘিওর থানা জেলা মানিকগঞ্জ।	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন (বিএনপি) এএম সাইদুর রহমান (আ.লীগ)	৪৪,৫০২ ৩৩,১৬১
১৭৩ মানিকগঞ্জ-২	ক. শিবালয় থানা খ. হরিরামপুর থানা জেলা মানিকগঞ্জ।	হারুনার রশিদ খান (বিএনপি) একেএম নুরুল ইসলাম (আ.লীগ)	৬৪,০৮৫ ২৭,৭৫০
১৭৪ মানিকগঞ্জ-৩	ক. সাটুরিয়া থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মানিকগঞ্জ সদর থানা: ১. পুটাইল ২. ভাড়ারিয়া ৩. হাটিপাড়া জেলা মানিকগঞ্জ।	নিজাম ইদ্দীন খান কর্ণেল (অব:)আব্দুল মালেক (আ.লীগ)	৬৪,৭১৫ ৩০,১২৬

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৭৫ মানিকগঞ্জ-৪	ক. মানিকগঞ্জ সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. পুটাইল ২. ভাড়ারিয়া ৩. হাটিপাড়া খ. সিংগাইর থানা জেলা মানিকগঞ্জ।	শামসুল ইসলাম খান (বিএনপি) মোঃ আলী জিলকত আহমেদ (আ.লীগ)	৬১,৮১৬ ৩৮,৭৯৬
১৭৬ মুন্সীগঞ্জ-১	ক. শ্রীনগর থানা খ. সিরাজদিখান থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. চিত্রকোট ২. শেখরনগর ৩. রাজনগর ৪. কেয়াইন ৫. বাসাইল ৬. কোলা গ. লৌহজং থানা জেলা মুন্সীগঞ্জ।	ডাঃ একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (বিএনপি) কাজী শহিদুন নবী (আ.লীগ)	৬২,৭৮৭ ৩৬,৪৭৩
১৭৭ মুন্সীগঞ্জ-২	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সিরাজদিখান থানা: ১. চিত্রকোট ২. শেখরনগর ৩. রাজনগর ৪. কেয়াইন ৫. বাসাইল ৬. কোলা জেলা মুন্সীগঞ্জ।	মিজানুর রহমান সিন্‌হা (বিএনপি) নুরুল ইসলাম খান বাদল (আ.লীগ)	৫৮,৪৫৫ ৩৯,০০৩
১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩	ক. টংগীবাড়ী থানা খ. মুন্সীগঞ্জ সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. রেকাবীবাজার ২. রামপাল ৩. মহাকালী ৪. বজ্রযোগিনী জেলা মুন্সীগঞ্জ।	এম শামসুল ইসলাম (বিএনপি) মোঃ লুৎফর রহমান (আ.লীগ)	৬৮,৭৯১ ৩৪,৬৭০
১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মুন্সীগঞ্জ সদর থানা: ১. বেকারীবাজার	আব্দুল হাই (বিএনপি) মোঃ মহিউদ্দিন (আ.লীগ)	৫৮,৭০৪ ৫১,৪৩০

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	২. রামপাল ৩. মহাকালী ৪. বজ্রযোগিনী খ. গজারিয়া থানা জেলা মুন্সীগঞ্জ।		
১৮০ ঢাকা-১	ক. দোহার থানা জেলা ঢাকা।	নাজমুল হুদা (বিএনপি) মোঃ হাশেম আলী (আ.লীগ)	৩৮,১৭২ ২০,০০৫
১৮১ ঢাকা-২	ক. নওয়াবগঞ্জ থানা জেলা ঢাকা।	আব্দুল মান্নান (বিএনপি) এ বাতেন মিঞা (আ.লীগ)	৫০,৮১৮ ৩৪,৩৪৪
১৮২ ঢাকা-৩	ক. কেরানীগঞ্জ থানা জেলা ঢাকা।	মোঃ আমানুল্লাহ আমান (বিএনপি) মোঃ শাহজাহান (আ.লীগ)	১,২৪,০৯৬ ৫২,৬৬২
১৮৩ ঢাকা-৪	ক. ডেমরা থানা এবং খ. সবুজবাগ থানার নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ: ১. মাণ্ডা ২. দক্ষিণগাঁও ৩. নন্দিপাড়া জেলা ঢাকা	হাবিবুর রহমান মোল্লা (আ.লীগ) আলহাজ্জ সালাহউদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	১,০২,৯৩৯ ৮১,৫২২
১৮৪ ঢাকা-৫	ক. গুলশান থানা খ. ক্যান্টনমেন্ট থানা গ. হরিরামপুর ইউনিয়ন ব্যতীত উত্তরা থানা, জেলা ঢাকা।	একেএম রহমতউল্লাহ (আ.লীগ) মেজর(অবঃ)মোঃ কামরুল ইসলাম (বিএনপি)	১,৩২,৪৪৩ ১,০৯,৩৭০
১৮৫ ঢাকা-৬	ক. মতিঝিল থানা খ. নিম্নলিখিত মৌজা বতীত সবুজবাগ থানা: ১. মাণ্ডা ২. দক্ষিণগাঁও ৩. নন্দিপাড়া জেলা ঢাকা।	সাবের হোসেন চৌধুরী (আ.লীগ) মির্জা আব্বাস (বিএনপি)	১,০৪,৬৯৪ ৯৫,৬৭৩
১৮৬ ঢাকা-৭	ক. সূত্রাপুর থানা খ. কোতয়ালী থানা জেলা ঢাকা।	সাদেক হোসেন (বিএনপি) ফজলুল করিম (আ.লীগ)	৮৭,২৫৫ ৮৪,৯৪০
১৮৭ ঢাকা-৮	লালবাগ থানা জেলা ঢাকা।	হাজী মোঃ সেলিম (আ.লীগ) আবুল হাসনাত (বিএনপি)	৭৭,৬৪২ ৫৮,৩৬৭

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৮৮ ঢাকা-৯	ক. ধানমণ্ডি থানা খ. মোহাম্মদপুর থানা জেলা ঢাকা	আলহাজ্জ মকবুল হোসেন (আ.লীগ) মীর শওকত আলী (বিএনপি)	৮৪,১৫০ ৭৫,৮৫৫
১৮৯ ঢাকা-১০	ক. তেজগাঁও থানা খ. রমনা থানা জেলা ঢাকা	ডাঃ এইচবিএম ইকবাল (আ.লীগ) মেজর আব্দুল মান্নান (বিএনপি)	৭৪,২১৪ ৬৩,৬৩১
১৯০ ঢাকা-১১	ক. মিরপুর থানা খ. পল্লবী থানা গ. উত্তরা থানার হরিরামপুর ইউনিয়ন জেলা ঢাকা।	কামাল আহমেদ মজুমদার (আ.লীগ) মেজর এখলাস উদ্দিন মোল্লা (বিএনপি)	১,২৮,৭৬৬ ১,০২,৩০৭
১৯১ ঢাকা-১২	সাভার থানা জেলা ঢাকা।	ডাঃ দেওয়ান মোঃ সালাহউদ্দিন (বিএনপি) মোঃ আশরাফউদ্দিন খান ইমু (আ.লীগ)	৭১,২৪৩ ৪৭,৩৪৩
১৯২ ঢাকা-১৩	ধামরাই থানা জেলা ঢাকা।	জিয়াউর রহমান খান (বিএনপি) খান মোঃ ইকবাল (আ.লীগ)	৭৬,৪২৭ ৪৫,১৬৪
১৯৩ গাজীপুর-১	ক. কালিয়াকৈর থানা খ. শ্রীপুর থানা জেলা গাজীপুর।	রহমত আলী (আ.লীগ) চৌধুরী তানভির আহমেদ সিদ্দিকী (বিএনপি)	৯৫,১২১ ৮১,৮৫৪
১৯৪ গাজীপুর-২	ক. গাজীপুর, সদর থানা খ. টংগী থানা জেলা গাজীপুর।	মোঃ আহসানউল্লাহ (আ.লীগ) অধ্যাপক এমএ মান্নান (বিএনপি)	৯৪,৭৩২ ৭৯,১৬৮
১৯৫ গাজীপুর-৩	কালিগঞ্জ থানা জেলা গাজীপুর।	আখতারুজ্জামান (আ.লীগ) একেএম ফজলুল হক মিলন (বিএনপি)	৩৫,৫০২ ৩০,৮৩৪
১৯৬ গাজীপুর-৪	কাপাসিয়া থানা জেলা গাজীপুর।	আফসার উদ্দিন আহমেদ খান (আ.লীগ) এএসএম হান্নান শাহ (বিএনপি)	৫৬,৫০৪ ৪৯,৬২৭
১৯৭ নরসিংদী-১	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নরসিংদী থানা: ১. আমদিয়া ২. পাঁচদোনা ৩. মেহের পাড়া জেলা নরসিংদী।	শামসুদ্দিন আহমেদ ইসহাক (বিএনপি) মোঃ আসাদুজ্জামান (আ.লীগ)	৫৮,৩৪২ ৪৫,৩৫৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
১৯৮ নরসিংদী-২	ক. নরসিংদী সদর থানা নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. আমদিয়া ২. পাঁচদোনা ৩. মেহেরপাড়া খ. পলাশ থানা, জেলা নরসিংদী	ডঃ এ.মইন খান (বিএনপি) আজমল কবির (জাপা)	৪৫,২৪৩ ২৩,৭৪৭
১৯৯ নরসিংদী-৩	ক. শিবপুর থানা জেলা নরসিংদী।	আব্দুল মান্নান ভুইয়া (বিএনপি) মাহবুবুর রহমান ভুইয়া (আ.লীগ)	৪৮,৯৩৬ ২৬,৪৪১
২০০ নরসিংদী-৪	ক. মনোহরদী থানা খ. বেলাবো থানা জেলা নরসিংদী।	মোঃ নুরুদ্দীন খান (আ.লীগ) সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল (বিএনপি)	৭৮,৭২৩ ৭৭,৬২০
২০১ নরসিংদী-৫	রায়পুরা থানা জেলা নরসিংদী।	রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু (আ.লীগ) আব্দুল আলী মৃধা (বিএনপি)	৭৫,৬৭২ ৬১,৮৬২
২০২ নারায়ণগঞ্জ-১	রূপগঞ্জ থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ	মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহ (আ.লীগ) আব্দুল মতিন চৌধুরী (বিএনপি)	৬৪,৮৭৮ ৫৩,৯৭১
২০৩ নারায়ণগঞ্জ-২	আড়াই হাজার থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ	মোঃ এমদাদুল হক ভুইয়া (আ.লীগ) মোঃ আতাউর রহমান খান (বিএনপি)	৫৮,৯৪৭ ৫৮,৩৮৮
২০৪ নারায়ণগঞ্জ-৩	সোনারগাঁও থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ	মোঃ রেজাউল করিম (বিএনপি) মোঃ আবুল হাসনাত (আ.লীগ)	৫০,৭৯১ ৩৮,৫২৯
২০৫ নারায়ণগঞ্জ-৪	নারায়নগঞ্জ সদর থানার নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ: ১. গগনগর ইউনিয়ন ২. আলীরটেক ইউনিয়ন ৩. গোদনাইল (পৌর ও পল্লী এলাকা) ৪. সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ৫. সুমিলপাড়া ইউনিয়ন ৬. বক্তাবলী ইউনিয়ন ৭. কাশীপুর ইউনিয়ন ৮. এনায়েতনগর ইউনিয়ন ৯. কুতুবপুর ইউনিয়ন ১০. ফতুল্লা (পৌর ও পল্লী এলাকা) জেলা নারায়ণগঞ্জ	একেএম শামীম ওসমান (আ.লীগ) সিরাজুল ইসলাম (বিএনপি)	৭৩,৩৪৯ ৬৩,৮৬৬

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৫	ক. নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ সদর থানা: ১. গগনগর ইউনিয়ন ২. আলীরেটক ইউনিয়ন ৩. গোদনাইল (পৌর ও পল্লী এলাকা) ৪. সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ৫. সুমিলপাড়া ইউনিয়ন ৬. বক্তাবলী ইউনিয়ন ৭. কাশীপুর ইউনিয়ন ৮. এনায়েতনগর ইউনিয়ন ৯. কুতুবপুর ইউনিয়ন ১০. ফতুল্লা(পৌর ও পল্লী এলাকা) খ. বন্দর থানা জেলা নারায়ণগঞ্জ।	এসএম আকরাম (আ.লীগ) এড. আবুল কালাম (বিএনপি)	৫৮,৪৮৩ ৪৩,৫৬২
২০৭ রাজবাড়ী-১	ক. রাজবাড়ী সদর থানা এবং খ. গোয়ালন্দ ঘাট থানা, জেলা রাজবাড়ী।	কাজি কেরামত আলী (আ.লীগ) গোলাম মুস্তাফা (জাপা)	৫১,৯৬৫ ৪২,৮৮১
২০৮ রাজবাড়ী-২	ক. রাজবাড়ী সদর থানা খ. বালিয়াকান্দি থানা জেলা রাজবাড়ী।	জিল্লুল হাকিম (আ.লীগ) আলহাজ্জ এবিএম নুরুল ইসলাম (জাপা)	৮৮,৬৬২ ৬১,৬৫৩
২০৯ ফরিদপুর-১	ক. মধুখালী থানা খ. বোয়ালমারী থানা গ. আলফাডাংগা থানা	কাজি সিরাজুল ইসলাম (আ.লীগ) শাহ মোঃ আবু জাফর (জাপা)	৯৩,৮৬৪ ৮৪,৯৮৫
২১০ ফরিদপুর-২	নগরকান্দা থানা জেলা ফরিদপুর।	কেএম ওবায়দুর রহমান (বিএনপি) সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (আ.লীগ)	৫৫,১১৮ ৫৪,৫৭২
২১১ ফরিদপুর-৩	ফরিদপুর সদর থানা জেলা ফরিদপুর।	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি) খন্দকার মোশাররফ হোসেন (আ.লীগ)	৬০,৭৭৯ ৪৪,৫১১
২১২ ফরিদপুর-৪	ক. চরভদ্রাসন থানা খ. সদরপুর থানা জেলা ফরিদপুর।	এড. মোঃ মোশাররফ হোসেন (আ.লীগ) চৌধুরী আকমল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি)	৪৫,৫৮০ ৩২,৬৩০
২১৩ ফরিদপুর-৫	ভাংগা থানা জেলা ফরিদপুর।	ডাঃ কাজি আবু ইউসুফ (আ.লীগ) লুৎফর রহমান ফারুক (জাপা)	৫৪,৩৫৫ ১৬,৬৬৮
২১৪ গোপালগঞ্জ-১	ক. মকসুদপুর থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ	ফারুক খান (আ.লীগ) একে ইমাদুল হক (জা. ইস)	১,১৯,৫৩৬ ৫,২৩৬

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	ব্যতীত কাশিয়ানী থানা: ১. সিংগা ২. হাতিয়ারা ৩. পুইসুর ৪. বেথুরী ৫. নিজামকান্দি ৬. ওরাকান্দি ৭. ফুকরা জেলা গোপালগঞ্জ।		
২১৫ গোপালগঞ্জ-২	ক. কাশিয়ানী থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. সিংগা ২. হাতিয়ারা ৩. পুইসুর ৪. বেথুরী ৫. নিজামকান্দি ৬. ওরাকান্দি ৭. ফুকরা জেলা গোপালগঞ্জ।	শেখ ফজলুল করিম সেলিম (আ.লীগ) শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর (বিএনপি)	১,১৫,০৩২ ৭,৮২৫
২১৬ গোপালগঞ্জ-৩	ক. টুংগীপাড়া থানা খ. কোটালীপাড়া থানা জেলা গোপালগঞ্জ।	শেখ হাসিনা (আ.লীগ) বিষ্ণুপদ হালদার (বিএনপি)	১,০২,৬৮৯ ২,৫৬৮
২১৭ মাদারীপুর-১	শিবচর থানা জেলা মাদারীপুর।	নূর-ই আলম চৌধুরী লিটন (আ.লীগ) আবুল খায়ের চৌধুরী (বিএনপি)	৬১,০১২ ২৯,৩১২
২১৮ মাদারীপুর-২	ক. রাজৈর থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাদারীপুর সদর থানা: ১. খোয়াজপুর ২. ঝাউদি ৩. ঘটমাঝি ৪. মোস্তফাপুর ৫. কেন্দুয়া জেলা মাদারীপুর।	শাহজাহান খান (আ.লীগ) কাজি মাহবুব আহমেদ মিলন (বিএনপি)	৯২,৪৯২ ২৫,৩৯৭
২১৯ মাদারীপুর-৩	ক. মাদারীপুর সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. খোয়াজপুর	আলহাজ্জ সৈয়দ আবুল হোসেন (আ.লীগ) খন্দকার মাশুকুর রহমান (বিএনপি)	৭১,৯২২ ২৩,৭২০

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	২. ঝাউদি ৩. ঘটমাঝি, ৪. মোস্তফাপুর ৫. কেন্দুয়া খ. কালকিনী থানা জেলা মাদারীপুর।		
২২০ শরিয়তপুর-১	ক. জাজিরা থানা খ. শরিয়তপুর সদর থানা জেলা শরিয়তপুর।	আব্দুর রাজ্জাক (আ.লীগ) হাজি মোঃ আমজাদ হোসেন (বিএনপি)	৬৮,৯৩৭ ৩২,২৬৬
	বি-দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মাষ্টার মুজিবুর রহমান (আ. লীগ)আব্দুর রাজ্জাকের জায়গায় আসেন।		
২২১ শরিয়তপুর-২	ক. নড়িয়া থানা জেলা শরিয়তপুর।	কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী (আ.লীগ) টিএম গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৪৮,৭৫৩ ২০,৬২৬
২২২ শরিয়তপুর-৩	ক. ভেদরগঞ্জ থানা খ. ডামুড্যা থানা গ. গোসাইরহাট থানা জেলা শরিয়তপুর।	আব্দুর রাজ্জাক (আ.লীগ) মোঃ শফিকুর রহমান কিরণ (বিএনপি)	৮২,৫৪৩ ৭৭,৩৩৯
২২৩ সুনামগঞ্জ-১	ক. ধর্মপাশা থানা খ. তাহিরপুর থানা গ. জামালগঞ্জ থানা জেলা সুনামগঞ্জ।	সৈয়দ রফিকুল হক (আ.লীগ) নজির হোসেন (বিএনপি)	৬৮,৭৮৭ ৬৭,৩১২
২২৪ সুনামগঞ্জ-২	ক. দিরাই থানা এবং খ. শাল্লা থানা জেলা সুনামগঞ্জ।	নাসিরউদ্দিন চৌধুরী (জাপা) সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (আ.লীগ)	৫৯,০০০ ৫৮,৪৯৬
২২৫ সুনামগঞ্জ-৩	ক. জগন্নাথপুর থানা খ. সুনামগঞ্জ সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. দুর্গাপাশা ২. পূর্ব পাগলা ৩. পশ্চিম পাগলা ৪. পূর্ব বীরগাঁও ৫. পশ্চিম বীরগাঁও ৬. পাথারিয়া ৭. জয়কলস ৮. শিমুলবাক জেলা সুনামগঞ্জ।	আব্দুস সামাদ আজাদ (আ.লীগ) ফারুক রশিদ চৌধুরী (জাপা)	৪২,৮৫১ ৩২,৩২৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২২৬ সুনামগঞ্জ-৪	ক. নিম্নলিখিত উইনিয়নসমূহ ব্যতীত সুনামগঞ্জ সদর থানা: ১. দুর্গাপাশা ২. পূর্ব পাগলা ৩. পশ্চিম পাগলা ৪. পূর্ব বীরগাঁও ৫. পশ্চিম বীরগাঁও ৬. পাথরিয়া ৭. জয়কলস ৮. শিমুলবাক খ. বিশ্বম্ভরপুর থানা জেলা সুনামগঞ্জ।	মোঃ ফজলুল হক (বিএনপি) আব্দুজ জহুর (আ.লীগ)	৩৬,১৫৫ ৩৪,৩৬০
২২৭ সুনামগঞ্জ-৫	ক. ছাতক থানা খ. দোয়ারা বাজার থানা জেলা সুনামগঞ্জ।	মোঃ মহিবুর রহমান মানিক (আ.লীগ) ব্যারিস্টার মোঃ ইয়াহিয়া (জাপা)	৪২,৭২০ ৪১,১২০
২২৮ সিলেট-১	ক. কোম্পানীগঞ্জ থানা খ. নিম্নলিখিত ইউনিয়ন এলাকাসমূহ ব্যতীত সিলেট সদর থানা ১. মুলারগাও ২. বড়ইকান্দি ৩. তেতলী ৪. লালাবাজার ৫. সিলাম ৬. জালালপুর ৭. কুচাই ৮. মোগলাবাজার ৯. দাউদপুর ১০. জেলা সিলেট।	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (আ.লীগ) মোঃ সাইফুর রহমান (বিএনপি)	৫৯,৭১০ ৫৮,৯৯০
২২৯ সিলেট-২	ক. বিশ্বনাথ থানা খ. বালাগঞ্জ থানা জেলা সিলেট।	শাহ আজিজুর রহমান (আ.লীগ) মাকসুদ ইবনে আজিজ লামা (জাপা)	৪২,২৬৬ ৩৯,০৪৪
২৩০ সিলেট-৩	ক. সিলেট সদরথানার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ও এলাকাসমূহ ১. মুলারগাঁও ২. বড়ইকান্দি ৩. তেতলী, ৪. লালাবাজার,	এ. মুকিত খান (জাপা) মাহমুদ-উস- সামাদ চৌ.(আ.লীগ)	২৬,৬৫৯ ২৬,১৬৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	৫. সিলাম ৬. জালালপুর ৭. কুচাই ৮. মোগলাবাজার ৯. দাউদপুর খ. ফেঞ্চুগঞ্জ থানা জেলা সিলেট।		
২৩১ সিলেট-৪	ক. গোয়াইনঘাট থানা খ. জৈন্তাপুর থানা জেলা সিলেট।	মোঃ সাইফুর রহমান (বিএনপি) ইমরান আহমেদ (আ.লীগ)	২৩,৯৪৬ ২২,৭২৫
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে ইমরান আহমেদ (আ.লীগ) সাইফুর রহমানের জায়গায় আসেন।		
২৩২ সিলেট-৫	ক. কানাইঘাট থানা খ. জকিগঞ্জ থানা জেলা সিলেট।	হাফিজ আহমেদ মজুমদার (আ.লীগ) মোঃ ফরিদউদ্দিন চৌধুরী (জামায়াতে ইসলামী)	২৯,৪৮৩ ২৮,১২০
২৩৩ সিলেট-৬	ক. বিয়ানীবাজার থানা খ. গোলাপগঞ্জ থানা জেলা সিলেট।	নুরুল ইসলাম নাহিদ (আ.লীগ) মোঃ মোজাম্মেল আলী (জাপা)	৫৩,৯৬৫ ৩৪,৬৯১
২৩৪ মৌলভীবাজার-১	বড়লেখা থানা জেলা মৌলভীবাজার।	মোঃ শাহাবউদ্দিন (আ.লীগ) এবাদুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)	৩৩,১৭৯ ২০,০৪৭
২৩৫ মৌলভীবাজার-২	কুলাউড়া থানা জেলা মৌলভীবাজার।	সুলতান মোঃ মনসুর আহমেদ (আ.লীগ) নওয়াব আলী আব্বাস খান (জাপা)	৫২,৫৮২ ৩৯,৯৯২
২৩৬ মৌলভীবাজার-৩	ক. রাজনগর থানা খ. মৌলভীবাজার সদর থানা জেলা মৌলভীবাজার।	মোঃ সাইফুর রহমান (বিএনপি) আজিজুর রহমান (আ.লীগ)	৮৪,২৯২ ৬৩,১৭৭
২৩৭ মৌলভীবাজার-৪	ক. কমলগঞ্জ থানা খ. শ্রীমঙ্গল থানা জেলা মৌলভীবাজার।	মোঃ আব্দুস শহীদ (আ.লীগ) মোঃ আহাদ মিয়া (জাপা)	৯১,৮১১ ৫৯,৮২৫
২৩৮ হবিগঞ্জ-১	ক. নবীগঞ্জ থানা খ. বাহুবল থানা জেলা হবিগঞ্জ।	দেওয়ান ফরিদ গাজী (আ.লীগ) খলিলুর রহমান চৌধুরী (জাপা)	৫২,৯৪০ ৪৪,১১৩
২৩৯ হবিগঞ্জ-২	ক. আজমিরীগঞ্জ থানা খ. বানিয়াচং থানা জেলা হবিগঞ্জ।	শরিফউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ) জাকারিয়া খান চৌধুরী (বিএনপি)	৫১,৩৫৯ ৩৪,৫৩০

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২৪০ হবিগঞ্জ-৩	ক. হবিগঞ্জ সদর থানা খ. লাখাই থানা জেলা হবিগঞ্জ।	আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌ.(জাপা) মোঃ শহীদউদ্দিন চৌধুরী (আ লীগ)	৫৫,৭৯৫ ৪৫,৪৯৩
২৪১ হবিগঞ্জ-৪	ক. চুনারুঘাট থানা এবং খ. মাধবপুর থানা জেলা হবিগঞ্জ।	এনামুল হক (আ.লীগ) সৈয়দ মোঃ ফয়সাল (বিএনপি)	৭০,২৪০ ৫৯,৬৬৬
২৪২ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	নাসিরনগর থানা জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	মোঃ ছায়েদুল হক (আ.লীগ) মোঃ আহসানুল হক (জাপা)	৩৩,৩৭৯ ২৮,২৮০
২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	ক. সরাইল থানা খ. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. বুধন্তী ২. চান্দুরা, ৩. মজলিশপুর ৪. সুহিলপুর (উত্তর) ৫. তাল শহর (পূর্ব) জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	আব্দুস সাত্তার ভুইয়া (বিএনপি) আব্দুল হালিম (আ.লীগ)	৫৩,৯৩২ ৪৬,৬৮২
২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর থানা: ১. বুধন্তী ২. চান্দুরা, ৩. মজলিশপুর ৪. সুহিলপুর (উত্তর) ৫. তাল শহর (পূর্ব) জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	হারুন আল রশিদ (বিএনপি) লুৎফুল হাই সাচ্চু (আ.লীগ)	৭৭,২০৪ ৭২,৫২৫
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	ক. আখাউড়া থানা খ. কসবা থানা জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	শাহ আলম এড. (আ.লীগ) শহীদুল হোসেন (জাপা)	৪১,৬১৫ ৪০৯৮৯
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	নবীনগর থানা জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	এড. আব্দুল লতিফ (আ.লীগ) তকদীর হোসেন মোঃ জসিম (বিএনপি)	৬০,৪৭৪ ৩৯,৩৭১
২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	বান্ছারামপুর থানা জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	এবি তাজুল ইসলাম (আ.লীগ) ডাঃ রওশন আলম (বিএনপি)	৪৮,৮৭২ ৩৯,৫৩১
২৪৮ কুমিল্লা-১	হোমনা থানা জেলা কুমিল্লা।	এমকে আনোয়ার (বিএনপি) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার (আ.লীগ)	৬৯,৩৫৬ ২৯,৫৯৪

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২৪৯ কুমিল্লা-২	দাউদকান্দি থানা জেলা কুমিল্লা।	ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন(বিএনপি) হাসান জামিল সাত্তার (জাপা)	৬৯,১৭৫ ৬৪,৪৬১
২৫০ কুমিল্লা-৩	মুরাদনগর থানা জেলা কুমিল্লা।	কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ (জাপা) ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুণ (আ.লীগ)	৫৩,৮৯২ ৫০,০৬৩
২৫১ কুমিল্লা-৪	দেবিদ্বার থানা জেলা কুমিল্লা।	মনজুরুল আহসান মুন্সী (বিএনপি) এবিএম গোলাম মোস্তফা (জাপা)	৪৬,১৩৫ ৩৯,২০৯
২৫২ কুমিল্লা-৫	ক. ব্রাহ্মণপাড়া থানা খ. বুড়িচং থানা জেলা কুমিল্লা।	এড. আব্দুল মতিন খসরু (আ.লীগ) আব্দুল কাশেম (বিএনপি)	৫১,১৮৪ ৩৮,৩৭৮
২৫৩ কুমিল্লা-৬	চান্দিনা থানা জেলা কুমিল্লা।	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ (আ.লীগ) রেদোয়ান আহমেদ (বিএনপি)	৩৭,০৯০ ৩৬,৭২৪
২৫৪ কুমিল্লা-৭	বড়ুয়া থানা জেলা কুমিল্লা।	মোঃ আব্দুল হাকিম (আ.লীগ) একেএম আবু তাহের (বিএনপি)	৪৪,৮৫৫ ৪১,২২৪
২৫৫ কুমিল্লা-৮	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যবতীত কুমিল্লা সদর থানা: ১. বারপাড়া ২. জোরকারণ (পূর্ব ও পশ্চিম) ৩. গালিয়ারা ৪. চৌয়ারা ৫. বিজয়পুর জেলা কুমিল্লা।	লে.কর্ণেল আকবর হোসেন (বিএনপি) এটিএম শামসুল হক (আ.লীগ)	৫১,০৮০ ৩৮,৫৫৭
২৫৬ কুমিল্লা-৯	ক. কুমিল্লা সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. বারপাড়া ২. জোরকারণ (পূর্ব ও পশ্চিম) ৩. গালিয়ারা ৪. চৌয়ারা ও ৫. বিজয়পুর খ. লাকসাম থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. বাগমার ২. ভুলইন ৩. পেরুল ৪. বেলবড় জেলা কুমিল্লা।	এএইচএম মুস্তাফা কামাল (আ.লীগ) মোঃ মনিরুল হক চৌধুরী (জাপা)	৫৭,১৯৫ ৪৭,৫৭০

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২৫৭ কুমিল্লা-১০	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লাকসাম থানা: ১. বাগমার ২. ভুলইন ৩. পেরুল ৪. বেলবড় জেলা কুমিল্লা।	মোঃ তাজুল ইসলাম (আ.লীগ) এটিএম আলমগীর (বিএনপি)	৪৯,২৯৮ ৪৬,৪৭৯
২৫৮ কুমিল্লা-১১	লাংগলকোট থানা জেলা কুমিল্লা।	মোঃ জয়নুল আবেদীন ভুইয়া (আ.লীগ) ডাঃ একেএম কামরুজ্জামান (বিএনপি)	৩৮,৩৮২ ২৭,৯১৫
২৫৯ কুমিল্লা-১২	চৌদ্দগ্রাম থানা জেলা কুমিল্লা।	মোঃ মজিবুল হক (আ.লীগ) ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের (জা. ইস)	৪৯,৭৬৭ ২৫,৯৮৪
২৬০ চাঁদপুর-১	কচুয়া থানা জেলা চাঁদপুর	আবু নাসের মোঃ এহসানুল হক (বিএনপি) আলহাজ্জ মেসবাহউদ্দিন খান (আ.লীগ)	৩৪,২৪০ ৩১,২১৪
২৬১ চাঁদপুর-২	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মতলব থানা: ১. নায়েরগাঁও (উত্তর) ২. নায়েরগাঁও (দক্ষিণ) ৩. নারায়নপুর ৪. খাদেরগাঁও ৫. মতলব (উত্তর) ৬. মতলব (দক্ষিণ ৭. উপাদী (উত্তর) ৮. উপাদী (দক্ষিণ) জেলা চাঁদপুর	মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (আ.লীগ) মোঃ নুরুল হুদা (বিএনপি)	৭৫,৩৮৪ ২৪,০৯৬
২৬২ চাঁদপুর-৩	ক. মতলব থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. নায়েরগাঁও (উত্তর) ২. নায়েরগাঁও (দক্ষিণ) ৩. নারায়নপুর ৪. খাদেরগাঁও ৫. মতলব (উত্তর) ৬. মতলব (দক্ষিণ) ৭. উপাদী (উত্তর) ও ৮. উপাদী (দক্ষিণ) খ. চাঁদপুর সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ:	জিএম ফজলুল হক (বিএনপি) ফ্লাইট লেফ. (অব:) এবি সিদ্দিক (আ.লীগ)	৩৯,৪১৫ ৩২,৪১৯

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	১. বিষ্ণুপুর ২. আশিকাটি ৩. রামপুর ৪. কল্যাণপুর ৫. শাহমোহাম্মদপুর জেলা চাঁদপুর		
২৬৩ চাঁদপুর-৪	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত চাঁদপুর সদর থানা: ১. বিষ্ণুপুর ২. আশিকাটি ৩. রামপুর ৪. কল্যানপুর ৫. শাহমোহাম্মদপুর খ. হাইনচর থানা জেলা চাঁদপুর	অধ্যাপক মোঃ আবদুল্লাহ (বিএনপি) মোঃ ফজলুল হক সরকার (আ.লীগ)	৬৩,০৫০ ৫৮,৫৮১
২৬৪ চাঁদপুর-৫	ক. হাজীগঞ্জ থানা খ. শাহরাস্তি থানা জেলা চাঁদপুর	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (আ.লীগ) এমএ মতিন (বিএনপি)	৬২,৩০৯ ৬১,৮৯৫
২৬৫ চাঁদপুর-৬	ফরিদগঞ্জ থানা জেলা চাঁদপুর।	আলমগীর হায়দার খান (বিএনপি) মোঃ সফিউল্লাহ (আ.লীগ)	৪৮,৪৮২ ২৯,৯২৪
২৬৬ ফেনী-১	ক. পরশুরাম থানা খ. ছাগলনাইয়া থানা জেলা ফেনী।	বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি) মোঃ ওয়াজিউল্লাহ ভুইয়া (আ.লীগ)	৬৫,০৮৬ ২৪,১৩৮
২৬৭ ফেনী-২	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ফেনী সদর থানা: ১. ফরহাদনগর ২. ধলিয়া ৩. লেমুয়া ৪. ছনুয়া ৫. ফাজিলপুর খ. দাগনভূঞা থানা জেলা ফেনী।	জয়নাল আবেদীন হাজারী (আ.লীগ) ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (বিএনপি)	৬৮,৫৬৬ ৬২,৬৪৭
২৬৮ ফেনী-৩	ক. সোনাগাজী থানা এবং খ. ফেনী সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ:	মোঃ মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) জয়নাল আবেদীন হাজারী (আ.লীগ)	৫ ৮,৪৩৯ ৪২,১৮২

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	১. ফরহাদনগর ২. ধলিয়া ৩. লেমুয়া ৪. ছনুয়া ৫. ফাজিলপুর জেলা ফেনী।		
২৬৯ নোয়াখালী-১	সেনবাগ থানা জেলা নোয়াখালী	জয়নুল আবেদীন ফারুক (বিএনপি) মোঃ ভিপি মোস্তফা (আ.লীগ)	৩১,১৮৭ ১৫,৪৪০
২৭০ নোয়াখালী-২	বেগমগঞ্জ থানা জেলা নোয়াখালী।	বরকতউল্লাহ বুলু (বিএনপি) এমএ সাত্তার ভুইয়া (আ.লীগ)	৮৪,৩০৭ ৫৩,৯৮৭
২৭১ নোয়াখালী-৩	চাটখিল থানা জেলা নোয়াখালী।	মাহবুবুর রহমান (বিএনপি) মাহমুদুর রহমান বেলায়েত (আ.লীগ)	২৫,৫৭০ ১৬,৪৫৮
২৭২ নোয়াখালী-৪	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নোয়াখালী সদর থানা: ১. বাটইয়া ২. নরোত্তমপুর ৩. সুন্দলপুর ৪. ঘোষবাগ ৫. চাপরশিরহাট ৬. নিয়াজপুর ৭. অশ্বদিয়া জেলা নোয়াখালী।	মোঃ শাহজাহান (বিএনপি) খায়রুল আনাম সেলিম (আ.লীগ)	৬১,৬৩২ ৫৩,৪১৩
২৭৩ নোয়াখালী-৫	ক. নোয়াখালী সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. বাটইয়া ২. নরোত্তমপুর ৩. সুন্দলপুর ৪. ঘোষবাগ, ৫. চাপরাশিরহাট ৬. নিয়াজপুর ৭. অশ্বদিয়া খ. কোম্পানীগঞ্জ থানা জেলা নোয়াখালী।	ওবায়দুল কাদের (আ.লীগ) ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ (জাপা)	৪০,২৮০ ২৮,৭৪৪
২৭৪ নোয়াখালী-৬	হাতিয়া থানা জেলা নোয়াখালী।	মোঃ ফজলুল আজিম (বিএনপি) প্রফেসর মোঃ ওয়ালিউল্লাহ (আ. লীগ)	৩০,১৪৮ ২৭,৩৫৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২৭৫ লক্ষ্মীপুর-১	রামগঞ্জ থানা জেলা লক্ষ্মীপুর।	জিয়াউল হক জিয়া (বিএনপি) শফিকুল ইসলাম (আ.লীগ)	২৮,৫৭৭ ১৭,২৪৪
২৭৬ লক্ষ্মীপুর-২	ক. রায়পুর থানা খ. লক্ষ্মীপুর সদর থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. চররুহিতা ২. দালাল বাজার, ৩. দক্ষিণ হামছাদী ৪. উত্তর হামছাদী ৫. বসিকপুর ৬. পার্বতীনগর ৭. শাকচর জেলা লক্ষ্মীপুর।	বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি) তোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী (আ.লীগ)	৫৯,০৫৪ ২৬,৯৩৬
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে হারুনুর রশিদ (আ.লীগ) খালেদা জিয়ার জায়গায় আসেন।		
২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লক্ষ্মীপুর সদর থানা: ১. চররুহিতা ২. দালালবাজার ৩. দক্ষিণ হামছাদী ৪. উত্তর হামছাদী ৫. বসিকপুর ৬. পার্বতীনগর ৭. শাকচর জেলা লক্ষ্মীপুর।	এড. খায়রুল এনাম (বিএনপি) একেএম শাহজাহান কামাল (আ.লীগ)	৪২,২৩২ ২৭,৭৮৭
২৭৮ লক্ষ্মীপুর-৪	রামগতি থানা জেলা লক্ষ্মীপুর।	এএসএম আব্দুর রব (জাসদ-রব) আব্দুর রব চৌধুরী (বিএনপি)	৩৭,২৮২ ৩৫,০৩১
২৭৯ চট্টগ্রাম-১	মীরস্বরাই থানা জেলা চট্টগ্রাম।	বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি) ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন (আ.লীগ)	৬৬,৩৩৬ ৬২,০৪৩
	বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মোশাররফ হোসেন (আ.লীগ) খালেদা জিয়ার জায়গায় আসেন।		
২৮০ চট্টগ্রাম-২	সীতাকুণ্ড থানা জেলা চট্টগ্রাম।	এবিএম আবুল কাশেম (আ.লীগ) এলকে সিদ্দিকী (বিএনপি)	৪৫,৪৭৮ ৪৩,১২১
২৮১ চট্টগ্রাম-৩	সন্দীপ থানা জেলা চট্টগ্রাম।	মুস্তাফিজুর রহমান (আ.লীগ) মোস্তফা কামালা পাশা (বিএনপি)	৪০,৯১১ ৩৩,৫৫৭

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
২৮২ চট্টগ্রাম-৪	ফটিকছড়ি থানা জেলা চট্টগ্রাম।	মোঃ রফিকুল আনোয়ার (আ.লীগ) জামালউদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৭২,৫৪৬ ৫৫,৭০৩
২৮৩ চট্টগ্রাম-৫	হাটহাজারী থানা জেলা চট্টগ্রাম।	সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম (বিএনপি) মোঃ আব্দুস সালাম (আ.লীগ)	৫৭,০১০ ৪২,৩১১
২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	রাউজান থানা জেলা চট্টগ্রাম।	গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী (বিএনপি) এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী (আ.লীগ)	৫০,০৫৯ ৩৫,৯৯৩
২৮৫ চট্টগ্রাম-৭	রাংগুনিয়া থানা জেলা চট্টগ্রাম।	সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী (বিএনপি) মোঃ সাদেক চৌধুরী (আ.লীগ)	৩৯,২৯৬ ৩৪,৭৫৪
২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	ক. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ ব্যতীত ডবলমুরিং থানা: ১. ২৯ নং ওয়ার্ড ২. ৩০ নং ওয়ার্ড খ. বন্দর থানা গ. পাহাড়তলী থানা জেলা চট্টগ্রাম।	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বিএনপি) ডাঃ মোঃ আশরাফুল আমিন (আ.লীগ)	১,১৬,৫৪৭ ১,০৬,৩৪১
২৮৭ চট্টগ্রাম-৯	ক. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত ডবলমুরিং থানাধীন নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ: ১. ২৯নং ওয়ার্ড ২. ৩০নং ওয়ার্ড খ. কোতায়ালী থানা গ. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পাঁচলাইশ থানাধীন ৮নং ওয়ার্ড ঘ. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চান্দগাঁও থানাধীন নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ: ১. ৬নং ওয়ার্ড ২. ১৭, ১৮ ও ১৯ নং ওয়ার্ড জেলা চট্টগ্রাম।	এম.এ মান্নান (আ.লীগ) আবদুল্লাহ আল নোমান (বিএনপি)	৯৯,২৪০ ৮৫,১৭১
২৮৮ চট্টগ্রাম-১০	ক. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৮নং ওয়ার্ড ব্যতীত পাঁচলাইশ থানা খ. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ ব্যতীত চান্দগাঁও থানা:	মোঃ মোরশেদ খান (বিএনপি) নুরুল ইসলাম (আ.লীগ)	৮১,৭১৪ ৭৭,০৮৮

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	১. ৬নং ওয়ার্ড ২. ১৭, ১৮ ও ১৯নং ওয়ার্ড গ. বোয়ালখালী থানা জেলা চট্টগ্রাম।		
২৮৯ চট্টগ্রাম-১১	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত পটিয়া থানা: ১. চর পাথরঘাটা ২. চরলক্ষ্যা ৩. জুলধা ৪. বড় উঠান ৫. শিকল বাহা জেলা চট্টগ্রাম।	গাজী মোঃ শাহজাহান (বিএনপি) মোসলেম উদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	৪৯,২৪৮ ৪২,৭৭৪
২৯০ চট্টগ্রাম-১২	ক. পটিয়া থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. চরপাথরঘাটা ২. চরলক্ষ্যা ৩. জুলধা ৪. বড় উঠান ৫. শিকলবাহা খ. আনোয়ারা থানা জেলা চট্টগ্রাম।	সারওয়ার জামাল নিজাম (বিএনপি) আতাউর রহমান খান কায়সার (আ.লীগ)	৫২,৭৯২ ৪১,৯০১
২৯১ চট্টগ্রাম-১৩	ক. চন্দনাইশ থানা খ. সাতকানিয়া থানার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: ১. কেওচিয়া ২. কালিয়াইশ ৩. বাজালয়া ৪. ধর্মপুর ৫. পুরানগড় জেলা চট্টগ্রাম। বি:দ্র: উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মমতাজ বেগম (বিএনপি) আলহাজ্জ অলি আহমেদের জায়গায় আসেন।	আলহাজ্জ অলি আহমেদ বীর বিক্রম (বিএনপি) আলহাজ্জ নজরুল ইসলাম চৌধুরী(আ.লীগ)	৬২,৩২৩ ৩০,৭২৮
২৯২ চট্টগ্রাম-১৪	ক. নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সাতকানিয়া থানা: ১. কেওচিয়া ২. কালিবাইশ ৩. বাজালিয়া	আলহাজ্জ অলি আহমেদ বীর বিক্রম (বিএনপি) শাহজাহান চৌধুরী (জামাতে ইসলামী)	৭৫,৮৫৫ ৪১,৮৬০

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকার নম্বর	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি	বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাপ্ত ভোট
	৪. ধর্মপুর ৫. পুরানগড় খ. লোহাগড়া থানা জেলা চট্টগ্রাম।		
২৯৩ চট্টগ্রাম-১৫	বাঁশখালী থানা জেলা চট্টগ্রাম।	জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (বিএনপি) মোঃ সুলতানুল কবির চৌধুরী (আ.লীগ)	৪৫,৩৯২ ৩৪,০৭৬
২৯৪ কক্সবাজার-১	চকরিয়া থানা জেলা কক্সবাজার।	সালাহউদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) সালাহউদ্দিন আহমেদ (আ.লীগ)	৭২,৫৯৪ ৫০,৮২৯
২৯৫ কক্সবাজার-২	ক. কুতুবদিয়া থানা খ. মহেশখালী থানা জেলা কক্সবাজার।	আলমগীর মোঃ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ (বিএনপি) এড. সিরাজুল মোস্তফা (আ.লীগ)	৪৪,৪৪৫ ৩২,৪৪৩
২৯৬ কক্সবাজার-৩	ক. কক্সবাজার সদর থানা খ. রামু থানা জেলা কক্সবাজার।	মোঃ খালেকুজ্জামান (বিএনপি) মুশতাক আহমেদ চৌধুরী (আ.লীগ)	৬৯,১১৯ ৪১,৪০৫
২৯৭ কক্সবাজার-৪	ক. উখিয়া থানা খ. টেকনাফ থানা জেলা কক্সবাজার।	অধ্যাপক মোঃ আলী (আ.লীগ) শাহজাহান চৌধুরী (বিএনপি)	৪৪,৭০৬ ৩০,৫৯৪
২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	কল্পরঞ্জন চাকমা (আ.লীগ) আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া (বিএনপি)	৫৮,০৫৮ ৪৮,০২৩
২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।	দীপংকর তালুকদার (আ.লীগ) পারিজাত কুসুম চাকমা (বিএনপি)	৬৩,১০১ ৩৮,৪০৯
৩০০ পার্বত্য বান্দরবান	বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	বীর বাহাদুর (আ.লীগ) সা চিং প্রু (বিএনপি)	৩৯,৪৮৮ ২৮,৪৮২

বি:দ্র: উল্লিখিত ১৫টি উপনির্বাচনের ফলাফল কেবলমাত্র ১২ জুনের নির্বাচনে একাধিক আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের ছেড়ে দেয়া আসনের। এই উপনির্বাচনগুলো ১৯৯৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সূত্র: নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৬। স্টাটিসটিক্যাল রিপোর্ট, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জুন ১২, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

সংযোজনী-ঘ

প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নাম ও ঠিকানা

১। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০

সভানেত্রী: শেখ হাসিনা
ফোন: ৮১১৫১০০(অ) ৮১২২১৮৫, ৮১২২০০১, ৯১২০৮৯৯(বা)
সাধারণ সম্পাদক: জিল্লুর রহমান ফোন: ৮৩৩২২৮৮৮ (বা)
অফিস ফোন: ৯৫৫৭৯৮২ ফ্যাক্স: ৮১১০০৪৫

নির্বাচনী অফিস
বাড়ি: ৪৯/১ রোড: ১২ক
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা
ফোন: ৮১২৬২৮৮

২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**
২৮/১ নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০

সভানেত্রী: বেগম খালেদা জিয়া
ফোন: ৮৩১৪৮৮৮, ৮৩২২৭৫৪ (অ) ৮৮২১৬৬৬, ৮১১৩৩৩৩ (বা)
মহাসচিব: আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ফোন: ৮৮১১৮৬৬(বা)
অফিস ফোন: ৮৩১৩৮০৯ ফ্যাক্স: ৮৩১৮৬৮৭

নির্বাচনী অফিস
বাড়ি: ৫৩ রোড: ৩০
বনানী, ঢাকা
ফোন: ৮৮১৯৫২৫

৩। **জাতীয় পার্টি (এরশাদ)**
২, কলাবাগান, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭

সভাপতি: হুসাইন মোহাম্মাদ এরশাদ ফোন: ৮৮১২৭৮৭ (বা)
সাধারণ সম্পাদক: নাজিউর রহমান মঞ্জুর ফোন: ৯৮২৮৪১৪
অফিস ফোনঃ ৯১২৫৫৭৯

www.pathagar.com

৪। **জাতীয় পার্টি (মিজান-মঞ্জু)**
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

সভাপতি: মিজানুর রহমান চৌধুরী ফোন: ৮৮১৩০০৮ (বা)
সাধারন সম্পাদক: আনোয়ার হোসেন মঞ্জু
ফোন: ৯১২০৭৬০, ৮১১৫৮২১, ৮১১৪৭১৫ (বা)

৫। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ**
৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা

আমির: মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ফোনঃ ৯৩৩২১৩৬ (বা)
সাধারণ সম্পাদক: আলী আহসান মুজাহীদ ফোনঃ ৪০২১৩৬
অফিস ফোন: ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

৬। **বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি**
২১/১, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: মঞ্জুরুল আহসান খান
সাধারণ সম্পাদক: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
অফিস ফোন: ৯৫৫৮৬১২

৭। **ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)**
২০/২১ ধানমণ্ডি হকার্স মার্কেট
ধানমণ্ডি, ঢাকা

সভাপতি: মোজফফর আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক: এ্যাডভোকেট নূরুল আলম
অফিস ফোন: ৯৬৬২৯৩৯

৮। **ওয়ার্কার্স পার্টি**
৩১/এফ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: রাশেদ খান মেনন ফোন: ৮৩১১৭৭৭ (বা)
সাধারণ সম্পাদক: বিমল বিশ্বাস
অফিস ফোন: ৯৫৬৭৯৭৫

www.pathagar.com

৯। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)**
৩৫/৩৬ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: আ স ম আব্দুর রব ফোন: ৮৮১২২১১ (বা)
সাধারণ সম্পাদক; হাসানুল হক ইনু ফোন: ৮০১৪২৯৫ (বা)
অফিস ফোন: ৯৫৫৯৯৭২

১০। **ইসলামী ঐক্য জোট**
৪৪/১ পূরাণা পল্টন
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: শায়খূল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক
সাধারণ সম্পাদক: মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমেনী
অফিস ফোন: ৯৫৫৩৬৯৩, ৯৬৬২৯৯৮ ফ্যাক্স: ৯৫৬৫০৩০

১১। **গণ ফোরাম**
৬০, পুরানাপল্টন
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: ডঃ কামাল হোসেন ফোন: ৯৫৬৪৯৫৪, ৯৫৬০৬৫৫
সাধারণ সম্পাদক: সাইফুদ্দীন মানিক
অফিস ফোন: ৯৩৪৮৭৮২ ফ্যাক্স: ৮৬১৪৯৬৬

১২। **গণতন্ত্রী পার্টি**
২৩/২ তোপখানা রোড
ঢাকা-১০০০

সভাপতি: আহমেদুল কবির
সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ আফজাল
অফিস ফোন: ৮১১৩২৭৭

www.pathagar.com

সংযোজনী-ঙ

ভারতে নির্বাচনে অসদাচরণ

ভারতের নির্বাচন কমিশন সেখানকার নির্বাচনে ঘটে এমন ১৫০টি অনিয়ম চিহ্নিত করেছে পর্যায়ক্রমে সেই অনিয়মগুলো দূর করার জন্য। ভারতের ওই অনিয়মগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচনে ঘটে এমন অনিয়মগুলোরও কিছু কিছু সাধারণ মিল লক্ষ করা যায় এবং এদেশেও সেগুলো অনেকটা প্রাসঙ্গিক। ভারতের সেই অনিয়মগুলোর তালিকা হুবহু তুলে ধরা হলো:

ভোটার তালিকা প্রস্তুতি

১। অপর্যাপ্ত প্রচারণা
২। নিবন্ধীকরণের সময় ভোটারদের উদাসীনতা
৩। কর্মজীবী ভোটারদের বাড়ীতে না পেয়ে তাদেরকে বাদ দেয়া
৪। রাজনৈতিক দলগুলোর উদাসীনতা
৫। গণনাকারী এবং তত্ত্বধানকারীর দলীয় ভূমিকা
৬। গণনা এবং নির্বাচনের সময় হঠাৎ গজিয়া ওঠা 'জে জে' কলোনি
৭। কল্পিত গণনা
৮। অযোগ্য নাম অন্তর্ভুক্ত
৯। যোগ্য ভোটারদের বাদ দেয়া
১০। অঞ্চলসমূহ ব্যাপকভাবে বাদ দেয়া
১১। বিদেশী অন্তর্ভুক্তি
১২। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার
১৩। অনাবাসী অন্তর্ভুক্তি
১৪। মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি
১৫। ভোটারদের ত্রুটিপূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত
১৬। একাধিকবার নিবন্ধীকরণ
১৭। যোগ্য কর্মকর্তা কর্মচারীর অভাব
১৮। নির্বাচনী এলাকায় খসড়া তালিকা প্রকাশ না-করা
১৯। অভিযোগ ফরম-এর দুষ্প্রাপ্যতা
২০। নিবন্ধকারী কর্মকর্তাদের অসহযোগী মনোভাব
২১। অবিশ্বাসযোগ্য নাগরিকত্ব দলিল
২২। অপ্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরির প্রবণতা
২৩। বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে অভিযোগসমূহ নষ্ট করা
২৪। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সময়মত না পাওয়া
২৫। পি এস ও এসি এলাকাসমূহ সুবিধাজনকভাবে একত্রে করে দেয়া
২৬। বিতর্কিত এলাকাসমূহে একাধিকবার নিবন্ধণীকরণ
২৭। ভোটার তালিকার শেষাংশ ত্রুটিপূর্ণভাবে হালনাগাদ করা

www.pathagar.com

ভোটকেন্দ্র স্থাপন

২৮। দুর্বল একটা অংশকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া
২৯। প্রভাবশালী মহলের এলাকায় দুর্বলদের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন
৩০। নির্দেশিত দূরত্বের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন
৩১। ভোটকেন্দ্রে যেতে প্রাকৃতিক বাধা
৩২। ব্যক্তি মালিকানাধিন ভবনে ভোটকেন্দ্র নির্মাণ
৩৩। অযোগ্য ভবনে ভোটকেন্দ্র নির্মাণ
৩৪। একই ভবনে অনেকগুলো ভোটকেন্দ্র স্থাপন
৩৫। শেষ মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রের পরিবর্তন
৩৬। কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সন্নিকটে ভোটকেন্দ্র স্থাপন
৩৭। অকার্যকর করার জন্য ক্ষণস্থায়ী কাঠামো

তফসিল ঘোষণার পূর্বে অনিয়ম

৩৮। অসুবিধাজনক রিটার্ণিং অফিসারদের বদলি
৩৯। মাঝারি ধরনের কর্মকর্তাদের বদলি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নমনীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান
৪০। নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন
৪১। নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের উদ্বোধনে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব

নির্বাচনী সময়সূচি

৪২। পুলিশের অপ্রতুলতার কারণে বিলম্বিত করা
৪৩। নিয়ন্ত্রণসম্ভব এমন প্রদেশে পর্যায়ক্রমে নির্বাচন করা

মনোনয়ন, বাছাই এবং প্রত্যাহার

৪৪। নকল প্রার্থী
৪৫। দুর্বল প্রার্থীর মনোনয়নে বাধা দেয়া
৪৬। ঘুষ এবং দরকষাকষি
৪৭। দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে ভালো মানুষদের সংকোচ
৪৮। বর্ণ ও সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রার্থী বাছাই
৪৯। মৃত্যুপথযাত্রীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া যেন নির্বাচন বাতিল করা যায়
৫০। একাধিক সংসদীয় এলাকায় মনোনয়ন

প্রচারণা কাল

৫২। জাঁকাল এবং অপ্রয়োজনীয় নির্বাচনী ব্যয়
৫৩। রাজনৈতিকদলগুলোর খরচের গর-হিসাব
৫৪। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীদের ব্যবহার
৫৫। ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন
৫৬। প্রার্থীদের ভীতি প্রদর্শন

www.pathagar.com

৫৭। রাজনৈতিক দলগুলোকে ভীতি প্রদর্শন
৫৮। রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের কর্মচারীদের হেনস্তা করা
৫৯। মাস্তানদের সচল করা
৬০। জনসভায় বিঘ্ন সৃষ্টি
৬১। রাজনৈতিক সোভাযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি
৬২। দলীয় পোষ্টার বা তোরণ নষ্ট করা
৬৩। অবিশ্বাসযোগ্য পোষ্টার
৬৪। সাম্প্রদায়িক এবং বর্ণ ভিত্তিক প্রচারণা
৬৫। তথাকথিত সরকারী কাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সফর
৬৬। নির্বাচনী অফিস হিসাবে সরকারী রেষ্ট হাউসগুলোর ব্যবহার
৬৭। স্পর্শকাতর এলাকাগুলোর মধ্যদিয়ে মিছিল
৬৮। সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষতি সাধান
৬৯। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং অননুমোদিত দ্রব্যের ব্যবহার
৭০। রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বিমানের ব্যবহার

নির্বাচনের দিন

৭১। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্ররোচিত করা
৭২। জোর করে ভোটকেন্দ্র দখল
৭৩। নিঃশব্দে ভোটকেন্দ্র দখল
৭৪। ভোটকেন্দ্রে জটলা সৃষ্টি
৭৫। 'তাসমানিয়া' কৌশল
৭৬। পুলিশবাহিনীকে সচল না হতে দেয়া
৭৭। কেন্দ্রীয়বাহিনীকে অচল করে রাখা
৭৮। যানবাহনের অপব্যবহার
৭৯। ভোটারদের আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা
৮০। নিজেকে অন্য ভোটার বলে পরিচয় দেয়া
৮১। প্রচারণার জন্য গণমাধ্যমের অপব্যবহার
৮২। ভোটার উপস্থিতি কমানোর জন্য শান্তি নষ্ট করা
৮৩। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার
৮৪। নিষিদ্ধ অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহার
৮৫। অনুমতিপ্রাপ্ত অস্ত্রের অপব্যহার
৮৬। পোলিং এজেন্ট হিসেবে মন্ত্রী
৮৭। প্রিসাইডিং অফিসারদের ত্রুটিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ
৮৮। ব্যালট পেপারের ত্রুটিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ

পুনরায় ভোট এবং ভোট গ্রহণ স্থগিত

৮৯। পুনরায় ভোট গ্রহণের জন্য পক্ষপাতমূলক সুপারিশ
৯০। হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারগুলো পুনভোটের সময় ব্যবহার
৯১। পুনভোটের জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী ব্যবস্থা শীথিল করা
৯২। পুনভোট দেখার জন্য পর্যবেক্ষকদলের অনুপস্থিতি

www.pathagar.com

ভোট গণনা

৯৩। পক্ষপাতিত্ব করে ভোট বাতিল করা
৯৪। পক্ষপাতিত্ব করে ব্যালট গণনাভুক্ত করা। ত্রুটিযুক্ত মোট ভোট সংখ্যা তৈরি করা।
৯৫। ফলাফলের কাগজে সুবিধাজনকভাবে সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা
৯৬। শেষ সময়ে গণনাকারী এজেন্ট নিয়োগ
৯৭। গণনাকারী এজেন্ট হিসাবে মন্ত্রী
৯৮। নকল প্রার্থীর এজেন্টদের ব্যবহার
৯৯। গণনাকেন্দ্রে ভীড় জমানো
১০০। প্রতিনিধিত্বের অসমাপ্ত হস্তান্তর
১০১। আরপি এ্যাক্ট-এর ৬৬ ধারার লঙ্ঘন

নির্বাচনী আবেদন

১০২। হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রতা
১০৩। পরাজিত প্রার্থীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া
১০৪। অত্যাচারী পদ্ধতি
১০৫। ইসিআইকে একটি পক্ষ হিসেবে নিতে অনিচ্ছা

নির্বাচন সামগ্রী ও দলিলপত্র গুদামজাত ও সংরক্ষণ

১০৬। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ধ্বংশ করা
১০৭। নির্বাচনী সামগ্রী অবৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ

নির্বাচনোত্তর অনিয়ম

১০৮। সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া
১০৯। নির্বাচনী মামলাগুলো অচল করে রাখা
১১০। ভোটার এবং এলাকার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নেয়া

ক্ষমতাসীন দলের নানা কৌশল

১১১। অসৎ ভোটারতালিকা নবায়নকারী কর্মচারী
১১২। অসমর্থনযোগ্য ভোটারদের বাদ দেয়া
১১৩। বিধিবহির্ভূতভাবে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ
১১৪। অনমনীয় রিটার্ণিং অফিসারদের বদলি
১১৫। পুলিশ অফিসারদের ব্যবহার
১১৬। পক্ষে কাজ করার জন্য মাস্তানদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তিদান
১১৭। প্রতিপক্ষের চিহ্নিত সমর্থকদের আটকে রাখা
১১৮। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীকে অচল করে রাখা
১১৯। সরকারী যানবাহনকে প্রচার কাজে ব্যবহার
১২০। সরকারী কর্মচারীদের প্রচারকাজে ব্যবহার
১২১। সমর্থক সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ

www.pathagar.com

১২২। সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা
১২৩। সংসদীয় এলাকায় সরকারী সভাগুলো ব্যবহার
১২৪। সরকারী রেষ্টহাউসগুলো প্রচার কাজে ব্যবহার
১২৫। মর্জিমাফিক অর্থ বরাদ্ধ
১২৬। বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ব্যবহার
১২৭। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের অচল করে রাখা
১২৮। রাষ্ট্র মালিকানাধীন গণমাধ্যমের অপব্যবহার
১২৯। রাষ্ট্রখাতের অবকাঠামসমূহের অপব্যবহার
১৩০। গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সফর এবং জনসভা
১৩১। মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সরকারী অফিসারদের ব্যবহার
১৩২। ক্ষমতাসীন দলের সফলতার প্রচার
১৩৩। আইন-শৃংখলার অজুহাতে উপনির্বাচন পরিহার
১৩৪। রাষ্ট্রপতির নির্দেশের অপব্যবহার

বিবিধ

১৩৫। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ
১৩৬। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং সমর্থকদের নির্বাচনী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত দুর্বলতা

১৩৭। রাজনৈতিক নির্বাহীদের সুপারিক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ
১৩৮। অপসারণের ব্যাপারে সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে রাজনৈতিক নির্বাহীদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ
১৩৯। আমলাতন্ত্রের বাইরে এসে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রদান
১৪০। স্বতন্ত্র চাকুরী বিধিমালা সম্বলিত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুপস্থিতি
১৪১। ইউপিএসসি, সিএটি, ভিজিলেন্স কমিশন অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিচালনা করে তাদের কাছে নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা
১৪২। নির্বাচন কমিশনের জন্য সীমিত বাজেট
১৪৩। নির্বাচন কমিশনের জন্য অতিঅল্প জনশক্তি
১৪৪। প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিভক্ত আনুগত্য
১৪৫। রিটার্ণিং অফিসারদের বিভক্ত আনুগত্য
১৪৬। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার বিভক্ত আনুগত্য
১৪৭। ক্ষমতাসীন দলের সুবিধাজনক অবস্থান
১৪৯। অর্থের দাপট নিয়ন্ত্রণে নমনীয় আইন
১৫০। নির্বাচনী অপরাধীদের শাস্তি বিধানে ভঙ্গুর আইন।

সূত্রঃ Kutty, Govindan K. 1994. Seshan, An Intimate story. Delhi

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ

সাংবাদিক সহায়িকা

তথ্যপঞ্জি
নির্বাচনী রিপোর্টিং

নির্বাচনী রিপোর্টিং তথ্যপঞ্জি। পেশাদারী রিপোর্টিং এবং পর্যবেক্ষণে একটি সহায়ক গন্থ। প্রবীণ সাংবাদিক এবং পেশাদার গবেষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, নির্দেশনা, পরামর্শ এবং ১৯৩৭ সাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এদেশের জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি সংকলিত হয়েছে এ গন্থে। এ গন্থে রয়েছে:

নির্বাচনী প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র
পর্যায়ক্রমে নির্বাচন
নির্বাচন কমিশন: গঠন ও কার্যপ্রণালী
দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নির্বাচনী রিপোর্টিং
আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে নির্বাচনী প্রতিবেদন
জরুরি কিছু বিষয়
ভোটার বনাম প্রার্থী
নির্বাচনী ফিচার
সদালাপী সাংবাদিক
নির্বাচনী ইশ্‌তেহার
নির্বাচনী সংবাদ সম্মেলন
সাধারণ নির্বাচন: বৃটিশ ও পাকিস্তানি আমল
বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন
এক নজরে সপ্তম জাতীয় সংসদ
জরুরি নির্বাচনী আইন এবং আইনের ফাঁকফোকর
জনমানুষ কী ভাবছেন
নির্বাচন ও ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়া
বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

আইএসবিএন - ৯৮৪-৪৯৪-০১৫-X

সেড